সংখ্যা ০১, জুলাই ২০১৬

হাদিস স্টাডিজ

উপদেষ্টা
প্রফেসর ড. গিয়াস উদ্দিন হাফিজ

প্রধান সম্পাদক
প্রফেসর ড. নাজমুল হক নাদভী

নির্বাহী সম্পাদক
ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম

সম্পাদনা পর্ষদ
আব্দুল গফুর
মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন
মুহাম্মদ বেলাল
মুহাম্মদ সাইয়েদ নূর
মুহাম্মদ নাজমুল হুদা সোহেল

সম্পাদনা সহযোগিতায়
শায়খুল আজম আবরার
মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ
নুরুল হুদা তারেক
মাহমুদা আক্তার
আসমাউল হুসনা

IIUC
সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ
الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ
International Islamic University Chittagong

সংখ্যা ০১, জুলাই ২০১৬
Vol 01, July 2016

হাদিস স্টাডিজ

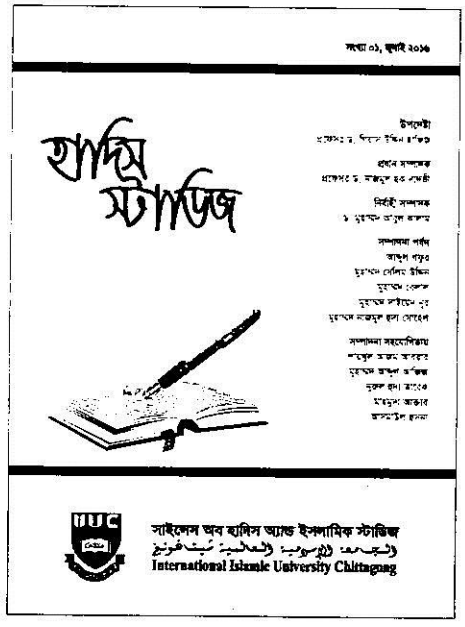

সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ
الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ
International Islamic University Chittagong

হাদিস স্টাডিজ

সংখ্যা ০১, জুলাই ২০১৬

প্রকাশনায়

সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম
চকবাজার, চট্টগ্রাম-৪২০৩।
ফোন : ০৩১-৬১০৩০৮, ৬১০০৮৫ এক্সটেনশন-২১০
মোবাইল : ০১৮১৯-৩৩৬১১৮, ০১৭১২-৬৭৩০৯৪
ই-মেইল : shisiiuc@gmail.com
ফ্যাক্স : ৮৮০-৩১-৬১০৩০৭
ওয়েবসাইট : www.iiuc.ac.bd

প্রকাশকাল

জুলাই ২০১৬ ইংরেজি
রমাদান ১৪৩৭ হিজরি
আষাঢ় ১৪২৩ বাংলা

মুদ্রণ

INVENTION
১৯১/১৯২, লালচাঁন্দ রোড, চকবাজার
ইসলামী ব্যাংকের নীচে, চট্টগ্রাম।
ই-মেইল : inventioneh@gmail.com
মোবাইল : ০১১৯৯-৭০৭৫৫৫, ০১৮১৯-৯৯৫৭৯৯

উপদেষ্টা

প্রফেসর ড. গিয়াস উদ্দিন হাফিজ

প্রধান সম্পাদক

প্রফেসর ড. নাজমুল হক নাদভী

নির্বাহী সম্পাদক

ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম

সম্পাদনা পর্ষদ

আব্দুল গফুর

মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন

মুহাম্মদ বেলাল

মুহাম্মদ সাইয়েদ নূর

মুহাম্মদ নাজমুল হুদা

সম্পাদনা সহযোগিতায়

শায়খুল আজম আবরার

মুহাম্মদ আব্দুল আজিজ

নুরুল হুদা তারেক

মাহমুদা আক্তার

আসমাউল হুসনা

সম্পাদকীয়

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানীতে ইসলামের দ্বিতীয় মৌলিক উৎস রাসুল (সা.)'র হাদিস ও হাদিস বিজ্ঞান সম্পৃক্ত বিভিন্ন যুগোপযোগী বিষয়ের উপর ভিত্তি করে প্রকাশিতব্য ম্যাগাজিন "হাদিস স্টাডিজ" আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম'র **সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ** বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক মন্ডলী ও শিক্ষার্থীদের নিরলস পরিশ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে যাচ্ছে বিধায় তাঁর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন'র পরেই ইসলামে হাদিসে রাসুল (সা.)'র স্থান। মহান রাব্বুল আলামীনের বাণী "আপনার কাছে আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি তাদের ঐসব বিষয়ের বর্ণনা প্রদান করেন, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে" (সূরা আল-নাহ্‌ল) এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, হাদিসে রাসুল (সা.) ব্যতীত সঠিক পর্যায়ে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বুঝা অনেকটা অসম্ভব বিধায় হাদিসের অধ্যয়ন, অন্বেষণ, গবেষণা ও হাদিস মতে নিজের পার্থিব জীবন পরিচালিত করা প্রতিটি মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাই অবচেতন মনে হলেও প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়ে হাদিসে রাসুল (সা.)'র স্থান অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও অপরিহার্য। "হাদিস স্টাডিজ" সম্মানিত পাঠকদের হাদিসের অধ্যয়ন, অন্বেষণ ও গবেষণার প্রতি আহবান করবে এবং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সঠিক পথে চলার পাথেয় হিসেবে কাজ করবে। সহকর্মীদের অনুপ্রেরণা, সহযোগিতা ও বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের নিরলস প্রচেষ্টা ও হাদিসপ্রেমীদের চাহিদা পূরণ ম্যাগাজিন প্রকাশনার কাজ ত্বরান্বিত করেছে। বিশেষ করে "হাদিস স্টাডিজ" প্রকাশনায় যে সকল ব্যাক্তি/প্রতিষ্ঠান আর্থিক সহযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসুল (সা.)'র হাদিসের প্রচার-প্রসারে আমাদের প্রত্যেকের প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

সম্পাদক

সূচীপত্র :

পৃষ্ঠা নং

প্রবন্ধ

দুই হারামের অতীত ও বর্তমান ৭-১৭
প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক

তাকওয়া ও এর তাৎপর্য ১৮-২০
প্রফেসর ড. আ.ছ.ম তরীকুল ইসলাম

ইলমে হাদীসে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ ২১-২৫
প্রফেসর ড. নাজমুল হক নদভী

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিপদ-বিপর্যয়ে মুমিনের করণীয় ২৬-৩০
প্রফেসর ড. বি.এম মফিজুর রহমান আল-আযহারী

উন্নত বিশ্ব ও ইসলামী আইন ৩১-৩৬
আতাউর রহমান নদভী

মাওলানা মওদূদীর চিন্তাধারা ৩৭-৩৯
ড. ইউসুফ আলকারাদাওয়ী
অনুবাদ: ড. সালাম আযাদী

অনৈক্যঃ কারণ ও প্রতিকার ৪০-৪১
ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম

বিভিন্ন সভ্যতা ও ধর্মে হিজাবের অস্তিত্ব ৪২-৪৫
মুহাম্মদ নাজমুল হুদা সোহেল

ইংরেজি জানা আলেমদের ক্যারিয়ার ৪৬-৪৭
আহমাদ যোবায়ের

শিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, বিশ্বাসের মূলনীতি ও বিভাজন ৪৮-৫০
রায়হান আজাদ

বাংলা অঞ্চলে হাদীস চর্চার ইতিহাস ৫১-৫৩
মো: আব্দুল আজিজ

বিজ্ঞান ও জীবন দর্শন ৫৪-৫৫
ফয়জুল্লাহ নোমানী

ধৈর্যেই বিজয়ের সিঁড়ি ৫৬
হুসাইন মো: সারওয়ার

ধৈর্যের প্রতিদান জান্নাত ৫৭
সায়েমা ইয়াসমীন

বিলাসিতার মাঝে হারিয়ে যায় রমাদানের মাহাত্ব ৫৮
রাবেয়া আক্তার

Honesty is the best Policy ৫৯
Dilruba Yeasmin

الصبر ৬০
بنت فاروق

জীবনী

মুহাদ্দিস আহমদ বিন সিদ্দিক আল-গুমারী ৬২-৬৩
সাইয়্যেদ নূর আল-আযহারী

গল্প

স্নিগ্ধ ভালোবাসার দুই টুকরো গল্প ৬৫
শায়খুল আজম আবরার

শূন্যতায় করুনার অপেক্ষা ৬৬
মো: ইকবাল হোসেন

হীরে ছড়ানো ক্ষেত ৬৭
মাহমুদা আক্তার

সুখের সিন্ধুক ৬৮-৬৯
সানজিদা

মা কেন এমন ৭০-৭১
ছামিনা আবেদীন

আলোর পথের যাত্রী ৭২
আব্দুল্লাহ শাকীক

এক হজ্ব যাত্রীর গল্প ৭৩
জারিন তাসনিম

ثقة النفس ৭৩
عمار زكريا

কবিতা

الشتاء ৭৪
عمار زكريا

শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠা নামা ৭৫
সানজিদা

আলোর প্রভাত ৭৫
রাফিয়াতুল জান্নাত

তাকওয়া অর্জনের সোপান ৭৬
সাবেরা

কোথায় যে পাই ৭৬
হাবিবা বিনতে লোকমান

এ কেমন স্বাধীনতা ৭৭
মোঃ আজহারুল ইসলাম ফয়সাল

একটি পাখি ৭৭
এইচ এম মিজানুর রহমান

আমার আশা ৭৭
বিনতে ফারুক

যদি বলি ৭৮
মোঃ ইকবাল হোসেন

ফরিয়াদ ৭৮
এনামুল হাসান রাকিব

পৃথিবী জুড়ে নেই ৭৯
মাহমুদুল হাসান

অধিকার ৭৯
মাহমুদুল হাসান

বালক ৮০
আফিফ মুনতাসির

কৌতুক

মাহমুদা আক্তার ৮০

দুই হারামের অতীত ও বর্তমান

প্রফেসর ড. আবু বকর রফীক*

(এক) **আল হারাম আল মাক্কী বা আল মাসজিদুল হারাম:** দুই হারাম যা আরবীতে (الحرمين الشرفين) নামে অভিহিত তা হচ্ছে মূলত: আল হারাম আল মাক্কী (الحرم المكى) ও আল হারাম আল মাদানী (الحرم المدنى) এ দুই হারাম হলো মুসলিম বিশ্বের কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাবান দুই তীর্থ স্থান বা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পবিত্র স্থান।

এ দুই হারামের মধ্যে প্রথমটি অর্থাৎ "আল হারাম আল মাক্কী" চিহ্নিত হয়েছে পবিত্র কা'বা গৃহকে কেন্দ্র করে। এর অপর নাম "বায়তুল্লাহ আল হারাম"। এ গৃহটি পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীনতম গণ ইবাদতগাহ। এ প্রসঙ্গে পবিত্র আল কুরআনে এরশাদ হচ্ছে:

﴿إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين﴾ (البقرة:٩٤)

অর্থাৎ: "বস্তুত সর্বপ্রথম গণ উপসানালয় যা মানব গোষ্ঠীর জন্য নির্মিত হয়েছে তা হচ্ছে ঐ গৃহটি যা মাক্কায় বিদ্যমান। একে চিহ্নিত করা হয়েছে গোটা বিশ্ববাসীর জন্য বরকত ও হেদায়েতের কেন্দ্র রূপে।" (৩:৯৬)

এ আয়াতে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে এ কা'বা গৃহের অস্থিত্ব বিদ্যমান ছিল। তাছাড়া হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন আল্লাহর নির্দেশে তদীয় স্ত্রী হাজেরা ও একমাত্র দুগ্ধপায়ী শিশু পুত্র ইসমাঈলকে জনবসতীশূন্য মক্কা উপত্যকায় ছেড়ে যাচ্ছিলেন তখন তিনি আল্লাহর কাছে যে দু'আটি করেছিলেন তাতেও ইঙ্গিত রয়েছে যে সে স্থানে এককালে আল্লাহর একটি পবিত্র গৃহের অস্থিত্ব বিদ্যমান ছিল। তাঁর দু'আটি পবিত্র আল কুরআনে নিম্নরূপ উল্লেখ আছে:

﴿ربنا إني أسكنت من ذريتى بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلوة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون﴾ (ابراهيم: ٣٧)

অর্থাৎ: "প্রভু হে! আমি আমার বংশধরদের কিয়দাংশকে একটি তরুলতা বিহীন উপত্যকায় আপনার সম্মানিত ঘরের নিকটে বসবাসের উদ্দেশ্যে রেখে যাচ্ছি। প্রভু হে! এ উদ্দেশ্যে যেন তারা নামায প্রতিষ্ঠা করতে পারে। কাজেই মানব গোষ্ঠীর একটি অংশের অন্তরকে এদের প্রতি আকৃষ্ট করে দিন। আর এদেরকে ফলমূল দিয়ে রিযিকের ব্যবস্থা করে দিন। যেন তারা আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারে।" (১৪:৩৭)

আমরা জানি যে হযরত ইবরাহীম (আ.) এ দু'আ করার অনেক পরেই সেখানে কা'বা গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। এবং তখন সেখানে কার্যত: কোন ঘর বিদ্যমান ছিল না। অতএব তিনি যে ঘরের কথা উল্লেখ করেছিলেন তা হচ্ছে ঐ ঘর যা এক কালে সেখানে বিদ্যমান ছিল। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে কা'বা গৃহ সর্ব প্রথম নির্মিত হয় ফেরেশতাগণ কর্তৃক মানব সৃষ্টির বহু আগে।

কা'বার সূচনা:

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট তাবে'ঈ সাঈদ ইবন আল মুসাইয়িব কর্তৃক কা'ব আল আহবার বর্ণিত একটি হাদীসের উল্লেখ করা যায়, তিনি বলেন: "আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টি করার চল্লিশ বছর পূর্বে পবিত্র কা'বা পানির উপর একটি খড় কুটোর মত ছিল। সেখান থেকে পৃথিবীর বিস্তৃতির সূচনা করা হয়। হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে আছে যে পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহর আরশ যখন পানির উপর বিদ্যমান ছিল তখন আল্লাহর আদেশে একটি প্রলয়ংকরী ঘুর্নিঝড় সৃষ্টি হয়, এতে সমগ্র পানিতে প্রচন্ড নাড়া দেয়া হয় এবং এতে সৃষ্টি হয় বিশাল ফেনা রাজির, যা একটি গম্বুজের আকারে বর্তমান কা'বা গৃহের স্থানে জড়ো হয়। সেখান থেকে পৃথিবীর বিস্তৃতি ঘটে। আর তাতে সৃষ্টি করা হয় পাহাড় ও পর্বত মালার। সর্ব প্রথম পাহাড় ছিল আবু কুবায়স পাহাড়টি, যা মক্কার অদূরে অবস্থিত। এ জন্যই মক্কাকে উম্মুল ক্বোরা নামে অভিহিত করা হয়।[১]

আল আযরক্বী 'আখবারে মক্কা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে ফেরেশতাগণ আল্লাহর হুকুমে সর্বপ্রথম পৃথিবীর বুকে এ কা'বা গৃহটি নির্মাণ করেন। সপ্তম আকাশেও এর অনুরূপ একটি গৃহ রয়েছে যার নাম "আল বাইত আল মা'মূর"। এ গৃহের উল্লেখ আল কুরআনেও রয়েছে। এ গৃহটি নির্মাণের পর পৃথিবীতে দায়িত্বরত ফেরেশতাদেরকে এ গৃহের চতুস্পার্শ্বে তাওয়াফ করার আদেশ দেয়া হয়, যেভাবে আকাশে দায়িত্বরত ফেরেশতাদেরকে "আল বাইত আল মা'মূর" এর চতুর্দিকে তাওয়াফ করার আদেশ দেয়া হয়।

দ্বিতীয় নির্মাণ:

কা'বা গৃহ দ্বিতীয় বারের মত নির্মিত হয় হযরত আদম (আ.) কর্তৃক। এ প্রসঙ্গে আল আযরাক্বী হযরত ইবন 'আব্বাস (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি নিম্নরূপ:

'আতা ইবন আবী রিবাহ বর্ণনা করেছেন যে হযরত ইবন 'আব্বাস তাকে বলেছেন: "যখন আদম (আ.) বেহেশত হতে পৃথিবীর বুকে অবতরণ করলেন তখন তিনি আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেন। ইয়া আল্লাহ! আমি কোন ফেরেশতার কথা শুনতে পাচ্ছিনা, আর তাদের কোন অস্থিত্ব সম্পর্কেও আঁচ করতে পারছিনা। তখন আল্লাহ উত্তরে বলেন: এ সব তোমার পাপের কারণে। তবে আমার উদ্দেশ্যে একটি গৃহ নির্মাণ করে এর চতুর্দিকে তাওয়াফ কর, এবং আমাকে স্মরণ কর, যেভাবে তুমি ফেরেশতাদেরকে আমার আরশের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করতে দেখেছ। তখন তিনি একদিকে যাত্রা শুরু করলেন তিনি যতই অগ্রসর হচ্ছিলেন পৃথিবীর দুরত্ব তার জন্য ততই সংকুচিত করা

* ডীন, ফ্যাকাল্টি অব আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ, সাবেক প্রো-ভিসি, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

হচ্ছিল। তিনি মক্কায় এসে পৌছলে সেখানে আল্লাহর নির্দেশে "আল বাইত আল হারাম" নির্মাণ করেন। এ কাজে হযরত জিব্রাঈল তাঁকে সহযোগিতা করেন।"[২] হযরত ইবন মাসউদ (রা.) কর্তৃক অনুরূপ অন্য একটি হাদিস বর্ণিত আছে এবং এখান থেকে তাওয়াফের প্রথা জারী হয়।

হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক তৃতীয় নির্মাণ:

হযরত আদম (আ.) কর্তৃক নির্মিত গৃহটি নূহ (আ.) এর জীবদ্দশায় সংঘটিত মহা প্লাবনে ধ্বংস হয়ে যায়। বর্ণিত আছে যে প্লাবনের সময় হযরত নূহ (আ.) এর নৌকাটি স্রোতের তাড়ায় মক্কা নগরীতে এসে উপনীত হয়, এবং বাইতুল্লাহর চতুর্দিকে সাতবার চক্কর দিয়ে জূদী পর্বতমালার দিকে গতি পরিবর্তন করে। কা'বা গৃহটি ধ্বংস হয়ে গেলেও এর ভিত্তিটি একটি উঁচু ঢিবির আকারে বিদ্যমান ছিল। যার উপর হযরত ইবরাহীম নতুন করে কা'বা গৃহের নির্মাণ সম্পন্ন করেন।

এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ ইবন ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিসের উল্লেখ করা যায়, তিনি বর্ণনা করেছেন যে, "আল্লাহ যখন তাঁর খলীল হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে পবিত্র কা'বা গৃহ নির্মাণের আদেশ দিলেন তখন তিনি বোরাকে আরোহণ করে আরমীনিয়া হতে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা দিলেন। তাঁর সাথে ছিল সাকীনাহ তথা প্রশান্তি-, যার ছিল একটি মুখ। এ মুখ দিয়ে তা মানুষের মত কথা বলত। পরে উহা এক শীতল বায়ুতে পরিণত হল। তার সঙ্গে আরও ছিল এক ফেরেশতা, যিনি তাকে "আল বাইত আল হারামের" অবস্থানস্থলের দিক নির্দেশ দিচ্ছিলেন। অবশেষে ইবরাহীম (আ.) মক্কায় এসে উপনীত হলেন। সে সময় ইসমাঈল মক্কায় অবস্থান করছিলেন। এ সময় তার বয়স ছিল বিশ বছর। ইবরাহীম (আ.) ইসমাঈলকে বললেন: আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর উদ্দেশ্যে একটি ঘর তৈরীর আদেশ দিয়েছেন। তখন ইসমাঈল তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: কোন স্থানে? বর্ণনাকারী বলেন: তখন ফেরেশতা ঘরের স্থানটির প্রতি ইঙ্গিত করলেন। বর্ণনাকারী আরও বলেন: তখন পিতা-পুত্র দু'জনে মিলে ঘরের ভিত্তি প্রস্তর খুড়তে লাগলেন। অবশেষে যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) আদম (আ.) কর্তৃক নির্মিত প্রথম ঘরের ভীতে গিয়ে পৌছলেন তখন সেখান থেকে বেরিয়ে এল প্রকান্ড এক পাথর খন্ড, যে পাথর উঠাতে ত্রিশ জন লোকের সম্মিলিত শক্তির প্রয়োজন। অতপর আদম নির্মিত প্রাচীন ঘরের ভীতের উপর এ গৃহের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করে দিলেন। ".... হযরত ইবরাহীম যখন নির্মাণ কাজ শেষ করলেন তখন এর উচ্ছতা ছিল নয় হাত। হাজরে আসওয়াদের কোনা হতে রুকন শামী (ইরাকী) পর্যন্ত- এবং দৈর্ঘ্য করলেন ৩২ হাত আর উত্তর পশ্চিম কোনা হতে রুকন ইয়ামানী পর্যন্ত- দেয়ালের দৈর্ঘ্য ছিল ৩১ হাত এবং হাজরে আসওয়াদের কোনা হতে রুকন ইয়ামানী পর্যন্ত- এর প্রস্থ ছিল বিশ হাত এবং রুকন শামী (ইরাকী) থেকে উত্তরে পূর্ব পশ্চিম পর্যন্ত- প্রস্থ করলেন ২০ হাত। এজন্য কা'বাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হয়। আরবী কা'বা শব্দের অর্থ চতুষ্কোণ বিশিষ্ট বস্তু, যার ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে (CUBIC)।"

বর্ণনাকারী বলেন: আদম (আ.) এর ভিত্তিও ছিল অভিন্ন এবং কা'বার সম্মুখ ভাগে তখন কোন দরজা ছিল না। অবশেষে তুব্বা '(আস'আদ আল হিসয়ারী) ছিলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি কা'বার দরজা স্থাপন করেন এবং এতে পারস্য নির্মিত একটি তালা লাগান ও পুরো কা'বা গৃহকে গিলাফ দ্বারা আচ্ছাদিত করেন এবং কা'বার সম্মুখে জন্তু কুরবানী পেশ করেন।[৩]

হযরত 'আলী ইবন আবী তালিব (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে "হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন কা'বা গৃহের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করলেন তখন ইসমাঈলকে আদেশ দিলেন এমন একটি উপযুক্ত পাথর তালাশ করে নিয়ে আসতে যা কা'বা গৃহের এক কোনায় তাওয়াফ কারীদের জন্য তাওয়াফের সূচনা চিহ্ন রূপে স্থাপন করা যায়। হযরত ইসমাঈল পার্শ্ববর্তী সমস্ত পর্বত মালায় অনুসন্ধানের পর এরূপ কোন পাথর না পেয়ে নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন। ইতোমধ্যে হযরত জিব্রাঈল নিয়ে এলেন ঐ পাথরটি যা বর্তমানে হাজার আসওয়াদ নামে অভিহিত। হযরত ইসমাঈল (আ.) যখন দেখতে পেলেন যে হযরত ইবরাহীম একটি পাথর ঐ কোনায় স্থাপন করছেন তখন জিজ্ঞেস করলেন: পিতা আপনি এ পাথর কোথা হতে সংগ্রহ করলেন? তখন তিনি উত্তর দিলেন: ঐ সত্তার পক্ষ থেকে যিনি পাথর সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাকে তোমার মুখাপেক্ষী করে রাখেন নি। মূলত: এ পাথরটি ছিল ঐ পাথর যা হযরত আদম (আ.) কর্তৃক নির্মিত কাবাতে স্থাপন করার জন্য বেহেশত হতে প্রেরিত হয়েছিল। হযরত নূহের প্লাবনে কা'বা গৃহ বিধ্বস্ত হলে উহা আবু কুবাইস পর্বতে সংরক্ষিত হয়। জিব্রাঈল (আ.) কর্তৃক সংগৃহীত এ পাথরটি তখন এত চকচকে শুভ্র ছিল যে এর আলোতে কা'বা গৃহের সমস্ত পারিপার্শ্বিক অঞ্চল আলোকিত হয়ে যেত।"[৪]

হযরত ইবরাহীম (আ.) এর পরবর্তী সময়ের পূন:নির্মাণ ও সংস্কার সমূহ:

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ নির্মাণ:

হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক নির্মিত কা'বা গৃহটি এক সময়ে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তা ভেঙ্গে আমালিকা গোত্রের লোকেরা দ্বিতীয় বারের মত এর পুন:নির্মাণ করেন।[৫]

'আমালিকাদের নির্মিত কা'বা গৃহটি জীর্ণ হয়ে গেলে জুরহুম গোত্রীয় লোকেরা তৃতীয় বারের মত ইহা পুন:নির্মাণ করে।

জুরহুম গোত্রের নির্মিত কা'বা গৃহটি একটি প্রলয়ংকরী প্লাবনের কারণে খুবই ক্ষতিগস্ত হয় তখন কুরাইশগণ চতুর্থবারের মত এর

পুন:নির্মাণের উদ্যোগ নেন। এ সময় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বয়স ছিল ৩৫ বছর তিনি নিজেও এ বারের নির্মাণ কাজে অংশ গ্রহণ করেন। এবারকার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে হাজার আসওয়াদ স্থাপন নিয়ে বেধে যায় এক মহা ফ্যাসাদ। প্রত্যেক গোত্র দাবী করতে লাগল এ সম্মানজনক কাজটি যেন তাদের হাতেই সম্পাদিত হয়। অবশেষে সকলে মিলে একটি বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেন, "যে ব্যক্তি পরবর্তী দিবস প্রত্যুষে একটি বিশেষ দরজা দিয়ে হারামে প্রবেশ করবেন তিনিই লাভ করবেন এ পাথরটি স্থাপন করার বিরল সৌভাগ্য। দেখা গেল যে পরবর্তী দিবস যুবক মুহাম্মদ (সা:) ঐ নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন। এ পাথর স্থাপনের অধিকার লাভ করার পর তিনি একটি চাদর আনার নির্দেশ দিলেন। অতপর তাতে হাজার আসওয়াদটি রাখলেন এবং বলেন: প্রত্যেক গোত্র হতে একজন করে প্রতিনিধি যেন এ চাদরটির কোণায় ধরে পাথরটি বহন করে যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। অতপর যুবক মুহাম্মদ স্বহস্তে পাথরটি কা'বা গৃহের কোণায় স্থাপন করলেন। এভাবে যুবক মুহাম্মদের বিচক্ষণতায় সকলেই বিমোহিত হলেন এবং সমাজ একটি অত্যাসন্ন যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পেল।

পঞ্চম নির্মাণ:

পঞ্চম বারের মত কা'বা গৃহের পুন:নির্মাণ হয় হযরত 'আব্দল্লাহ ইবনুয যুবায়র (রা.) এর হাতে হিজরি ৬৪ সালে। এর কারণ ছিল এই, তিনি এয়াযীদ ইবন মু'আবিয়াহর হাতে আনুগত্যের শপথ নিতে অস্বীকৃতি জানালে এয়াযীদ শপথ করেন ইবনুয যুবায়রকে শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় তার কাছে হাজির করতে হবে। এতে মক্কার এক বিশাল জনতা এয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অতপর হযরত ইবনুয যুবায়রকে বন্দী করার উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রেরণ করা হয় এক বিশাল সেনা বাহিনী। এরা কা'বা গৃহের চুতুষ্পার্শ্বে বেষ্টনী দিয়ে নিকটস্থ আবু কুবাইস পাহাড়ের শীর্ষে মিজাইল স্থাপন করে সেখান থেকে কা'বা গৃহের উপর পাথর বর্ষণ করে। এতে কা'বা গৃহের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। এর অল্প কিছুদিনের মধ্যে এয়াযীদ মারা যায়। হযরত ইবনুয যুবায়র ক্ষতিগ্রস্থ কা'বা গৃহের পুন:নির্মাণের উদ্যোগ নেন। এ সংস্কার কর্মটি পরিচালনাকালে হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদিস হযরত ইবনুয যোবায়রের বিবেচনায় ছিল। উক্ত হাদিসে নবী করীম (সা.) হযরত আয়েশাকে বলেছিলেন: "তোমার গোত্রের লোকেরা জাহেলী যুগের নিকটবর্তী না হলে আমি কা'বা গৃহের পুন:নির্মাণের উদ্যোগ নিয়ে হিজর অংশকে কা'বার অন্তর্ভুক্ত করে নিতাম, এবং কা'বা গৃহের দু'দিকে দুটি ভূমি বরাবর দরজা স্থাপন করতাম। কারণ হযরত ইবরাহীম (আ.) এর নির্মিত কা'বায় হিজর কা'বার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কুরায়শ বংশীয় লোকেরা এতে পরিবর্তন সাধন করেছে।" তাছাড়া কুরাইশগন কর্তৃক কা'বা গৃহের পুন:নির্মাণকালে আবু হুযায়ফা ইবন মুগীরা নামক এক ব্যক্তির পরামর্শে কা'বার দরজাটি উঁচুতে স্থাপিত হয়, যাতে করে কেউ কা'বার দরজাটি সিঁড়ির সাহায্য ব্যতিরেকে এতে প্রবেশ করতে না পারে এবং এর জন্য যেন অনুমতির প্রয়োজন পড়ে। এ হাদিসের আলোকে হযরত ইবনুয যুবায়র হিজর অংশটিকে (হাতীম) মূল কা'বা গৃহের অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং ভূমি সংলগ্ন দুই দিকে দু'টি দরজা স্থাপন করেন। কিন্ত ইবনুয যুবায়র নিহত হওয়ার পর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ যখন মক্কার শাসনভার গ্রহণ করেন তিনি উমাইয়া শাসক আব্দুল মালিক ইবন মারওয়ানের কাছে এ মর্মে অনুমতি চেয়ে পত্র লিখেন যে হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনুয যুবায়র কর্তৃক নির্মিত কা'বা গৃহটি ভেঙ্গে যেন পুন:নির্মাণ করা হয়, আর একে কুরাইশগণ কর্তৃক নির্মিত কা'বার অবস্থায় যেন ফিরিয়ে নেয়া হয়। আব্দুল মালিকের অনুমতি পেয়ে তিনি এর পুন:নির্মাণ করেন। এবং কা'বা গৃহকে কুরাইশদের নির্মাণের আদলে পুন:নির্মাণ করেন।

আব্বাসী খলীফা আল মামুন একবার পরিকল্পনা করেছিলেন কা'বা গৃহকে পুনরায় ইনুয যুবায়রের নির্মাণের অবস্থায় ফিরে নিয়ে পুন:নির্মাণ করার। এ বিষয়ে তিনি 'উলামাদের কাছে পরামর্শ চাইলে হযরত ইমাম মালিক মত প্রকাশ করেন: এভাবে কা'বা গৃহকে বারবার ভাঙ্গা ও গড়ার বস্তুতে পরিণত করলে মানুষের অন্তরে এর মর্যাদাক্ষুন্ন হতে পারে। একথা শুনে খলীফা মামুন এ পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেন।

পরবর্তীকালে আল মসজিদুল হারামের সংস্কার সমূহ:

পরবর্তীকালে মূল কা'বা গৃহ পুন:নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া না হলেও "আল মসজিদ আল হারামের" সংস্কার ও সম্প্রসারণ কর্ম অব্যাহত ছিল। এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিচে দেয়া হল:

(ক) হিজরি ৫৪২ সালে আব্বাসী খলীফা আল মুক্তাফী লি আমরিল্লাহ কা'বা গৃহের ছাদের সংস্কার করেন।

(খ) হিজরি ৫৫০ সালে কা'বা গৃহের চত্তরে নতুন মর্মর পাথরের বিছানা স্থাপন করা হয়।

(গ) হিজরি ৯১৭ সালে হাজরে আসওয়াদকে উন্নত মানের মর্মর পাথরের ফ্রেমে বসানো হয়। তা ছিল সুলতান কানসু গোরীর উদ্যোগে।

(ঘ) হিজরি ১০১০ সালে তুর্কি শাসক সুলতান তৃতীয় মুহাম্মদ কর্তৃক কা'বার দেয়ালের চতুস্পার্শ্বে মর্মর পাথরের অতিরিক্ত গাঁথুনী বসানো হয়।

(ঙ) হিজরি ১০৩৯ সালে তুর্কী শাসক সুলতান মুরাদের শাসনামলে এক বিধংসী প্লাবনে কা'বা গৃহের প্রভূত ক্ষতি সাধন হলে এর ব্যাপক সংস্কার করা হয়। এ সময় হাজরে আসওয়াদটি চার টুকরা হয়ে যায়। তিনি হাজরে আসওয়াদকে মেটালের ফ্রেমে স্থাপন

করান এবং কা'বার দরজাটা পরিবর্তন করে একটি নতুন দরজা স্থাপন করেন।
(চ) হিজরি ১০৭৩ সালে তুর্কী শাসক সুলতান মুহাম্মদ-৪ কা'বা গৃহের ছাদের সংস্কার করান।
(ছ) হিজরি ১১০০ সালে তুর্কী শাসক মুস্তফা-২ এর আমলে নতুন করে কা'বা গৃহের ছাদ ঢালাই করা হয়।
(জ) হিজরি ১২৭৬ সালে তুর্কী শাসক সুলতান আব্দুল মাজীদ কর্তৃক কা'বা গৃহের ছাদের নালাটি স্বর্ণ নির্মিত নালা দিয়ে পুন:স্থাপন করান। যা বর্তমান পর্যন্ত অব্যাহত আছে।
(ঝ) হিজরি ১৩৩১ সালে তুর্কী শাসক সুলতান মুহাম্মদ-৫ হাজরে আসওয়াদের ফ্রেমটি রৌপ্যের ফ্রেমে পরিবর্তন করেন।
(ঞ) হিজরি ১৩৭৭ সালে কা'বা গৃহের ছাদের ব্যাপক সংস্কার কর্ম সাধিত হয় এবং কা'বার অভ্যন্তরে স্থাপিত মর্মর পাথরের টাইলস পুন:স্থাপন করা হয়।
সাউদী সরকারের আমলে কা'বা গৃহের পুরো চত্তরকে সমান চত্তরে পরিণত করে এতে বিছানো হয় বিশেষ ধরণের মর্মর যা প্রচন্ড রৌদ্রের তাপেও উত্তপ্ত হয় না এবং "আল মাসজিদুল হারামের" সম্প্রসারণ কর্ম অব্যাহতভাবে জারী আছে। বর্তমানে "আল মাসজিদুল হারামে একত্রে ২.৫ মিলিয়ন লোক নামায আদায় করতে সক্ষম।

মক্কা বিজয়ের পর নবীজী (সা.) কর্তৃক গৃহীত কয়েকটি পদক্ষেপ :
হিজরি অষ্টম সালে আল্লাহ তা'আলা নবীজীর হাতে মক্কা বিজয়ের সৌভাগ্য দান করেন। তখন আল্লাহর নবী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যে পদক্ষেপটি গ্রহণ করেছিলেন তা ছিল কা'বা গৃহকে শিরক মুক্ত করণ। আল্লাহর রাসূল বিভিন্ন সেনা দলকে আদেশ দিলেন কা'বা গৃহের চতুর্দিকে রক্ষিত মুর্তি সমূহ ভেঙ্গে ফেলতে। তাছাড়া কা'বা গৃহের দেয়ালে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর একটি কল্পিত চিত্র অংকিত ছিল, এতে দেখানো হয়েছিল হযরত ইবরাহীম যেন তীর ধনুকের সাহায্যে ভাগ্য পরীক্ষা করছেন। আর ছিল হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর মাতা মরিয়মের ছবি সহ আরো কিছু ফেরেশতার কল্পিত ছবি। নবী করীম হযরত ফদল ইবন 'আব্বাস (রা.) ইবন আব্দিল মুত্তালিবকে আদেশ দিলেন যমযমের পানি দিয়ে কাপড় ভিজিয়ে এসব চিত্র মুছে দিতে। অতপর নবী কারীম একটি খচ্চরের পীঠে আরোহণ করে কা'বা গৃহের তাওয়াফ করলেন। তাওয়াফের পর নবী কারীম (সা.) কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে চাইলেন। কা'বার চাবি ছিল 'উসমান ইবন তালহার কাছে। নবীজী তার নিকট থেকে চাবি নিয়ে কা'বা গৃহের দরজা খুললেন, স্বাভাবিকভাবে 'উসমান ধরে নিয়েছিলেন যে দীর্ঘদিন ধরে নবীজীর সাথে শত্রুতামূলক সম্পর্ক অব্যাহত থাকার পর বিজয়ের মাধ্যমেই যেহেতু আল্লাহর রাসূল কা'বা গৃহের কর্তৃত্ব লাভ করেছেন তাই কা'বার রক্ষাণাবেক্ষণের (হিজাবাহ) দায়িত্বটি তিনি তার বিশ্বস্ত- কাউকে প্রদান করবেন। কিন্তু মহান দয়ালু নবী প্রয়োজন শেষে চাবিটি শুধু যে 'উসমান ইবন তালহার হাতে ফিরিয়ে দিলেন তা নয়, বরং এ মর্মে ঘোষণা দিলেন যে "এখন থেকে এ অধিকার বংশ পরম্পরায় রোজ কেয়ামত পর্যন্ত- তোমাদের গোত্রের জন্য সংরক্ষিত থাকল"। এর চাইতে মহানুভবতার উত্তম নিদর্শন আর কি হতে পারে।[৬]
মক্কা বিজয়ের পরবর্তী বছর তথা হিজরি নবম সালে নবীজী হযরত আবু বকর (রা.) এর নেতৃত্বে ছাহাবাদের একটি দলকে হজ্ব পালন করতে পাঠান। তখন হযরত আলী (রা.) কে নবীজীর পক্ষ থেকে চারটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা দানের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়। এ ঘোষণা সমূহ হচ্ছে যথাক্রমে:
(ক) এখন থেকে কোন ব্যক্তি উলঙ্গ হয়ে কা'বা গৃহের তাওয়াফ করতে পারবে না।
(খ) মুমিন ব্যতীত কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করার আশা করতে পারে না।
(গ) এখন থেকে কোন অমুসলিম "আল মাসজিদ আল হারামে" প্রবেশ করতে পারবে না।
(ঘ) যাদের সাথে সন্ধি চুক্তি সহ বিভিন্ন ধরণের চুক্তি স্বাক্ষরিত আছে তা পরবর্তী চার মাস পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এরপর এর কার্যকারীতা শেষ হয়ে যাবে।

নবীজীর হজ্ব:
পরবর্তী বছর অর্থাৎ হিজরি দশম সালে নবী কারীম (সা.) সম্পূর্ণ ইসলামী পরিবেশে পবিত্র হজ্ব আদায় করেন যা ছিল নবীজীর জীবনে আদায়কৃত একমাত্র হজ্ব এবং পরিপূর্ণ ইসলামী কায়দায়। এ বছর কোন অমুসলিম হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে গমন করতে পারেনি। তখন থেকে বর্তমান পযন্ত এ ধারা অব্যাহত আছে।

কা'বা গৃহকে গিলাফ দ্বারা আবৃত করণ প্রসঙ্গে :
মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ আছে যে কা'বা গৃহকে সর্ব প্রথম যিনি গিলাফ দ্বারা আবৃত করেছিলেন তিনি ছিলেন ইয়ামানের শাসনকর্তা আস'আদ আল হিময়ারী তাঁর উপাধী ছিল "তুব্বা"। তিনি নাকি স্বপ্নে দেখেছিলেন যে কা'বা গৃহের গায়ে গিলাফ চড়াচ্ছেন, অতপর তিনি ইয়ামানে তৈরী উৎকৃষ্ট কাপড় দ্বারা এর গিলাফ চড়ান। এ প্রসঙ্গে নবীজী (সা.) থেকে হযরত আবু

হুরায়রাহ বর্ণিত একটি হাদীসের উল্লেখ করা যায়, হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) বলেন: "আল্লাহর রাসূল (সা.) আস'আদ আল হিময়ারীর সমালোচনা করতে নিষেধ করেছেন, কারণ তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি কা'বা গৃহকে গিলাফ দ্বারা আবৃত করেছিলেন"। (৭)
জাহেলী যুগেও এ ধারা অব্যাহত ছিল। তখন প্রত্যেক গোত্রকে কা'বার আচ্ছাদন খরীদের ব্যয়ভার বহনে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণ করতে হত। অতপর আবু রবী'আহ ইবনুল মুগীরা নামক বনু মখযুমের একজন ব্যবসায়ী যিনি ইয়ামানে ব্যবসা করে প্রভুত অর্থের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি ঘোষণা করলেন: "এক বছর কুরাইশরা সম্মিলিতভাবে এর গিলাফ চড়াবে আর এক বছর আমি একাই চড়াব।" তার মৃত্যু পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত ছিল।

ইসলামী যুগে কা'বার গিলাফ চড়ানো প্রসঙ্গে

বর্ণিত আছে যে নবী করীম (সা.) একদা আশুরা দিবসে জনতার উদ্দেশ্যে একটি খুৎবা প্রদান করেন। তিনি বলেন: "অদ্য হচ্ছে আশুরার দিবস। যেদিন পূর্ববর্তী বছর অতিক্রান্ত হয়ে একটি নতুন বছর শুরু হয়, যেদিনটিতে কা'বা গৃহের গায়ে গিলাফ চড়ানোর দিবস.... এ দিন তোমাদের উপর রোজা ফরয করা না হলেও আমি রোযা করে থাকি। তোমাদের মধ্যে যারা ইচ্ছা করবে রোযা করতে পার"।(৮)
ইবন জুরায়জ বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে কুরাইশদের মধ্যে এ রীতি প্রচলিত ছিল যে প্রতি বছর আশুরার দিবস যখন হাজীগণ হজ্ব শেষে বাড়ী ফিরে যেত তখন এ দিবসে কা'বার গায়ে নতুন গিলাফ চড়ানো হত। অবশেষে বনু হাশিমের লোকেরা যিল হিজ্জাহ মাসের ৭ম তারিখে এতে রেশমী কামিয চড়ানোর রীতি চালু করলেন যাতে করে হজ্বের উদ্দেশ্যে আগত লোকজন এর গায়ে নতুন গিলাফ দৃষ্টে বিমোহিত হয়। আর আশুরার দিবসে স্বাভাবিক নিয়মেই চাদর চড়ানোর প্রথাও চালু ছিল। নবী কারীম (সা.) কা'বাকে ইয়ামানী বস্ত্র দ্বারা আছাদিত করেছিলেন, হযরত উমর ও উসমান (রা.) কুবাতী কাপড় দ্বারা একে আচ্ছাদিত করেন, পরবর্তীতে হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ এর গায়ে রেশমী গিলাফ চড়ান। আব্বাসীয় খলীফা আল মামুনের শাসন আমলে কা'বা গৃহকে প্রতি বছর তিন বার করে গিলাফ দ্বারা আবৃত করা হত। অতপর ২০৬ হিজরিতে তিনি ১লা রজব তারিখে কুবাতী বস্ত্র দ্বারা, ২৭শে রমযান তারিখে শুভ্র রেশমী চাদর দ্বারা এবং ৭ই যিল হিজ্জাহ তারিখে লাল রেশমী চাদর দ্বারা গিলাফ চড়ান।(৯)
এ প্রথা অদ্যাবধি অব্যাহত আছে তবে বর্তমানে কৃষ্ণ বর্ণের রেশমী গিলাফই শুধু চড়ানো হয়ে থাকে।

কা'বার নাম সমূহ:

(ক) আল হারাম আল মাক্কীর সর্বাধিক প্রচলিত নাম হচ্ছে কা'বা। যার অর্থ হলো চতুষ্কোন বিশিষ্ট বস্ত্র। ইংরেজীতে এর প্রতিশব্দ হচ্ছে Cubic, আকারে চতুষ্কোণ হওয়ার দরূণ কা'বা গৃহ এ নামে পরিচিত।
(খ) এর অন্য নাম হচ্ছে বক্কা। কারো কারো মতে বক্কা হচ্ছে মূলত: মক্কা নগরীর বিকল্প নাম, আর কারো মতে মক্কা হচ্ছে পুরো অঞ্চলের নাম, আর বক্কা হচ্ছে ঐ স্থানের নাম যার উপর কা'বা গৃহটি নির্মিত। বক্কা নাম করণের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে যত বড়ই স্বৈরাচারী ব্যক্তি হোক না কেন এখানে আসলে তার সকল দম্ভ বিচূর্ণ হতে বাধ্য, তাই এর নাম বক্কা।
(গ) এর অন্যান্য নাম সমূহ হচ্ছে আল বায়ত আল 'আতীক্ব'। (আল কুরআন ২২:২৯, ২২:৩৩)
(ঘ) আল মাসজিদ আল হারাম (আল কুরআন: ২:১৪৪, ২:১৪৯, ২:১৫০, ২:১৯১, ২:১৯৬ ২:২১৭, ৫:২, ৮:৩৪, ৯:৭, ৯: ১৯, ৯: ২৮, ১৭:১, ২২: ২৫, ৪৮:২৫, ৪৮:২৭
(ঙ) আল বায়ত আল হারাম (আল কুরআন, ৫:২, ৫:৯৭)
(চ) হারম (আল কুরআন ২৮: ৫৮, ২৯:৬৭)
(ছ) আল বায়ত অর্থাৎ বায়তুল্লাহ। (আল কুরআন: ২:১২৫, ২:১২৭, ২:১৫৮, ৩:৯৭, ৮:৩৫)

আল মাসজিদ আল হারামের মর্যাদা ও বরকত সমূহ :

(ক) জাহেলী যুগে এর বরকত সমূহ :

পবিত্র আল কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী পবিত্র কা'বা গৃহ হচ্ছে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য নির্মিত সর্বপ্রথম গণ ইবাদতগাহ। এমনকি জাহেলী যুগেও যখন মানুষ প্রকৃত হেদায়েতের পথ হতে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল কা'বা গৃহের বরকত ও মর্যাদা ছিল অসামান্য। এ গৃহটি শুধু যে একটি পবিত্র গণ উপাসনালয় হিসেবে চিহ্নিত ছিল তা নয়, বরং ইহা আপন মর্যাদার কারণে পুরো দেশের আর্থ সামাজিক জীবনের কেন্দ্র বিন্দু হিসেবেও চিহ্নিত ছিল। সমগ্র দেশ থেকে মানুষ এখানে হজ্ব ও ওমরাহ পালন করার উদ্দেশ্যে একত্রিত হতো এবং এ সম্মেলনের ফলে বহুধা বিভক্ত আরব জাতির মধ্যেও ঐক্যের এক সম্পর্ক সৃষ্টি হতো। বিভিন্ন অঞ্চল ও বিভিন্ন গোত্রের লোকদের মধ্যে সৃষ্টি হতো নানা ধরণের আর্থ-সামাজিক চুক্তি। এ মওসুমে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সাহিত্য ও কাব্য প্রতিযোগিতার কারণে তাদের ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট অগ্রগতি সাধিত হয়। সে মওসুমে অনুষ্ঠিত বাণিজ্য মেলার কারণে দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাধিত হত। বছরের চারটি মাসকে হজ্ব ও উমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মহা পবিত্র মাস হিসেবে গন্য করা হত। এগুলো হচ্ছে: রজব, যুল ক্বা'দাহ, যুল হিজ্জাহ ও মুহাররাম। রজব মাসে উমরাহ পালন করা হতো, আর বাকী তিন মাসে পালন করা হতো হজ্ব। এ চারটি মাসকে পবিত্র মাস হিসেবে জ্ঞান করার ফলে অশান্ত আরবের মতো একটি দেশে অন্তত: বছরের এক তৃতীয়াংশ সময় শান্তি বিরাজ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হতো। এ সময়ে দেশের লোকেরা নিরাপদে দেশের এক প্রান্ত- থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে পারত। এমনকি কোন রাহাজানের পক্ষেও এ সময় কোন কাফেলার প্রতি হস্তক্ষেপের দুঃসাহস হতো না। বস্তুত: এ ছিল কা'বার বদৌলতে প্রাপ্ত নিরাপত্তা ও বিশেষ সুবিধা যা আরবদের জন্য ছিল

এক অসাধারণ নেয়ামত বিশেষ।[১০]

(খ) পবিত্র কা'বার মর্যাদা সম্পর্কে পবিত্র আল কুরআনে বিধৃত কয়েকটি আয়াত:

১. সূরাতু আল-ইমরানের ৯৬-৯৭ আয়াতে এরশাদ হচ্ছে:

"বস্তুত সর্ব প্রথম গৃহ যা গণ ইবাদতগাহ রূপে নির্মিত হয়েছে তা হচ্ছে ঐ গৃহ যা বক্কা (মক্কা) তে অবস্থিত। অত্যন্ত বরকতময় এ গৃহ এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েতের কেন্দ্র রূপে চিহ্নিত। এতে রয়েছে বহু সুস্পষ্ট নির্দেশনাবলী যেমন মাক্বামে ইবরাহীম। আর যে কেউ এতে প্রবেশ করবে সে সব ধরনের (অবৈধ) হস্তক্ষেপ হতে নিরাপত্তা প্রাপ্ত হবে"।

২. সুরাতু 'আন্‌কাবুতের ৬৭ নং আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে:

"এরা কি লক্ষ্য করেনি যে আমি হারামকে [কা'বা গৃহ ও এর চতুর্দিকের চিহ্নিত অঞ্চল] নিরাপদ করে দিয়েছি? অথচ এর চতুস্পার্শ্বস্থ অঞ্চল থেকে মানুষদেরকে ছিনতাই করে উঠিয়ে নেয়া হয়ে থাকে।"

৩. সুরাতু আল বাক্বারার ১২৫ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"ঐ ঘটনাকে বিশেষভাবে স্মরণ কর যখন আমি উক্ত গৃহ [কা'বা] কে মানব গোষ্ঠীর জন্য কেন্দ্র ও শান্তি স্থানে পরিণত করেছি (আর আমি হুকুম দিয়েছি যে) মাক্বামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থানে পরিণত কর, আর আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে বিশেষ ভাবে নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার ঘরকে তাওয়াফ আদায়কারী, ইতিকাফ গ্রহণকারী এবং রুকু'ও সেজদা আদায়কারীদের উদ্দেশ্যে পাক পবিত্র করে রেখো।"

৪. পবিত্র আল কুরআনের ১০৬ নং সূরা যা সুরাতুল ফীল নামে অভিহিত এতে কুরায়শদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে: "কুরাইশদের মনোবাঞ্ছা পুরণের কারণে, তথা শীতকালীন এ গ্রীষ্মকালীণ বাণিজ্য সফর সমূহে তাদের বিশেষ মর্যাদার কারণে। তাদের উচিৎ তারা যেন এ (কা'বা) গৃহের প্রতিপালকের ইবাদতে নিবেদিত হয়, যিনি তাদেরকে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়ে আহার্য-সরবরাহ করেছেন এবং ভয় ভীতি হতেও দিয়েছেন পরিত্রাণ।"

৫. সূরাতুল হজ্ব এর ২৭-২৮ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে:

"আর তুমি (হে ইবরাহীম) লোকদের উদ্দেশ্যে হজ্বের আহবান জানাও, যেন তারা পায়ে হেঁটে এবং বহু দূর দুরান্ত অঞ্চল থেকে কৃশকায় উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণ করে তোমার কাছে এসে পৌছে। যাতে করে তারা প্রত্যক্ষ করে এতে তাদের জন্য কি কি (ঐহিক ও পারলৌকিক) কল্যাণ রয়েছে, আর আল্লাহ তাদেরকে যে চতুস্পদ জন্তু রিযিক দান করেছেন তাতে যেন নির্দিষ্ট দিবস সমূহে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে (কুরবানী দান করে) অতপর সেখান থেকে তোমরা নিজেরা খাও এবং নিঃস্ব দরিদ্রদেরকে খেতে দাও"।

এ রূপ পবিত্র আল কুরআনের আরো বহু আয়াতে পবিত্র হারাম শরীফের মর্যাদার কথা উল্লেখ আছে। আলোচনা দীর্ঘায়িত হওয়ার ভয়ে এখানে এ আলোচনার ইতি টানলাম। হযরত ইবরাহীম (আ.) আজ থেকে চার হাজার বছর পূর্বে জনতার উদ্দেশ্যে হজ্বের যে আহবান জানিয়েছিলেন সে আহবানে সাড়া দিয়ে এখনও পর্যন্ত পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে হজ্বের মৌসুমে অন্তত: ত্রিশ লক্ষ লোক এখানে সমবেত হয় হজ্বের উদ্দেশ্যে। তাছাড়া সারা বছর ধরে চলতে থাকে স্থানীয় লোকজন ও উমরাহর উদ্দেশ্যে আগত লোকদের তাওয়াফ তথা এর চতুস্পার্শ্বে সাত চক্কর প্রদক্ষিণ। যা দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য চিহ্নিত জামাতের সময় বাদ দিয়ে বাকী সময়ের পুরোটাই জুড়ে। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে: "সপ্তম আকাশের উপরে ঠিক আরশের নীচে ও কা'বা গৃহের ঠিক উপরে রয়েছে আরেকটি গৃহ যার নাম "আল বায়ত আল মা'মূর"। দৈনিক সত্তর হাজার ফেরেশতা ঐ গৃহের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করে থাকে।"[১১] আমার মনে হয় কা'বা গৃহের চতুর্দিকে প্রত্যহ যে সংখ্যক লোক তাওয়াফ করে থাকে তাদের সংখ্যাও ৭০০০০ (সত্তর হাজার) এর কম হবে না।

আল মাসজিদ আল হারামের অন্যান্য মর্যাদা সমূহ:

আল মাসজিদ আল হারাম বা বায়তুল্লাহ শরীফের অন্যান্য মর্যাদা সমূহের মধ্যে রয়েছে,

(ক) ইহা সমগ্র মুসলিম উম্মাহর কিবলা, তথা প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্ছ পর্যন্ত মুসলমানরা যেখানেই থাকুক না কেন তাদেরকে সকল প্রকার নামাযের সময় কিবলার দিকে মুখ করতে হয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করছেন।

﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ (البقرة: ١٤٤)

অর্থাৎ "আর তোমরা যেখানেই থাক না কেন আল মাসজিদ আল হারামের দিকে মুখ করে নামায আদায় করবে। (২:১৪৪)

(খ) প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের উপর জীবনে একবার আল মাসজিদুল হারামে হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে আগমন করা ফরজ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (آل عمران: ١٩٧)

অর্থাৎ: "আল্লাহর উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহর হজ্বকর্ম সম্পাদন করা জনগণের উপর এক অবশ্যম্ভাবী কর্তব্য। (৩:৯৭)

উল্লেখযোগ্য যে এ আয়াতে হজ্বের আহ্বান শুধু যে মুসলিম উম্মাহর প্রতি তা নয় বরং ইহা তাবৎ মানব গোষ্ঠীর প্রতি একটি সাধারণ কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে আল কুরআনের অন্য একটি আয়াতে আরো সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে হযরত ইবরাহীমকে কা'বা গৃহের প্রতি হজ্বের আহবান জানানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তাবৎ মানব গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে। যথা-

﴿وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق﴾ (الحج: ٢٧)

অর্থাৎ: এবং জনতার উদ্দেশ্যে হজ্বের আহবান জানাও, তারা যেন তোমার আহবানে সাড়া দিয়ে পদব্রজে এবং প্রত্যেক কৃষকায় উষ্ট্রীর পীঠে আরোহণ করে এসে হাজির হয় দূর দূরান্তের রাস্তা পাড়ি দিয়ে। (২২:২৭)

(গ) আল মাসজিদুল হারামে হজ্বের জন্য গমণ মিল্লাতে ইবরাহীমির প্রকৃত অনুসারীদের বার্ষিক সম্মেলন:

হজ্ব ও এ মৌসুমে পালনকৃত সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মিল্লাতে ইবরাহীমির সঠিক অনুসারীদের পারস্পারিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ, দ্বীনে ইসলামের প্রকৃত তত্ত্ব ও মহান উদ্দেশ্য সমূহ নবায়নের একটি উৎকৃষ্ট পন্থা। এ প্রসঙ্গে পবিত্র আল কুরআনের নিম্নোক্ত ঘোষণাটি প্রনিধানযোগ্য:

﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات والأرض وأن الله بكل شئ عليم﴾ (المائدة: ٩٣)

অর্থাৎ: "আল্লাহ কা'বা তথা পবিত্র গৃহকে মানব গোষ্ঠীর অস্তিত্বের জন্য রক্ষা কবচ করেছেন। আর সম্মানিত মাস, কুরবানীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত জন্তু ও এ জন্তু গলায় স্থাপিত চিহ্ন সমূহকেও। ইহা এজন্যই যে যাতে করে তোমরা জ্ঞাত হও যে আল্লাহ তা'আলা আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে তার সকল বিষয়ে জ্ঞান রাখেন এবং আল্লাহ হচ্ছেন সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।" (৫:৯৭)

(ঘ) আল মাসজিদ আল হারামকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত লক্ষ লক্ষ মুসলিম জনতা একত্রিত হয় হারামের চত্তরে। এদের মধ্যে রয়েছে আলেম উলামা, চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবি, দার্শনিক, পন্ডিত, কবি সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ, শাসক, রাষ্ট্র প্রধান, রাজন্যবর্গ, কুটনীতিক, এবং সাধারণ মানুষ। ধনী দরিদ্র নির্বিশেষ সকলেই অভিন্ন পরিধেয় পরিহিত হয়ে পরস্পরে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমস্বরে উচ্চারণ করে লাব্বায়েক আল্লাহুমা লাব্বায়েক, আর এক সাথে প্রদক্ষিণ করে আল্লাহর ঘরের চতুর্দিকে অভিন্ন প্রেম উচ্ছাস নিয়ে। এভাবে তাদের অন্তরে জাগ্রত হয় ইসলামী সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের এক উৎকৃষ্ট চেতনা ও এর প্রত্যক্ষ বাস্তবায়ন। তারা এ কথা বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে গায়ের রং, মুখের ভাষা ও রীতিনীতির ভিন্নতা সত্ত্বেও বিশ্বের তাবৎ তাওহীদী জনগোষ্ঠী তাদের চিন্তা-চেতনা, আকীদা বিশ্বাস এবং আল্লাহর বান্দা হিসেবে অভিন্ন। বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েতের উৎসস্থল ও স্থায়ী কেন্দ্র মক্কা নগরী থেকে লাভ করে ইসলামের মহান শিক্ষা ও পরবর্তী জীবনের জন্য এক বিশেষ পথ নির্দেশ।

(দুই) আল হারাম আল মাদানী বা মসজিদুর রাসূল (সা.)

হযরত ইবরাহীম (আ.) পবিত্র কা'বা গৃহ নির্মাণ কর্ম সমাপ্ত করে যে দু'আটি করেছিলেন তা বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য দু'আটি নিম্নরূপ:

﴿وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم﴾ (البقرة: ١٢٧)

অর্থাৎ: "ঐ ঘটনার কথা স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম আর ইসমাঈল (পিতা পুত্র দু'জনে) মিলে কা'বা গৃহের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিল আর আল্লাহর কাছে এ বলে দু'আ করেছিল: প্রভু হে! আমাদের এ প্রচেষ্টা আপনি কবুল করে নিন। আপনিইতো শ্রবণকারী ও সর্বজ্ঞ। প্রভু হে! আমাদের উভয়কেই আপনার প্রতি আত্মসমর্পনকারী ও অনুগত করে রাখুন, আর আমাদের বংশধারা হতেও আপনার প্রতি অনুগত একটি (মুসলিম) উম্মাহ সৃষ্টি করে দিন। আর আমাদেরকে বাতলিয়ে দিন আমাদের ইবাদতের (হজ্বের) নিয়ম কানুন সমূহ, আর আমাদের পাপ সমূহ মাফ করে দিন। আপনিইতো তাওবা কবুলকারী, দয়াময়। প্রভু হে! এদের মধ্য থেকেই প্রেরণ করুন একজনকে রাসূল রূপে, যিনি এদের কাছে পাঠ করে শুনাবেন আপনার আয়াত সমূহ, আর যিনি তাদেরকে শিক্ষা দিবেন কিতাব ও হিকমাহ আর তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে তুলবেন। আপনি হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, সুবিজ্ঞ।" [২:১২৭-১২৯]

ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর যে সন্তানকে সাথে নিয়ে দু'আ করেছিলেন তাদের বংশধরদের মধ্য হতে একটি মুসলিম উম্মাহ সৃষ্টির এবং এ জনপদে তাদেরই মধ্য হতে একজনকে রাসূল রূপে প্রেরণ করার জন্য। হযরত ইবরাহীম (আ.) এ দু'আ করার পর দীর্ঘ আড়াই হাজার বছর পর্যন্ত তার কনিষ্ট সন্তান ইসহাকের বংশধারা হতে হাজার হাজার নবী রাসূল প্রেরিত হলেও তাদের কেউ নিজেরদকে মুসলিম উম্মাহ হিসেবে আখ্যায়িত করেননি। দীর্ঘ আড়াই হাজার বছর পর বনু ইসমাঈল হতে মাত্র একজন নবীর আগমন ঘটল (যেমনটি হযরত ইবরাহীম তার দু'আয় উল্লেখ করেছিলেন) কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক প্রার্থিত এ নবীর আগমনের পর খোদ ইসমাঈলের বংশধাররা যারা কুরাইশ নামে পরিচিত ছিল এ নবীকে চরমভাবে প্রত্যাখ্যান করল। অবশেষে তিনি নবুওয়াত লাভের পর দীর্ঘ তের বছর পর্যন্ত অব্যাহতভাবে দাওয়াত দিয়েও কোন সন্তোষজনক সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। বরং নবীজীর দাওয়াত গ্রহণকারী মুষ্টিমেয় ও দূর্বল অনুসারীদের উপর চালানো হয় অমানবিক নির্যাতন। এক পর্যায়ে খোদ নবী করীম (সা.) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র পাকাপোক্ত করা হয়। পক্ষান্তরে ইয়াছরিব নামক একটি অঞ্চলের লোকেরা নবীজীর দাওয়াত গ্রহণ করেন এবং এক পর্যায়ে তারা নবীজীকে তাদের অঞ্চলে হিজরাতের দাওয়াত দেন। ইয়াছরিব ছিল নবীজীর মাতুলালয় এবং মক্কা হতে উত্তর দিকে সিরিয়ার পথে আড়াই শতাধিক মাইল দূরে অবস্থিত একটি কৃষি প্রধান অঞ্চল। প্রথমে নবীজী তাঁর অনুসারীদেরকে পর্যায়ক্রমে ইয়াছরিবে হিজরাত করার অনুমতি দিলেন। এক পর্যায়ে নবীজীও হযরত আবু বকর (রা.) কে সঙ্গে নিয়ে মদীনার পথে রওয়ানা দিলেন। এ দিনটি ছিল ঐ মুহূর্ত যে রাতে কুরাইশরা সম্মিলিতভাবে নবীজীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁর বাড়ী ঘেরাও করেছিল। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় নবীজী সকল ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে নিরাপদে শেষতক ইয়াছরিবে এসে পৌছান। সেদিন থেকে ইয়াছরিব মদীনাতুর রাসূল বা সংক্ষেপে মদীনা নামে পরিচিত হয়। মদীনায় পৌছে ১২দিন মদীনার প্রবেশ পথে নবীজী ক্বোবা নামক একটি স্থানে অবস্থান করেন। তথায় একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, যা মসজিদে ক্বোবা নামে পরিচিত। এ মসজিদটি ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম মসজিদ। দ্বাদশ

আল্লাহর রাসূল (সা.) ক্বোবা হতে মূল মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন এ দিনটি ছিল জুমাবার। পথিমধ্যে বনু সালিম গোত্রে এসে পৌছালে সেখানে জুমার সময় উপনীত হয় এবং নবীজী ইসলামের ইতিহাসে প্রথম জুমার নামায আদায় করেন। নামায শেষে আল্লাহর রাসূল পুনরায় রওয়ানা দিলেন। মদীনার প্রায় প্রতিটি পরিবারই ইসলামী পরিবার। প্রত্যেকের একান্ত বাসনা নবীজী তাদের কাছেই অবস্থান করবেন। নবীজী হযরত আবু বকর সহ কোছওয়া নামক একটি উষ্ট্রীর পিঠে আরোহণ করলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে উষ্ট্রীকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হবে। উষ্ট্রী যে পরিবারের চৌহদ্দীতে গিয়ে যাত্রা বিরতি করে সেখানেই তিনি অবস্থান করবেন। অবশেষে উষ্ট্রী হযরত আবু আইয়ুব আনছারীর বাড়িতে এসে হাঁটু গেড়ে বসে গেল। আর আল্লাহর রাসূল সেখানেই অবতরণ করলেন। নবীজীর মেহমানদারীর সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে আবু আইয়ুব আনছারী আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করলেন।

আল্লাহর রাসূল (সা.) মদীনায় অবস্থান গ্রহণের পর সর্ব প্রথম যে কাজের পরিকল্পনা করেন তা ছিল তথায় একটি মসজিদ নির্মাণের। পাশেই ছিল একটি খালি জায়গা। নবীজী এটাকে মসজিদ নির্মাণের জন্য উপযুক্ত মনে করলেন। অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন যে দু'জন এয়াতীম বালক ঐ স্থানটির মালিক। তিনি বালক দু'জনকে ডেকে পাঠিয়ে নিজের পরিকল্পনার কথা ব্যক্ত করলেন এবং ঐ জমিতে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি চাইলেন। বালকদ্বয় সানন্দে ঐ জমিটুকু বিনামূল্যে দান করতে প্রস্তুত হল, কিন্তু নবীজী কিছুতেই বিনা মূলে তা নিতে রাজী হলেন না। এ জমির মূল্য নির্ধারিত হল দশটি স্বর্ণ মুদ্রা। হযরত আবু বকর (রা.) নিজে এর মূল্য পরিশোধ করলেন।[১২]

কয়েক দিনের মধ্যেই সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হয়ে গেল। নবীজী নিজেও এ মসজিদের নির্মাণ কার্যে অংশগ্রহণ করলেন। কার্যত: এ মসজিদটিই মুসলিম বিশ্বের কাছে "আল হারাম আল মাদানী" বা মাসজিদুর রাসূল নামে পরিচিত। যার মর্যাদা হচ্ছে মাসজিদুল হারামের পর দ্বিতীয় এবং আল হারামাইন আল শরীফাইন এর অন্যতম।

আমি এ আলোচনায় আল হারাম আল মাদানীর দু'টি দিক ভিন্ন ভিন্নভাবে তুলে ধরায় চেষ্টা করব।

এক: আল হারাম আল মাদানী তথা মাসজিদুর রাসূলের মর্যাদা ও গুরুত্ব

দুই: এর নির্মাণ, পুন:নির্মাণ ও সংস্কার কর্ম সমূহের বিবরণ।

১. মাসজিদুর রাসূল (সা.) এর মর্যাদা ও গুরুত্ব সমূহ:

মাসজিদুর রাসূল (সা.) তথা আল হারাম আল মাদানীর মর্যাদা এত বেশী যে তা পরিপূর্ণ রূপে বর্ণনা করতে গেলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন। তবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মধ্যেই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করব।

(ক) পবিত্র আল কুরআনে একটি আয়াতে একটি মসজিদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে যে,

[لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه.....]

অর্থাৎ: "প্রথম দিবস থেকে যে মসজিদটির ভীত তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত তোমার জন্য তাতে নামাযের জন্য দাঁড়ানোর অধিকতর যুক্তিযুক্ত।" (৯:১০৮)

এ আয়াতে কোন মসজিদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে সে বিষয়ে তাফসীরকারদের মধ্যে একাধিক মত থাকলেও হযরত আবু সা'ঈদ আল খুদরী বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে আল্লাহর রাসূল বলেছেন: "তা হচ্ছে আমার মসজিদ।" অর্থাৎ আল হারাম মাদানী। এতে করে বুঝা গেল যে পবিত্র কা'বা গৃহকে বাদ দিলে এ মসজিদের চাইতে অধিকতর মর্যাদাবান আর কোন মসজিদ নেই।

(খ) এ পবিত্র মসজিদের পরিকল্পণা, জমি খরীদ, নির্মাণ ও দৈনন্দিন রক্ষাণাবেক্ষণের কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন খোদ নবী কারীম (স:) ও তাঁর শ্রেষ্ঠ ছাহাবীদের দল তথা মুহাজির ও আনছারগণ। যা এ মসজিদের মর্যাদাকে অনেক গুণ বৃদ্ধি করেছে।

(গ) খোদ নবী কারীম (সা.) সময়ে সময়ে এ মসজিদের বিশেষ মর্যাদার কথা ব্যক্ত করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে আল্লাহর রাসুল ঘোষণা করেছেন: "আমার এ মসজিদে নামায আদায় করলে অন্য মসজিদের চাইতে এক হাজার গুণ অধিক ছাওয়াব রয়েছে।" যা আল মসজিদুল হারামের পরেই এর অবস্থান চিহ্নিত করে।

(ঘ) একটি হাদিসে উল্লেখ আছে, হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে আল্লাহর রাসূল এরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার মসজিদে কোন ওয়াক্ত বাদ না দিয়ে এক নাগাড়ে চল্লিশ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে তার জন্য দোযখ হতে নিষ্কৃতি ও পরকালে মুক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে। [১৩]

হযরত আবু হুরায়রাহ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে আল্লাহর রাসূল এরশাদ করেছেন "তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করিও না। আর তা হলো: আমার মসজিদ, আল মসজিদ আল হারাম এবং আল মসজিদ আল আকছা।"

(ঙ) আল মসজিদ আল নববী তথা আল হারাম আল মাদানীর আর একটি মর্যাদা হচ্ছে এই, খোদ নবী কারীম (সা.) এর চত্তরেই শুয়ে আছেন। এবং সশরীরে জীবিত অবস্থাতেই কবরে বিদ্যমান। একটি ছহীহ হাদীসে উল্লেখ আছে যে আল্লাহ তা'আলা মাটির জন্য তাঁর নবীদের শরীরকে হারাম করে দিয়েছেন।

(চ) আল হারাম আল মাদানীর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে নবীজীর রওযাহ ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানটি জান্নাতের বাগিচার একটি টুকরা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ মর্মে একটি বিশুদ্ধ হাদীসে নিম্নরূপ উল্লেখ আছে:

"আল্লাহর রাসূল এরশাদ করেছেন: আমার কবর ও মিম্বারের মধ্যবর্তী স্থানটি জান্নাতের রওযাহ সমূহের অন্যতম।"

(ছ) এ মসজিদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এ মসজিদের অভ্যন্তরে নবীজী এবং নবীজীর পরিবারের সদস্য গণের বাসস্থান নির্মিত হয়।
(জ) এ মসজিদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে নামাযের বাইরেও এতে উচ্চ স্বরে কোন কথা বলা নিষিদ্ধ। যেমনটি নবী করীম এর জীবদ্দশায় ছিল। কারণ মুসলমানদের প্রতি পবিত্র আল কুরআনের একটি নির্দেশ রয়েছে যে তারা যেন রাসূল (সা.) এর চাইতে উচ্চস্বরে কোন কথা না বলে। সুতরাং সে নির্দেশ এখনও বলবৎ রয়েছে। এবং এ বৈশিষ্ট্য শুধু মাত্র আল হারাম আল মাদানীর জন্যই।
(ঝ) মসজিদুর রাসূল (সা.) এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই, কেউ যথাযথভাবে পবিত্রতা অর্জন করে মসজিদুর রাসূল (সা.) এ নামায আদায় করলে সে এক হজ্বের সমান ছাওয়াব অর্জন করবে। তাছাড়া মসজিদে ক্বোবাতে দু'রাকাত নামায আদায় করলে উমরাহ আদায়ের মত ছাওয়াব অর্জন করবে।
এ প্রসঙ্গে হযরত আবু উমামা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখ আছে যে নবী কারীম (সা.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি সুন্দরভাবে ওযু করে আমার মসজিদে একমাত্র নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে গমন করে নামায আদায় করবে সে যেন একটি হজ্ব পালন করল।"
(ঞ) এ মসজিদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, ইহা শুধু একটি মসজিদ ছিল না। বরং ইহা ছিল একাধারে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও ট্রেনিং একাডেমী, একটি সেক্রেটারিয়েট যেখান হতে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ঘোষণা সমূহ জারী করা হত, এ মসজিদ ছিল একটি বিচারালয় যেখানে বসে নবী কারীম (সা.) এবং পরবর্তীতে হযরত আবু বকর ও উমর (রা.) সকল গুরুত্বপূর্ণ বিচার কার্য সম্পাদন করতেন, ইহা ছিল একটি সেনা সদর যেখান থেকে শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। এ মসজিদ ছিল একটি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যেখান থেকে প্রেরণ করা হত বিভিন্ন কুটনৈতিক প্রতিনিধি দল এবং সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হত বিভিন্ন স্থান ও রাষ্ট্র থেকে আগত প্রতিনিধি দলের সাথে। এ মসজিদ ছিল অর্থ মন্ত্রণালয়, যেখানে বসে প্রেরণ করা হত রাষ্ট্রীয় যাকাত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারী যাকাত সংগ্রাহকদেরকে এবং বিলি বন্টন করা হত বায়তুল মালের অর্থ।
(ট) এ মসজিদ নবী কারীম (সা.) এর অনেক মু'জিযার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। যেমন নবী কারীম (সা.) এর ব্যবহৃত খেজুর গাছের মিম্বরটি বিকল্প মিম্বর ব্যবহারের কারণে মানুষের মত ক্রন্দন করার ঘটনা এবং নবী কারীম (সা.) কর্তৃক প্রদত্ত বহু ভবিষ্যৎ বাণী। এ মসজিদে ওহী নিয়ে হাজির হয়েছেন হযরত জিব্রাঈল (আ.) অসংখ্য বার। আরো অনেক বৈশিষ্ট্য যা পৃথিবীর অন্য কোন মসজিদের ভাগ্যে জুটেনি।
(ঠ) এ মসজিদ হচ্ছে ঐ মসজিদ যাকে কেন্দ্র করে আল্লাহর রাসূল (সা.) মদীনাকে একটি হারাম অঞ্চল ঘোষণা করেন যেমনটি কা'বা গৃহকে কেন্দ্র করে মক্কাকে হারাম অঞ্চল ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ছহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে আল্লাহর রাসূল এরশাদ করেছেন: "হযরত ইব্রাহীম (সা.) মক্কাকে হারাম হিসেবে ঘোষণা করেছেন আর আমি মদীনাকেও হারাম অঞ্চল ঘোষণা করলাম। এর কোন বৃক্ষ কর্তন করা যাবে না এবং এতে কোন বন্য প্রাণী শিকার করা যাবে না।"[১৪]

২. আল হারাম আল মাদানীর নির্মাণ ও সংস্কার প্রসঙ্গে

(ক) হিজরাতের অব্যবহিত পর নবী কারীম (সা.) এর উদ্যোগে এ মসজিদটি নির্মিত হওয়ার পর এর সর্বপ্রথম সংস্কার কার্য সম্পন্ন হয় হযরত আবু বকর (রা.) এর হাতে হিজরি দ্বাদশ সালে। তিনি মসজিদের আয়তন বৃদ্ধি করেননি বরং খেজুর বৃক্ষের পুরাতন খুঁটি সমূহের স্থলে নতুন খুঁটি স্থাপন করেন।
(খ) হযরত উমর (রা.) এর শাসন আমলে আল হারাম আল মদনীর দ্বিতীয় দফা সংস্কার সাধন হয় হিজরি ১৭শ সালে। এবারে মসজিদের দৈর্ঘ্য প্রস্থ আরো বৃদ্ধি করে এর দৈর্ঘ্য করা হয় ১৩০ হাত ও প্রস্থ ১২০ হাত। এবং খেজুরের খুঁটির পরিবর্তে ইটের পিলার বসানো হয়। এবং কাঠের ছাদের পরিবর্তে পাকা ছাদ নির্মাণ করা হয়। তবে মসজিদে যাতে কোনরূপ চুন কাম না করা হয় সে ব্যাপারে তিনি প্রকৌশলীদেরকে সতর্ক করে দেন। যাতে করে লোকেরা এতে বিভ্রান্ত না হয়।
(গ) হযরত 'উছমান (রা.) তাঁর শাসন আমলে এর ব্যাপক সংস্কার সাধন করেন। এ সংস্কার কর্ম সম্পাদিত হয় হিজরি ২৯ সালে। তিনি এর দৈর্ঘ্য ১৩০ হাত হতে ১৬০ হাতে এবং প্রস্থ ১২০ হাত হতে ১৩০ হাতে বর্ধিত করেন। এর চতুর্দিকে সাইজ করা পাথর দ্বারা দেয়াল নির্মাণ করান এবং ইট নির্মিত স্তম্ব সমূহের স্থলে পাথরের স্তম্ভ বসান। ছাদের উচ্চতা আরও বৃদ্ধি করেন। মূল নামাযের জায়গায় ছাদের নীচে বায়ু চলাচলের জন্য ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা করেন। এসব কাজের তত্ত্বাবধানে ছিলেন বিশিষ্ট ছাহাবী হযরত যায়েদ ইবন ছাবিত (রা.)।
(ঘ) হিজরি ৮৮ সালে উমাইয়া শাসক ওয়ালীদ ইবন আব্দুল মালিক মদীনার গভর্নর 'উমর ইবন আব্দুল আযীযের নিকট মসজিদটি পুন:নির্মাণের আদেশ দিয়ে পত্র লিখেন। এ পুন:নির্মাণের সময় পাশ্ববর্তী জায়গা সমূহ খরিদ করে এর আয়তন ২০০ X ২০০ হাতে উন্নীত করা হয়। আযওয়াজুর রাসূলের হুজরা সমূহকে মূল মসজিদের অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া হয় এবং মসজিদের জন্য একটি মেহরাব নির্মাণ করা হয়। এ কাজ সম্পাদনের জন্য বিশেষজ্ঞ একটি দল পাঠানো হয়। ওয়ালীদ রোমের বাদশাহর নিকট লিখিত একটি পত্রে উল্লেখ করেন যে পুন:নির্মাণের উদ্দেশ্যে মসজিদে নববী ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। এ কথা জেনে রোমের বাদশাহ এক লক্ষ মিছকাল স্বর্ণ এবং একশত নির্মাণ শিল্পীর একটি দলকে সংস্কার কাজে অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। তাছাড়া ভিতের কাজে ব্যবহারের জন্য চল্লিশ উটের বোঝাই মর্মর পাথর পাঠান।[১৫]
এ বারের পুন:নির্মাণে মসজিদের জন্য একটি আলাদা মেহরাব ও মিনার স্থাপন করা হয়।
(ঙ) পরবর্তী সংস্কার কর্ম সম্পাদিত হয় তৃতীয় 'আব্বাসী খলীফা আল মাহদীর আমলে হিজরি ১৬৩ সালে। এবারের নির্মাণ কাজে মসজিদের চাকচিক্য অনেক বৃদ্ধি করা হয়। উত্তর দিকে এর সম্প্রসারণ হয় ৬৫ হাত। মূল মসজিদের চতুর্দিকে রাখা হয় প্রশস্ত চত্বর।

(চ) পরবর্তী সংস্কার কাজ অনুষ্ঠিত হয় মামলুক আমলে, হিজরি ৬৫৪ সালে। অর্থাৎ দীর্ঘ ৫০০ বছর পযর্ন্ত এতে উল্লেখযোগ্য কোন সংস্কার কর্ম সম্পাদিত হয়নি। এ সংস্কার কর্মটি সম্পাদিত হয় সুলতান যাহের বায়বারস কর্তৃক। তিনি পূর্ববর্তী মসজিদের আয়তন অক্ষুন্ন রেখেই এর সংস্কার করান। মামলুক আমলে একাধিকবার সংস্কার করা হয়। এ আমলের সর্বশেষ সংস্কার কর্ম সম্পাদিত হয় হিজরি ৮৬৮ সালে সুলতান সাইফুদ্দীন লাশীনের হাতে। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য সংস্কার হচ্ছে মসজিদে নববী ও আল হারাম আল মক্কীর সুষ্ঠু দেখভালের উদ্দেশ্যে ইদারাতুল হারামাইন আল শরীফাইন। (দুই হারামের প্রশাসন) নামক একটি আলাদা বিভাগ চালু করা।

(ছ) উসমানিয়া (তুর্কি) শাসনামলে হারামাইন শরীফাইনের উল্লেখযোগ্য সংস্কার করা হয়। সুলতান সুলায়মান কানুনীর শাসন আমলে হারামাইন শরীফাইন সংস্কারের সর্বপ্রথম উদ্যোগ নেয়া হয় হিজরি ৯৪০ সালে। এ সংস্কারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এবারে মসজিদে নববীতে কাষ্ঠ নির্মিত ও চমৎকার কারুকার্য খচিত একটি মিম্বার স্থাপন করা হয়। এ আমলের সংস্কার কর্মের অনেক নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে। উসমানী শাসকগণ হিজরি ১১৯৬ সালে মসজিদে নববীতে মর্মর পাথরের একটি মেহরাব নির্মাণ করান এবং এ মেহরাবের উপরে একটি গম্বুজ স্থাপন করা হয়।

(জ) হিজরি ১২২৬ সালে মসজিদে নববীর পুন:নির্মাণ করা হয় মিশরের শাসক মুহাম্মদ আলী পাশার উদ্যোগে। এ কাজে মিশরীয় ও তুর্কী নির্মাণ শিল্প বিশেষজ্ঞদেরকে নিয়োগ করা হয়। এ নির্মাণ কাজের সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন প্রখ্যাত মিশরীয় প্রকৌশলী হালীম পাশা এবং প্রকৌশলী ইবরাহীম পাশা ও তুর্কী কেলিগ্রাফার শাকররুল্লাহ প্রমুখ। এ বারের সংস্কার কালে পুন:নির্মিত সবুজ গম্বুজটি অদ্যাবধি বহাল আছে।

(ঝ) ১২৭৭ হিজরি সালে সুলতান আব্দুল হামীদ মসজিদে নববীর পরবর্তী সংস্কারে হাত দেন। এবারে মসজিদের দেয়াল সমূহে গোলাপী রং এর মর্মর পাথরের টাইলসের সাহায্যে কার্পেটিং করা হয়। এ কাজের জন্য তিনি একটি বড় অংকের বাজেট নির্ধারণ করেন। জানা যায় যে এ সংস্কার কর্ম শেষ হওয়ার পর মাত্র ৩৯ বছর বয়সে সুলতান আব্দুল হামীদ ইন্তেকাল করেন।

(ঞ) হিজরি ১২৯৩ সালে উসমানী শাসক সুলতান আব্দুল মজীদ-১ মসজিদে নববীকে নতুনভাবে নির্মাণের উদ্যোগ নেন। এবারের পুন: নির্মাণে নবী কারীম (সা.) এর রওযার অংশ বাদ দিয়ে পুরো মসজিদটি পুন:নির্মিত করা হয়। এ নির্মাণের ফলে মসজিদের আয়তন বৃদ্ধি পায় ১২৯৩ বর্গ মিটার। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে সাউদী শাসকগণ কর্তৃক এর নির্মাণ ও সংস্কারের পূর্বে ইহা ছিল সর্বশেষ পুন:নির্মাণ।[১৬]

(ট) সাউদী বাদশাহদের হাতে মসজিদে নববীর সংস্কার

সাউদী বাদশাহদের হাতে অব্যাহতভাবে হারামাইন শরীফাইনের সংস্কার কর্ম চলতে থাকে।

এ আমলে সর্ব প্রথম সংস্কার কর্মে হাত দেয়া হয় বাদশাহ আব্দুল আযীয ইবন সাউদের হাতে, তিনি হিজরি ১৩৭০ সালে (১৯৫১ খৃঃ) মসজিদে নববীর সংস্কার কর্ম শুরু করেন যা দীর্ঘ পাঁচ বছর পর ১৩৭৫ হিঃ সনে শেষ হয়। এ সংস্কার কর্মে উত্তর দিকে মসজিদের আয়তন বৃদ্ধি করা হয় ৬০০০ বর্গ মিটার। এতে মসজিদের মোট আয়তন দাঁড়ায় ১লক্ষ ৬০ হাজার বর্গ মিটারে। এ সংস্কারের ফলে এক সাথে তিন লক্ষ মুছল্লি নামায আদায় করতে সক্ষম হয়। তবে মূল মসজিদের ক্ষেত্রে উসমানী আমলের স্থাপনাকে অক্ষুন্ন রাখা হয়। এ নতুন সংস্কার কর্মে মসজিদে নববীতে ২৩২টি নতুন স্তম্ভ যুক্ত হয়, মসজিদের সম্মুখ ভাগকে খুবই আকর্ষণীয় করা হয় এবং সম্মুখ ভাগে ৭৫ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন দু'টি নতুন মিনার স্থাপন করা হয়। এ দু'টি মিনার সহ আল হারাম আল মাদানীর মিনার সংখ্যা দাঁড়ায় ৯টি।

পরবর্তীকালে হাজী ছাহেবান ও মুছল্লীদের সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে খাদেমুল হারামাইন বাদশাহ ফাহদ ইবন আব্দুল আযীয ১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে মসজিদে নববীর ব্যাপক সম্প্রসারণ ও সংস্কার পরিকল্পনা হাতে নেন। এর জন্য সর্বোচ্চ বাজেট নির্ধারণ করা হয় এবং ১৯৮৬ সালে সংস্কার কার্য শুরু হয়। এ পরিকল্পনার অধীনে দীর্ঘদিন ধরে মসজিদে নববীর সম্প্রসারণ কর্ম অব্যাহত থাকে। এতে মূল মসজিদের আয়তন দাঁড়ায় ৯৮০০০ বর্গ মিটার এবং নামায আদায়ের উপযোগী ছাদের আয়তন দাঁড়ায় ৬৭০০০ বর্গ মিটার আর মসজিদের বাইরের চত্তরের আয়তন দাঁড়ায় ২৩৫০০০ বর্গ মিটার। অর্থাৎ পুরো আল হারাম আল মদনীর আয়তন উন্নীত হয় ৪ লক্ষ বর্গ মিটারে। যাতে হজ্ব ও রমযানের মওসুমে একসাথে দশ লক্ষ মুছল্লী নামায আদায় করতে পারে। এ সংস্কার কর্মে সম্মুখভাবে স্থাপন করা হয় প্রধান ফটক যা বাদশাহ ফাহদ ইবন আব্দুল আযীয ফটক নামে অভিহিত। ছাদের উপর স্থাপিত হয় সাতটি গম্বুজ। চার কোনায় ১০৪ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন চারটি মিনার নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে এর মোট মিনার সংখ্যা ১০। বর্তমানে উত্তর, পশ্চিম এবং পূর্ব দিকের প্রত্যেক দিকে তিনটি করে মোট নয়টি প্রবেশদ্বার রয়েছে। তাছাড়া স্কেলেটর দিয়ে উঠা নামার উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হয় আরও বারটি প্রবেশদ্বার। বর্তমানে ছাদের উচ্চতা রাখা হয়েছে ১২.৫ মিটার এবং পুরো মসজিদে স্তম্ভের সংখ্যা হচ্ছে ২০১৫ টি। তাছাড়া রয়েছে একটি আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোর যার উচ্চতা ৪ মিটার। এ ফ্লোরে স্থাপন করা হয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র ও অন্যান্য সুযোগ সমূহ তথা ওযুখানা ও টয়লেট সমূহ। এতে একত্রে ৬৮০০ জনের জন্য ওযু করার এবং ২৫০০ জনের জন্য টয়লেট ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। তদুপরী এ আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরে রয়েছে একটি বিশাল কার পার্ক যার ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে ৬১৬৩ টি গাড়ি পার্কিং এর ব্যবস্থা। মসজিদের চত্তরে স্থাপন করা হয়েছে ২৭টি বিশাল সংক্রিয় ছত্রী, এর প্রত্যেকটির ওজন ৮০ টন করে। প্রত্যেকটি ছত্রীর আয়তন ৩২৪ বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে, যা রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে খোলা ও বন্ধ করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। যাতে করে ছায়ার প্রয়োজনে এগুলো খোলা যেতে পারে এবং বায়ুর প্রয়োজনে তা বন্ধ করা যেতে পারে। মসজিদে স্থাপিত স্তম্ভ সমূহের নীচের অংশে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের বায়ু নির্গমনের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। তাছাড়া মূল মসজিদের অভ্যন্তরে উসমানী আমলের সংস্কার কর্ম ও সাউদী আমলের সংস্কার কর্মের মধ্যবর্তীতে

একটি ফাঁকা জায়গা চিহ্নিত করে তাতে স্থাপন করা হয়েছে ১২টি ছত্রী প্রত্যেক ছত্রীর আয়তন হচ্ছে ৩০৬ বর্গ মিটার। এগুলোও স্বয়ংক্রিয়ভাবে খোলা ও বন্ধ করা যায়।[১৭]

এ হচ্ছে আল হারাম আল মদনীর বর্তমান অবস্থা। প্রকৃত পক্ষে হারামাইন আল শরীফাইনের সংস্কার কর্ম কখনও থেমে নেই। যাদের প্রতি বছর হজ্ব ও উমরাহর উদ্দেশ্যে হারামাইন শরীফাইন গমনের সৌভাগ্য হয়েছে তারা লক্ষ্য করবেন যে প্রতি বছর সেখানে পৌছার পর মনে হবে যেন তিনি এ দু'টি হারামকে নতুন করে দেখার সুযোগ পেয়েছেন।

আল্লাহ প্রত্যেক মুসলমানকে হারামাইন শরীফাইন যিয়ারত করার সৌভাগ্য দান করুন। আমীন॥

তথ্য সূত্র

১। আল জামে আল ছগীর, ১/১১২ (আল মাকতাবাহ আল শামিলাহ)
২। আল আযরক্বী, আখবার মক্কা, পৃ: ১/১৩ (আল মাকতাবাহ আল শামিলাহ)
৩। দেখুন, আবু বকর রফীক, মহানবীর কীর্তিমান পূর্ব পুরুষ গণ। এ্যাডর্ন পাবলিকেশন্স, ২য় সংস্করণ, ১৪১৬ পৃ: ৪৫-৪৬।
৪। দেখুন, আখবারে মক্কা, ঐ, পৃষ্ঠা ১/৩৮- ৪১।
৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ঐ।
৬। দেখুন, মহানবীর কীর্তিমান পূর্ব পুরুষ গণ, পৃ: ৮৬ ।
৭। আল আযরক্বী, আখবার মক্কা, ১/১৯৭ (শামিলাহ)।
৮। প্রাগুক্ত, ১/১৯৯।
৯। প্রাগুক্ত, ১/২০২।
১০। দেখুন সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদী, সীরাতে সরওয়ারে আলম (উর্দু) ২/৬৯।
১১। তাবারানী, আল আউসাত।
১২। গোলাম মুস্তফা, বিশ্বনবী, পৃ: ১/১৫৩।
১৩। তাবারানী, আল আউসাত।
১৪। প্রাগুক্ত।
১৫। দেখুন, আব্দুল্লাহ সালেম নজীব, তারীখুল মসাজিদ আস শাহীরাহ (আর মকতাবাহ আল শামিলাহ সংস্করণ) ১/৩৯।
১৬। প্রাগুক্ত পৃ: ৪০।
১৭। প্রাগুক্ত পৃ: ৪০।

তাক্বওয়া ও এর তাৎপর্য

ড: আ.ছ.ম তরীকুল ইসলাম*

'তাকওয়া' শব্দটি আরবি। ي-ق-و বর্ণ সমষ্টির সমন্বয় থেকে এর উৎপত্তি। যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, বেঁচে থাকা। মহান আল্লাহর ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকা ও তাঁর নির্দেশিত কাজ পরিপূর্ণভাবে তার প্রদর্শিত পন্থা অনুযায়ী সম্পাদন করার নামই হচ্ছে 'তাকওয়া'। কোন প্রশাসন, র‍্যাব, যৌথ বাহিনী, ডগস্কোয়াড, সিআইডি, গুপ্তচর বা অন্য কারো ভয়ে ভীত হয়ে নয়, একমাত্র মহামহিম শক্তিধর রাব্বুল আলামীনের ভয়ে যে কোন অন্যায়, অপকর্ম ও অপরাধ প্রবনতা থেকে মুক্ত থাকা ও আল্লাহ নির্দেশিত সকল ভালো কাজে অংশ গ্রহণ করাই হচ্ছে 'তাকওয়া'। অন্য কথায়, আল্লাহর ভয়ে পাপ বর্জন ও সাওয়াব অর্জনই হচ্ছে, তাকওয়ার স্বরূপ। তাকওয়া সম্পর্কে ইসলামের বিদগ্ধ মণীষীগণ বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন বর্ণিত হয়েছে:

وقد سأل عمر رضي الله عنه أبي بن كعب رضي الله عنه فقال له: ما التقوى؟ فقال أبي : يا أمير المؤمنين لو سلكت واديا ذا شوك كثير ماذا تصنع؟ قال: أشمر عن ثيابي وأحترز أي أحترز مخافة أن يصيبني الشوك. فقال أبي بن كعب: ذاك التقوى...! فهي تشمير في طاعة الله واحتراز من معصيته.

'উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু উবাই ইবন কা'আব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে প্রশ্ন করলেন যে, 'তাকওয়া' কী? উবাই ইবন কা'আব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন, যদি আপনি কন্টকাকীর্ণ উপত্যকা অতিক্রম করেন, তা হলে কী করেন? তিনি বললেন, আমার কাপড় সামাল দেই এবং সতর্ক হই। অর্থাৎ কাঁটা আমাকে কষ্ট দিবে এ ভয়ে আমি সতর্ক হই। 'উবাই ইবন কা'আব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, তাকওয়া হচ্ছে, তেমনি আল্লাহর আনুগত্যে ও তার নিষিদ্ধ কাজ বর্জনে সতর্ক হওয়া।"(১)

فقال عنها علي بن أبي طالب رضي الله عنه : هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل والرضا من الدنيا بالقليل.

"'আলী ইবন আবূ তালিব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু 'তাকওয়া' সম্পর্কে বলেছেন- তাকওয়া হচ্ছে, পরাক্রমশালীর ভয়, আলকুরআন অনুযায়ী আমল, প্রস্থানের দিনের প্রস্তুতি, দুনিয়ায় অল্পতুষ্টির নাম।"(২)

ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন-

التقوى هي أن يطاع الله فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر.

"আল্লাহর আনুগত্য করা ও তার অবাধ্য না হওয়া, তাকে স্মরণ করা, তাকে ভুলে না যাওয়া, তার শুক্র করা ও তার কুফরী না করাই হচ্ছে 'তাকওয়া'।"(৩)

অন্য একজন মণীষী বলেছেন-

هي أن تزين باطنك للخالق كما تزين ظاهرك للمخلوق.

"তাকওয়া হচ্ছে, তোমার আভ্যন্তরীন দিক স্রষ্টার জন্য সুসজ্জিত করা যেমন তুমি তোমার বাহ্যিক দিক সৃষ্টের জন্য সুসজ্জিত করে থাক।"(৪)

ইবন তায়মিয়াহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي.

"'তাকওয়া' হচ্ছে, নির্দেশিত কাজ করার ও নিষিদ্ধ কাজ বর্জনের মাধ্যমে তোমার ও আল্লাহর শাস্তির মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা।"(৫)

তালক ইবন হাবীব রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

هي أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله.

"আল্লাহর নিয়ন্ত্রনের মধ্যে থেকে সাওয়াব প্রাপ্তির আশায় তার ইবাদাত করা আর আল্লাহর নিয়ন্ত্রনের মধ্যে থেকে তার শাস্তির ভয়ে তার নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করাই হচ্ছে 'তাকওয়া'।" (৬)

সাহল ইবন 'আব্দুল্লাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

من أراد أن تصح له التقوى فليترك الذنوب كلها.

"যে চায় তার জন্য তাকওয়া বিশুদ্ধ হোক তার উচিত সমস্ত পাপ বর্জন করা।"(৭)

আররুজবারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

التقوى : مجانبة ما يبعدك عن الله.

"যা তোমাকে আল্লাহ থেকে দূরে নিয়ে যায় তা বর্জনই তাকওয়া।" (৮)

জনৈক মণীষী বলেন-

يستدل على تقوى الرجل بثلاثة أشياء : أ- حسن التوكل فيما لم ينل. ب- وحسن الرضا فيما قد نال. ج- وحسن الصبر على ما قد مضى.

---

* প্রফেসর, দাওয়াহ এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

" তিনটি জিনিষ মানুষের তাকওয়ার প্রমাণ বহন করে-
ক. যা সে লাভ করেনি সে বিষয়ে উত্তম তাওআক্কুল
খ. যা সে লাভ করেছে সে বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা
গ. যে আপদ অতিক্রান্ত হচ্ছে, তার উপর ছবর করা।"(৯)
আলহাসান আলবাছরী রাহিমাহুল্লাহ বলেন-

المتقون اتقوا ما حرم عليهم وأدوا ما افترض عليهم

"মুত্তাকী তারাই যারা তাদের উপর যা হারাম করা হয়েছে তাথেকে বেঁচে থাকে এবং তার উপর যা ফরজ করা হয়েছে তা আদায় করে।"(১০)
আরো বলা হয়েছে-
وقال عمر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله: ترك ما حرم الله، وأداء ما افترض الله.
"'উমার ইবন 'আব্দুল 'আযীয রাহিমাহুল্লাহ বলেন- দিনে সিয়াম পালন, রাতে সালাতে দাড়ানো ও উভয়ের মধ্যে সংমিশ্রনের নাম তাকওয়া নয়, বরং আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা বর্জন ও যা তিনি ফরজ করেছেন তা পালন করাই হচ্ছে তাকওয়া।"(১১)
وقال ابن القيم رحمه الله:
وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا، أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده.

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন- "আর তাকওয়ার সারার্থ হচ্ছে, ঈমান সহকারে সাওয়াবের আশায় নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য করা। সুতরাং আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন তার নির্দেশের উপর ঈমান ও তার প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বাস করে তা পরিপালন করা এবং যাথেকে তিনি নিষেধ করেছেন তার নিষেধের উপর ঈমান ও তার শাস্তির ভয়ে তা বর্জন কর।"(১২)
মোট কথা, মহান আল্লাহর ভয়ে শঙ্কিত হয়ে তার নিষিদ্ধ কাজ বর্জন ও তার নির্দেশিত কাজ সম্পাদন করার নামই হচ্ছে, 'তাকওয়া'।

তাকওয়া এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য

তাকওয়া অদৃশ্য একটি বিষয়, যার লালন স্থল হচ্ছে, মানুষের ক্বালব। মানুষের মনে তাকওয়ার নির্দমনীয় শক্তি সময় সময় এমন কি লোকচক্ষুর অন্তরালে হলেও জবাবদিহিতার স্বচ্ছ অনুভূতি সৃষ্টি করে, যা তাকে নিন্দিত সব কাজ থেকে বিরত থাকতে আর নন্দিত কাজ করতে বাধ্য করে। তখন সে সকল সময় তাকে পর্যবেক্ষণকারী, যার থেকে তার কোন সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম কাজও গোপন রাখার কোন সুযোগ নেই, সেই মহামহিম আল্লাহর সম্মুখে জবাবদিহিতার আশঙ্কায় শঙ্কিত ও ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। তার সকল কাজকর্ম পৃথিবীর কেউ দেখুক বা না দেখুক নিখিল জাহানের প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই দেখছেন, এ অনুভূতি তাকে অপরাধ থেকে বিরত ও ভালো কাজ করার অদম্য আগ্রহ সৃষ্টি করে। যার অনিবার্য পরিণতিতে সে যেকোন অপকর্ম করার অথবা অপরিহার্য করণীয় কাজ বর্জন করার দুঃসাহস দেখাতে পারে না। গভীর রজনী। আমিরুল মু'মিনীন 'উমার রাদি আল্লাহু 'আনহু প্রজাদের অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্য ছদ্মবেশে পৌছালেন এক মরু কুঠিরের সন্নিকটে। কথোপকথন হচ্ছে, মা ও বালিকার সাথে। শুনছেন 'উমার- মা- এখানে 'উমারও নেই তার পক্ষেরও কেউ নেই। আমাদের দুধে পানি মিশানোর বিষয়টি কেউ দেখছে না। তাদের অলক্ষ্যে আমরা মাদীনার বাজারে পানি মিশ্রিত দুধ বিক্রয় করে বেশী লাভবান হবো। এসো আমরা দুধে পানি মিশ্রিত করি।
বালিকা- না, মা এটা হতেই পারে না। এ কাজ 'উমার ও তার প্রশাসনের অলক্ষ্যে হলেও 'উমারের যে রাব্ব, নিখিল জাহানের যে পর্যবেক্ষক আমাদেরও যে রাব্ব, আল্লাহ মহামহিম তো আমাদের দেখছেন। তার কাছে আমরা কী জবাবদিহি করবো, তা কী ভেবে দেখেছ? আসলে সব সময় আল্লাহর তত্ত্বাবধানে থেকে জবাবদিহিতার এ অভিব্যক্তি যা এ মরুর বেদুঈন বালিকা থেকে উচ্চারিত হয়েছে এটাই হচ্ছে তাকওয়ার বাস্তব রূপ। তাকওয়ার জ্বলন্ত রূপ। এ তাকওয়ার মহাসিন্ধু থেকে উচ্ছ্বসিত জবাবদিহিতার অনুভূতিই 'উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর মত বেহেশতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ব্যক্তিকেও সদাসর্বদা তাড়া করে ফিরত। তিনি বলতেন-

لو مات جدي بطق الفرات لخشيت أن يحاسب الله به عمر.

"যদি ফোরাতের কিনারায় কোন মেষশাবক মারা যায়, আমি এর জন্য ভয় পাই যে আল্লাহর কাছে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।"(১৩)
তাকওয়ার অন্তর্নিহিত সারই হচ্ছে এটা।
তাকওয়া অবলম্বনের জন্য এ বিষয়ে 'ইলম অর্জন খুবই অপরিহার্য। তাকওয়ার জন্য কী কী বর্জনীয় আর কী কী করনীয়, তার জ্ঞান যদি না থাকে, তাহলে তাকওয়ার অনুশীলন কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয়। সে জন্য ইবন রাজব বলেছেন-

وأصل التقوى: أن يعلم العبد ما يتقى ثم يتقي.

"তাকওয়ার মূল বিষয় হচ্ছে, বান্দাহ প্রথমত জানবে কিসের থেকে তাকে বাঁচা উচিত, তারপর তাথেকে বাঁচবে।"(১৪)
আবূ বাকর ইবন খুনাইস বলেন-

كيف يكون متقيا من لا يدري ما يتقي.

"কীভাবে সে মুত্তাকী হবে, যে জানে না যে সে কী বর্জন করবে?"(১৫) সুতরাং তাকওয়ার জ্ঞানার্জন অপরিহার্য। অপর দিকে তাকওয়ার গন্ডির মধ্যে প্রবেশ করতে হলে খুব সতর্ক জীবন অবলম্বন অপরিহার্য। এমন কী যেখানে হারাম হালালের ব্যাপারে সামান্য সংশয়ের উদ্রেক হয়,

সেখানে সন্দেহপূর্ণ বিষয়টি বর্জন করা উচিত। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে–

عن عطية السعدي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به البأس.

'আতিয়্যাতুস সা'আদী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্যতম সাহাবী ছিলেন, তাঁর সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বান্দা ততক্ষন মুত্তাকীর পর্যায়ে পৌছায় না, যতক্ষন না সে সমস্যাপূর্ণ হওয়ার ভয়ে ভীত হয়ে, সমস্যা পূর্ণ নয় এমন বিষয়কে বর্জন করবে।"[১৬] সুতরাং প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে সব সময় আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয়ে সন্ত্রস্ত থেকে প্রয়োজনে সন্দেহপূর্ণ বিষয়টি পূর্ণ পরিহারের মাধ্যমে তাকওয়ার শীর্ষ স্থানে পৌছানো সম্ভব। তাকওয়ার অনুশীলন একজন মুসলিমের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যার মধ্যে তাকওয়া নেই, তার আর পশুর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। তাকওয়া একজন মানুষকে সুশৃঙ্খল, সুনিয়ন্ত্রিত ও আলোকিত মানুষে পরিণত করে। সত্যিকারের মানুষ হওয়ার জন্য তাকওয়া অনুশীলনের কোন বিকল্প নেই। পাপ ও কলুষ-কালিমা মুক্ত পরিচ্ছন্ন জীবন শুধুমাত্র তাকওয়ার মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব। জাহিলী যুগের বর্বর, উশৃঙ্খল ও অসভ্য মানুষগুলোকে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মনে তাকওয়ার বীজটিই বপন করে ছিলেন। যার অনিবার্য পরিণতিতে রক্ত পিপাসু এ জাতি মানুষের নিরাপত্তা দানের প্রবাদ পুরুষে পরিণত হয়েছিলেন। নারীর সতিত্ব হরণকারীরা হয়েছিল সতিত্ব রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী। লুটেরা ও ডাকাতরা হয়েছিল অন্যের সম্পদ ও আনামাত রক্ষার সৈনিক। পুলিশ প্রশাসন, র‍্যাব, যৌথ বাহিনী, চিতা, কুবরা, ডগস্কোয়াড, সিআইডি ও গুপ্তচররা যখন মানুষকে অপরাধমুক্ত করতে ব্যর্থ হয়, তখন তাকওয়াই পারে মানুষকে পরিপূর্ণ অপরাধ মুক্ত করতে। একটি অপরাধ মুক্ত আলোকিত সমাজ বিনির্মাণের জন্য তাকওয়াই একমাত্র মাধ্যম। সুতরাং তাকওয়ার রয়েছে অপরিসীম গুরুত্ব। আমাদের সকলেরই এ গুরুত্বপূর্ণ গুণটি অর্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

তথ্যসূত্র

১। https://ar-ar.facebook.com/.../87...
২। আললুহায়মীদ, শারহু আরবায়িনান নাভবীয়্যাহ, তাবি. ৪৩ পৃ.
৩। আলজাওযী, জামাল উদ্দীন, যাদুল মাসীর ফী 'ইলমুত তাফসীর, তাবি. ১খ ৩৮৯ পৃ.
৪। https://groups.yahoo.com/.../105...
৫। আলফুরকান বায়না আওলিয়ায়ির রাহমান, তাবি. ৯পৃ.
৬। আহমাদ ফরীদ, ড. আততাকওয়া আদ্দুররাহ আলমাফকুদাহ, তাবি, ৫পৃ.
৭। https://www.facebook.com/...yo
৮। http://www.wathakker.info/flyers/print/931
৯। https://twitter.com/raedalsaeed/status/310498677363978240
১০। http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura2-aya2.html
১১। আহমাদ ফরীদ, ড. ০৬ পৃ.
১২। আররিসালাতুত তাবূকিয়্যাহ, আলমাকতাবাতুল মাদানী, জিদ্দাহ, তাবি. ১০পৃ.
১৩। ইবনুল জাওযী, ছাফওয়াতুছ ছাফওয়াহ, বায়রূত, ১৩৯৯ হি. ১৬খ. ২৮৫ পৃ.
১৪। আহমাদ ফরীদ ড. ১০ পৃ.
১৫। প্রাগুক্ত, ১০পৃ.
১৬। তীরমিযি, كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول صلي الله عليه وسلم. ৯খ. ৩২৩ পৃ. হাদিস নং ২৪৫১

ইল্‌মে হাদিসে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

প্রফেসর ড. মোঃ নাজমুল হক নাদভী*

সর্বজন স্বীকৃত যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আল্লাহর সর্বশেষ বাণী। যা সমগ্র মানব জাতির ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির পাথেয় হিসেবে আল্লাহ্ প্রদত্ত নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)'র তেইশ বছর নবুয়্যাতের দায়িত্ব পালনকালে অবতীর্ণ হয়। কুরআনে কারীমের মাধ্যমেই তাঁর অনুসারীগণ সারা বিশ্বে মুসলিম জাতি হিসেবে পরিচিত এবং ইসলামের মৌলিক ও প্রধান উৎস এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। তবে ইসলামের সকল নীতিমালা কুরআনে কারীমে বিশদভাবে আলোচিত হলেও মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মানব রচিত গ্রন্থ না হওয়ায় ইসলামের সকল বিষয়াদি বিস্তারিতভাবে উপলব্ধি করা অভিজ্ঞ ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকদের পক্ষে সম্ভব হলেও সাধারণ মুসলমানের পক্ষে তা অনুধাবন সত্যিই কঠিন। তাছাড়া অহী সংক্রান্ত বিষয়াদি সঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য মানব-জ্ঞান যথেষ্ট নয় এবং মানুষের সীমিত জ্ঞান ও পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান এখনো অহীর ব্যাখ্যা প্রদান করার মতো উৎকর্ষতা লাভ করেনি। হাদিসে রাসুল (সঃ) ব্যতীত সঠিক পর্যায়ে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন বুঝা অনেকটা অসম্ভব বলা যায় বিধায় হাদিসে রাসুল (সঃ) ইসলামের দ্বিতীয় মৌলিক উৎসরূপে স্বীকৃত। সুতরাং বলা যায় কুরআনে কারীমের নির্দেশিত ও আলোচিত ইসলামের যাবতীয় বিষয়াদি মহানবী (সঃ) স্বীয় কথা, কর্ম ও সম্মতির মাধ্যমে সারা বিশ্ববাসীর নিকট পৌঁছে দিয়েছেন এবং কুরআনে কারীমের মতো হাদিসে রাসুলও (সঃ) আল্লাহর অহী বা প্রত্যাদেশ হিসেবে স্বীকৃত ও প্রমাণিত। যেমন কুরআনে কারীমের ভাষায়, "এবং তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। যা অহী ছাড়া আর কিছু নয়, যা প্রত্যাদেশ হয়" (সূরা আল-নাজম:৪-৫)। পার্থক্য শুধু এতটুকু, কুরআনে কারীমের ভাব ও ভাষা দুটিই আল্লাহর। আর হাদিসে রাসুলের (সঃ) ভাব আল্লাহর, তবে যা প্রত্যাদেশ হয়েছে মহানবী (সঃ)'র স্বীয় কথা, কর্ম ও সম্মতির মাধ্যমে। তাই হাদিসে রাসুলের (সঃ) গুরুত্ব কোনোভাবেই কম নয়

হাদিসে রাসুল (সঃ) সংরক্ষণ ও প্রচার-প্রসার তাঁর সুযোগ্য সাহাবীদের নিরলস প্রচেষ্টা ও একনিষ্ঠতার সাথে প্রতিষ্ঠিত বিধায় প্রাচ্যবিদদের হাজারো ষড়যন্ত্র ও অপপ্রচার সত্ত্বেও কোনো রকম কলুষিত হয়নি। একদল বিচক্ষণ ও আসহাবে রাসুল সর্বদা হাদিসে রাসুল সংগ্রহ ও সংরক্ষণে স্বদ্যোগে তা সম্পাদন করেছেন। তাঁরা কুরআনে কারীমের সংরক্ষণে যেমন যত্নবান ছিলেন অনুরূপভাবে হাদিসে রাসুল সংরক্ষণেও একনিষ্ঠ ছিলেন এবং বিচক্ষণতার সাথে তা সংরক্ষণ করেছিলেন বিধায় প্রাথামিক পর্যায়ে আল্লাহর রাসুল (সঃ) হাদিস লিপিবদ্ধ করতে বারণ করলেও বিশেষ কিছু আসহাবে রাসুলগণকে তা সংরক্ষণে মৌন সম্মতি দিয়েছিলেন বলে বিশুদ্ধরূপে সঠিক ইতিহাসের আলোকে প্রমাণিত। বিশেষ করে যারা ঘর-বাড়ী ছেড়ে সার্বক্ষণিক আল্লাহর রাসুল (সঃ)'র দরবারে পড়ে থাকতেন এবং হাদিসে রাসুল সংরক্ষণে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিলেন তাঁরা ইতিহাসে আসহাবে সুফ্‌ফা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে হযরত আবু হুরায়রা ৫৩৭৪ হাদিস বর্ণনা করে শীর্ষে অবস্থান করেছেন। তার পরে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর ২৬৩০ হাদিস, হযরত আনাস বিন মালিক ২২৮৬ হাদিস বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস বর্ণনা করেন ১৬৬০ হাদিস, হযরত জাবের বিন আবদিল্লাহ বর্ণনা করেন ১৫৪০ হাদিস এবং মহিলাদের মধ্যে মা আয়েশা সিদ্দিকা ২২১০ হাদিস বর্ণনা করে শীর্ষ অবস্থানে আছেন। এভাবে আসহাবে রাসুলগণ নিজেদের স্মৃতিতে অথবা লিপিবদ্ধ করে হাদিসে রাসুল সংরক্ষণ করেছিলেন।

পরবর্তী পর্যায়ে তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনগণের মধ্যে হাদিসে রাসুল সংরক্ষণে এমন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়েছিল যে, তাঁদের অনেকেই হাদিসে রাসুল সংরক্ষণে তৎকালের হাদীস চর্চা ও শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত মাক্কা, মাদীনা, বাসরা, কুফা, শাম ও মিশর ঘুরে ঘুরে হাদিস সংগ্রহ করেছেন। তাবেয়ী বিশর বিন ওবাইদিল্লাহ বলেন আমি একটি হাদিস সংগ্রহের জন্য প্রত্যেকটা শহর ভ্রমন করেছি। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী আবু আলিয়া বলেন আমি বসরার প্রবীণ তাবেয়ীনদের নিকট হাদিস শুনে তৃপ্ত হতাম না যতক্ষণ না মদীনায় এসে তা স্বয়ং আসহাবে রাসুলদের মুখে শুনতাম। পরবর্তী পর্যায়ে হাদিস বিশারদগণ হাদিস সংরক্ষণে অত্যন্ত সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সাথে এগিয়ে আসেন। তাঁদের মধ্যে হযরত ইব্‌ন দীনার (মৃ:১১৬) হযরত কাতাদাহ (মৃ:১১৭) হযরত ইয়াহ্‌য়া বিন ইয়ামার (মৃ:১১৯) হযরত ইব্‌ন শিহাব যুহরী (মৃ:১২৪) হযরত আবদুর রহমান বিন কাসিম বিন মুহাম্মদ (মৃ:১২৬) হযরত ইমাম আবু ইসহাক (মৃ:১২৭) হযরত দাউদ বিন দীনার (মৃ:১৩৯) ও হযরত সুলাইমান বিন তাইমী (মৃ:১৪৩) হাদিস সংরক্ষণ ও হাদিস শিক্ষায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। পরবর্তী পর্যায়ে হাদিস বিশারদগণ বিভিন্ন পর্যায়ে সংরক্ষিত হাদিসে রাসুল সংকলন ও গ্রন্থস্ত করণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তাঁদের মধ্যে সিহাহ সিত্তাহ'র গ্রন্থকারগণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইমাম বুখারী প্রায় ৬ লক্ষের অধিক হাদিস থেকে বাছাই করে ৭২৭৫ টি বিশুদ্ধ হাদিস সংকলনের মাধ্যমে হাদিস বিজ্ঞানে শীর্ষ স্থানে রয়েছেন।

ভারতীয় উপমহাদেশে হাদিস চর্চা

হিজরি প্রথম শতকের শেষ দিকে মুহাম্মদ বিন কাসিমের অভিযানের পরবর্তী সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশে হাদিস চর্চা ও হাদিসের শিক্ষা প্রদান শুরু হলে বেশ ক'জন আরব হাদিস বিশারদ হাদিস শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ভারতীয় উপমহাদেশে আগমন করে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদেরকে কেন্দ্র করে উক্ত অঞ্চলে বেশ কিছু হাদিস চর্চা ও শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁদের মধ্যে সুহাইল বিন

* বিভাগীয় প্রধান, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

যাকওয়ান মাক্কী, মুসা ইব্ন ইয়াকুব সাকাফী, ইয়াযিদ বিন আবি কাবশা দেমস্কী, আল-মুফাদ্দাল ইব্ন মুহাল্লাব ও আবু মুসা ইসরাঈল বাসরী প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তী পর্যায়ে হিজরী ৫ম শতাব্দী থেকে হিজরী ৮ম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশে হাদিস চর্চা ও হাদিসের শিক্ষা প্রদান ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। বিশেষ করে সুলতান মাহমুদ গযনবীর পাঞ্জাব অভিযানের পরবর্তী সময়ে লাহোর হাদিস চর্চা ও হাদিসের শিক্ষা প্রদানের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। পরে সিন্ধু, গুজরাট, দিল্লিসহ ভারতীয় উপমহাদেশের সব কটি বড় শহরে হাদিস চর্চা ও হাদিসের শিক্ষা অধিকহারে বিস্তৃতি লাভ করে। উল্লেখ্য গুজরাটের প্রথম আমীর আহমদ শাহ কর্তৃক ভারত ও আরবের মধ্যে সামুদ্রিক যোগাযোগ স্থাপিত হলে দুই অঞ্চলের জনগণের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক তৈরী হয় এবং ভারতীয় উপমহাদেশের শিক্ষার্থীদের হাদিস চর্চা ও হাদিসের শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে আরব অঞ্চলে গিয়ে সরাসরি আরবদের নিকট হাদিসের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হলে অনেকে মাক্কা, মাদীনা, মিশর ও বাগদাদসহ বিভিন্ন আরব অঞ্চলে গিয়ে হাফেজ ইব্ন হাজর আসকালানী, ইমাম সাখাবী, ইব্ন হাজর হায়সামী মক্কী প্রমুখের নিকট হাদিসের শিক্ষা গ্রহণ করে দেশে ফিরে স্বদ্যোগে হাদীসের শিক্ষা প্রদানে নিয়োজিত হন। তাঁদের মধ্যে শায়খ রুকনুদ্দিন কুরাইশী, শায়খ বদরুদ্দিন মুহাম্মদ ইব্ন আবু বকর ইস্কান্দরী, শায়খ ইয়াহইয়া ইব্ন আবদুর রহমান হাশেমী, শায়খ হোসাইন ইব্ন মঈজুদ্দিন বিহারী, কাজী শিহাবুদ্দিন দৌলতপুরী, জালালুদ্দিন দাওয়ানী, আবদুল আযীয ইব্ন মুহাম্মদ তুসী, হোসাইন ইব্ন আবদিল্লাহ কিরমানী, সৈয়দ রফীউদ্দিন, মীর সৈয়দ আবদুল আওয়াল জৌনপুরী, শায়খ আবদুল মালেক গুজরাটী ও শায়খ ইয়াকুব কাশ্মীরী প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সকল মহান ব্যক্তিবর্গের পর হিজরী একাদশ শতাব্দিতে ভারতীয় উপমহাদেশে হাদিস চর্চা ও হাদিসের শিক্ষার নবজাগরণ সৃষ্টি হয়। এই মহান কাজে শীর্ষে ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক শায়খ আহমদ সিরহিন্দি (মুজাদ্দিদে আলফে সানী) ও আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী।

পরবর্তী পর্যায়ে শাহ অলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী ভারতীয় উপমহাদেশে হাদিস চর্চা ও হাদিসের শিক্ষা বিস্তারে নেতৃত্ব প্রদান করেন। উপরিউক্ত মুহাদ্দিসদ্বয় শায়খ আহমদ সিরহিন্দি ও শাহ অলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবীর যুগে উলামা ও সূফীদের মাধ্যমে বিভিন্ন মাদরাসা ও খানেকাহ ভিত্তিক হাদিস চর্চা ও হাদিসের শিক্ষা প্রদানের রীতিনীতি প্রচলিত হয় এবং উপরিউক্ত মুহাদ্দিসদ্বয়ের পরিবার হাদিস চর্চা ও হাদিসের শিক্ষা উক্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। সেই যুগে মুসলিম পরিবারে ফার্সি ভাষার প্রচলন থাকার কারণে তাঁরা ফার্সি ভাষায় প্রচুর হাদিস গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রণয়ন করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে যে ক'জন মহান ব্যক্তি ইল্‌মে হাদিসের সেবা করে গেছেন তাঁদের মধ্যে শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবীর পরিবার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শুধু তাই নয় ইল্‌মে হাদিসে উপরিউক্ত ভারতীয় মুহাদ্দিসগণের অবদান সম্পর্কে বিংশ শতাব্দির শ্রেষ্ট ইসলামী গবেষক ও আধুনিকতার ডীন হিসেবে খ্যাত আল্লামা রশীদ রেযার অভিমত এই যে, বর্তমান যুগে ইলমে হাদিসের প্রচার-প্রসারে ভারতীয় উপমহাদেশের উলামাগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছেন। যদি ভারতীয় উপমহাদেশের উলামাগণ হাদিসের প্রচার-প্রসারে এরূপ অধ্যবসায় সহকারে কাজ না করতেন তবে ইল্‌মে হাদিস অচিরেই বিলুপ্ত হয়ে যেত।

বাংলা অঞ্চলে হাদিস চর্চা :

বাংলার সুলতান আলাউদ্দিন হোসাইন শাহ ইবন সৈয়দ আশরফ মাক্কী (১৪৯৩-১৫১৮) একজন ধর্মপ্রাণ শাসক ছিলেন। তাঁর আমলে বাংলা অঞ্চলে সর্ব প্রথম হাদিস চর্চা শুরু হয় এবং তিনি ১৫০২ সালে মালদহে ধর্মীয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া সুলতান ইলতুতমিসের সময় দিল্লি থেকে বিখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামাহ সোনার গাঁওয়ে আগমন করে পূর্ব বাংলা অঞ্চলে সর্ব প্রথম হাদিস চর্চা শুরু করেন বলে ইতিহাসে স্বীকৃত। পরবর্তীকালে তাঁর স্বান্নিধ্যে আসেন শায়খ শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া মানিরী এবং তিনি শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামাহ'র তত্ত্বাবধানে সোনারগাঁওয়ে হাদিসের শিক্ষা সম্পন্ন করেন। পরে ১২৯১ সালে শায়খ শরফুদ্দিন ইয়াহইয়া মানিরী পুনরায় দিল্লি ফিরে গিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হাদিস শিক্ষার প্রাচীন ও বর্তমান পদ্ধতির মধ্যে বেশ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। প্রাথমিকভাবে হাদিস শিক্ষা সাধারণত ব্যক্তি পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিক্ষার্থীরা কোনো এক মুহাদ্দিসের নিকট এসে হাদিসের বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করতেন, ফলে একই বিষয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখিত হাদিসসমূহ শিক্ষার্থীদের সংক্ষেপে বর্ণনা করে হাদিসের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য বিষয়াদি বিশদভাবে আলোচনা করার পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ পেতেন এবং পরে তাঁরা নিজেরাই বিভিন্ন অঞ্চলে একই পদ্ধতিতে হাদিসের শিক্ষা প্রদান করতেন। ফলে সেই যুগের শিক্ষার্থীদের মাঝে হাদিসের ব্যাখ্যা ও হাদিস থেকে উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফিকহি বিষয়াদির মধ্যে খুব বেশি মতবিরোধ পরিলক্ষিত হতো না। পরবর্তীকালে ১৭৮১ সালে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পর ব্যক্তি পর্যায়ের পরিবর্তে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে হাদিস শিক্ষা এসব অঞ্চলে ব্যাপকতা লাভ করে। আলীয়া মাদরাসার পাশাপাশি কাওমী ধারার মাদরাসাগুলোও যুগ যুগ ধরে হাদিস শিক্ষা প্রদান করে আসছে।

পূর্ববঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক হাদিস শিক্ষা

পূর্বে আলোচিত হয়েছে যে, খ্রিষ্টাব্দ তেরো শতকে শায়খ শরফুদ্দিন আবু তাওয়ামাহ'র তত্ত্বাবধানে পূর্ববঙ্গের সোনারগাঁওয়ে হাদিস শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়, তবে পূর্ববঙ্গে ব্যক্তি পর্যায়ের পরিবর্তে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চট্টগ্রাম তথা সমগ্র বাংলাদেশের প্রাচীনতম দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাটহাজারী মাদরাসায় ১৯০৮ সালে সর্বপ্রথম হাদিস শিক্ষা শুরু হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের হাদিস শিক্ষার অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুদ দেওবন্দের মেধাবী ছাত্র ও স্বল্প সময়ের শিক্ষক মাওলানা সাঈদ আহমদ

সন্দীপি প্রথম শায়খুল হাদিস ছিলেন বিধায় তাঁকে বাংলাদেশে হাদিস চর্চা ও শিক্ষার প্রধান পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে চট্টগ্রামের ২য় প্রাচীন দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জিরি মাদরাসায় ১৯২০ সালে হাদিস শিক্ষার পাঠদান শুরু হয় এবং মাওলানা আবদুল অদুদ সন্দীপি প্রথম শায়খুল হাদিস ছিলেন এবং পটিয়া জমিরিয়া মাদরাসায় ১৯৪৫ সালে হাদিস শিক্ষার পাঠদান শুরু হয়। তখনো পূর্ববঙ্গের কোনো আলীয়া মাদরাসায় হাদিস শিক্ষা বলতে যা বুঝানো হয় অর্থাৎ কুতুবে সিত্তাসহ হাদিসের মৌলিক গ্রন্থসমূহের পাঠ শুরু হয়নি। সেই সময়ে আলীয়া মাদরাসার শিক্ষার্থীদের হাদিস শিক্ষা গ্রহণের জন্য কলিকাতা আলীয়া মাদরাসা ব্যতীত কোনো পথ ছিল না এবং খুব স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থী এই সুযোগ পেতো।

পূর্ববঙ্গে আলীয়া মাদরাসা পর্যায়ে সর্বপ্রথম হাদিস শিক্ষার পাঠদান শুরু হয় সরকারী সিলেট আলীয়া মাদরাসায়। ১৯৩৫ সালে তৎকালীন আসাম সরকারের শিক্ষামন্ত্রী খান বাহাদুর আবদুল মজিদের সরাসরি উদ্যোগে কলিকাতা আলীয়া মাদরাসার আদলে সিলেট আলীয়া কামিল হাদিস বিভাগের অনুমোদন লাভ করলেও শায়খুল হাদিসের অভাবে হাদিস শিক্ষার পাঠদান চালু করা সম্ভব হয়নি। দুই বৎসর পর দারুল উলুম দেওবন্দের মুহাদ্দিস মাওলানা ছাহুল উসমানীকে শায়খুল হাদিস নিয়োগ প্রদানের পর ১৯৩৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে হাদিস শিক্ষার পাঠদান শুরু হয় এবং তিনি ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত উক্ত মাদরাসায় শায়খুল হাদিসের দায়িত্ব পালন করেন। তবে পরবর্তী পর্যায়ে পূর্ববঙ্গে ক্বাওমী মাদরাসার পাশাপাশি ব্যক্তি পর্যায়ের উদ্যোগে অনেক আলীয়া মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা লাভ করে, এর মধ্যে বৃহত্তর বরিশাল অঞ্চলের ছারছিনা আলীয়া মাদরাসায় ১৯৪২ সালে এবং চট্টগ্রামের চন্দনপুরা দারুল উলুম আলীয়া মাদরাসায় ১৯৪৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে হাদিস শিক্ষার পাঠদান শুরু হয় ।

ভারত ভাগের পর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হলে পূর্ববঙ্গে মাদরাসা শিক্ষায় আরো কিছুটা উন্নতি ঘটে এবং সরকারী পর্যায়ে কলিকতা আলীয়ার আদলে ঢাকা আলীয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক কামিল মাদরাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে যার মাধ্যমে আলীয়া মাদরাসার শিক্ষার্থীদের সামনে কুতুবে সিত্তাসহ হাদিসের মৌলিক গ্রন্থসমূহের পাঠ গ্রহণ সহজ হয় এবং ঢাকা আলীয়া ১৯৪৮ সালে, বগুড়া আলীয়া মাদরাসা ১৯৪৯, চট্টগ্রামের ওয়াজিদিয়া মদরাসায় ১৯৫৫ সালে, নোয়াখালীর কারামাতিয়া আলীয়া মাদরাসায় ১৯৫৭ সালে, সোবহানিয়া আলীয়া মাদরাসায় ১৯৬৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে হাদিস শিক্ষার পাঠদান শুরু হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৭১ পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশে প্রতিটি জেলায় বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে একাধিক কামিল মাদরাসা প্রতিষ্ঠার অনুমতি লাভ করে। সামান্য সরকারী অর্থায়ন ও বাংলাদেশের দানবীরদের সরাসরি আর্থিক অর্থায়নে এই শ্রেণীর আলীয়া মাদরাসাগুলোতে হাদিস শিক্ষার ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটে এবং বাংলাদেশে ক্বাওমী মাদরাসার পাশাপাশি সরকারী স্বীকৃত মাদরাসার শিক্ষার্থীরাও হাদিস শিক্ষার সুযোগ লাভ করে, যা ইতিপূর্বে খুব একটা সহজ ছিল না।

ইল্‌মে হাদিসে উচ্চশিক্ষা প্রদান:

সাধারণত আরবাঞ্চলের হাদিস শিক্ষা পদ্ধতি ও অনারবাঞ্চলের হাদিস শিক্ষা পদ্ধতি এক নয়। সহজেই অনুমেয় যে, হাদিসের ভাষা আরবি হওয়ার কারণে আরবাঞ্চলের হাদিস শিক্ষা প্রদানে স্বাভাবিকভাবেই শাব্দিক ব্যাখ্যার খুব বেশি প্রয়োজন পড়ে না। হাদিসের রেফারেন্স, হাদিসের বিশুদ্ধতা, হাদিস থেকে উদ্ভাসিত বিভিন্ন রহস্যাদি বর্ণনা ও হাদিস থেকে উদ্ভাবিত বিভিন্ন ফিক্‌হী বিষয়াদির বর্ণনা আরবাঞ্চলের হাদিস শিক্ষা প্রদানে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। অপর দিকে অনারবদের ভাষা ও হাদিসের ভাষা ভিন্ন হওয়ার কারণে প্রথমেই হাদিসের শাব্দিক ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে। পরে হাদিসের মর্ম অনুধাবন থেকে শুরু করে হাদিসের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি বর্ণনা ও পর্যালোচনা করা হয়।

তবে পরবর্তী পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় হাদিসের শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়। হাদিস শিক্ষা প্রদানে একই বিষয়ে বর্ণিত হাদিসসমূহের পুনরাবৃত্তি ঘটে, একই হাদিস শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন গ্রন্থে বারংবার পড়ে বিধায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেমন হাদিসের দারসের প্রতি অনীহা সৃষ্টি হয় অনুরূপভাবে মুহাদ্দিসগণও পুনরাবৃত্তি ও সিলেবাস সমাপ্ত করার লক্ষ্যে কোনো রকম ব্যাখ্যা ব্যতীত অতিদ্রুত হাদিস পাঠ করে হাদিসের গ্রন্থ সমাপ্ত করার প্রচেষ্টা চালান এবং বলে থাকেন "হাদিসের টেক্সট পাঠেও অনেক বরকত আছে" যেই দাবির পক্ষে মৌলিক কোনো ভিত্তি নেই। এই সমস্যা শুধু বাংলাদেশে নয় সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে ক্বাওমী ও আলীয়া ধারার মাদরাসাগুলোতে হাদিসের উচ্চ শিক্ষা বলতে কুতুবে সিত্তাসহ হাদিসের কিছু মৌলিক গ্রন্থ পড়ানোকেই বুঝানো হয় যা বাস্তবে সঠিক নয়।

বাংলাদেশে হাদিসের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা:

বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে কওমী ও আলীয়া ধারার মাদরাসাগুলোতে কুতুবে সিত্তাসহ হাদীসের বেশ কিছু মৌলিক গ্রন্থ পড়ানো হলেও ইল্‌মে হাদীসে উচ্চ শিক্ষা বলতে যা বুঝানো হয় তার গোড়াপত্তন হয় মূলত ১৯৮০ সালে রাজধানীর অদূরে গাজীপুরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর পর্যায়ে হাদিস শিক্ষার পাঠদানের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে এবং বাঙ্গালী শিক্ষার্থীদের সামনে ইল্‌মে হাদীসের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ও গবেষণার দ্বার খুলে যায়। কিন্তু তৎকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের কারণে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিকুল পরিস্তিতির সম্মুখীন হয় এবং এক পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তর হয়ে দেশের এক কর্ণারে ইসলামী শিক্ষার উচ্চতর গবেষণা প্রতিষ্ঠান পূনঃস্থাপন করা হয়। যার কারণে মদীনাস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যায়ের মতো দক্ষিণ এশিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়রূপে প্রতিষ্ঠালাভের স্বপ্ন আবারো হোচট্ খায় এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যায়ের বৈশিষ্ট্য হারিয়ে বাংলাদেশে অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় আরেকটি বিশ্ববিদ্যায়ের নাম সংযোজন হয় যাতে ইসলামী শিক্ষার উচ্চতর

গবেষণার গুণগত কোনো লাভ হয়নি।

বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের ইসলাম প্রিয় সংগ্রামী ও ত্যাগী একদল শিক্ষানুরাগী ও সমাজ সেবকদের দীর্ঘদিনের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ও তাঁদের নিরলস পরিশ্রমের ফসল এবং চট্টগ্রামের প্রাণপুরুষ মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম ১৯৯৫ সালে যাত্রা শুরু করলে শরীয়া অনুষদের অধীনে ২০০৬ সালে হাদিস বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদন লাভ করলেও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের বিভিন্ন সীমবদ্ধতার কারণে হাদিস বিভাগ চালু করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী পর্যায়ে মহান রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবাণীতে ২০১৩ সালে আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সিলেবাসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্বখ্যাত আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মাদিনা, ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-রিয়াদ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়-মালোয়শিয়া ও আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সিলেবাসের আদলে প্রণীত পাঠ্যসূচির মাধ্যমে হাদিসে রাসুল (সঃ)'র উচ্চশিক্ষা পাঠদান ও ইল্‌মে হাদিসের উচ্চতর গবেষণা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে "সাইন্সেস অব হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ" বিভাগের যাত্রা শুরু হয় এবং প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা ২০১৬ সালে স্প্রীং সেমিষ্টারে সমাপনী পর্ব সমাপ্ত করে ২০১৬ সালের অটাম সেমিষ্টারে স্নাতকোত্তর পর্বে পর্দাপন করবে ইনশাআল্লাহ ।

অন্যদিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার অধীনে ২০১০ সালে দেশের ত্রিশটি আলীয়া মাদরাসায় আল-হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) পর্বের পাঠদান শুরু হলেও বিগত ৬ বৎসরে উক্ত মাদরাসাসমূহের শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে দৃশ্যমান বিভিন্ন জটিলতার কারণে এখনো স্নাতক (সম্মান) পর্ব সমাপ্ত করতে পারে নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অনারব দেশে ইল্‌মে হাদিসের পাঠদান ও গবেষণার ক্ষেত্রে বেশকিছু বিষয় পর্যবেক্ষণ অতীব জরুরী সত্ত্বেও তা মাদরাসা পর্যায়ে হাদিস পাঠদানে আমলে নেয়া হয় না। তার কয়েকটি নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

ক) হাদিসের সঠিক অর্থ নির্ণয়

আমাদের দেশে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনায় হাদিস শিক্ষা প্রদানের পর থেকে ক্বাওমী মাদরাসা ও আলীয়া মাদরাসা উভয় ক্ষেত্রে হাদিস শিক্ষা প্রদানে বেশকিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সহজেই প্রতীয়মান হয় যেমন মুহাদ্দিসগণ অনেক ক্ষেত্রে হাদিসের মূল টেক্সেটের সঠিক অর্থ নির্ণয় করতে না পারার কারণে হাদিসের সঠিক অর্থ না বুঝে অপব্যাখ্যা প্রদান করে থাকেন। এতে শিক্ষার্থীরা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয় ঠিক তেমনি সাধারণ মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হন। যেমন আল্লাহর রাসুল (সঃ) এরশাদ করেন অনেকেই এই হাদিসের ব্যাখ্যা করেন এভাবে (তোমাদের মধ্যে যদি কেউ শরীয়া বিরোধী বা অশালীন কিছু দেখে তাহলে হাত দ্বারা তা প্রতিহত করো, যদি হাত দ্বারা প্রতিহত করতে সক্ষম না হও তা মুখ দ্বারা প্রতিহত করো, আর তাও যদি সম্ভব না হয় অন্তত মনে মনে তাকে ঘৃণা করো এবং তা হলো ঈমানের সবচেয়ে দুর্বল স্তর)। অথচ এই ব্যাখ্যা হাদিসের মূল টেক্সেটের সাথে কোনোভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই রকম ব্যাখ্যার ফলে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সমাজে ইসলামের সঠিক বার্তার পরিবর্তে ভিন্ন বার্তা পৌছাবে, সাধারণ শিক্ষিত সমাজ ইসলামের সুন্দর আচরণ থেকে বঞ্চিত হবে এবং ইসলাম থেকে দূরে সরে যাবে, যা কারো কাম্য নয়।

খ) হাদীস বিজ্ঞানে জ্ঞানার্জন

হাদিসের অর্থ জানা ও হাদীস বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান থাকা এক অর্থ নয়। আমাদের দেশে এ দুটি বিষয়কে একত্রে গুলিয়ে ফেলা হয়। ইলমুল হাদিস বা হাদীস বিজ্ঞান মূলত হাদিসের পরিভাষা, হাদিসের আহকাম, প্রকারভেদ, হাদিস বর্ণনা, হাদিস গ্রহণ ও বর্জন, হাদিস বর্ণনাকারীদের শর্তাবলী, হাদিস বর্ণনার শর্ত, হাদিস মতে আমল করার বিধান ইত্যাদি বিষয় সম্পৃক্ত জ্ঞানকে বুঝায়। হাদিস পড়ার আগে একজন শিক্ষার্থীর ইলমুল হাদিসের এইসব জ্ঞান অর্জন করা একান্ত আবশ্যক। তা না হলে শুদ্ধ-অশুদ্ধ হাদিস যাচাই করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। যা সঠিক পর্যায়ে হাদিসের আমল করার ক্ষেত্রেও অপরিহার্য।

গ) জাল হাদিস থেকে দূরে থাকা

আমাদের দেশে এক ধরনের প্রবণতা আছে। তা হলো, কেউ কোনো কথা বলে যদি বলেন এটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে তাহলে আমরা সবাই সেটিকে হাদিস বলে গ্রহণ ও আমল করা শুরু করি। জাল বা মিথ্যা হাদিস বলা ও তার মতে আমল করার পরিণতি ও পাপ কী তা না জানার কারণেই এটি আমরা করি। আমাদেরকে মিথ্যা ও জাল হাদিস থেকে দূরে থাকতে হবে। সমাজে প্রচলিত মিথ্যা হাদিসগুলো জেনে নিতে হবে। মিথ্যা ও বিশুদ্ধ হাদিসের বৈশিষ্ট্য জেনে নিতে পারলে বিষয়টি অতি সহজ হবে।

ঘ) প্রাচ্যবিদদের ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করা

বাস্তবতার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের দেশে প্রাচ্যবিদ্যা ও প্রাচ্যবিদদের ব্যাপারে ধারণা খুব বেশি স্পষ্ট নয়। অরিয়েন্টালিস্ট বা প্রাচ্যবিদগণ কুরআন, সুন্নাহ, সীরাতে রাসুল (সঃ) সহ সর্বোপরি গোটা ইসলামের মধ্যে বিভিন্ন মনগড়া বিষয়াদি অনুপ্রবেশের কাজে সর্বদা লিপ্ত। তারা সাধারণ সহজ-সরল মুসলমানদের ঈমান-আকীদা বিনষ্ট করার লক্ষ্যে খুবই বিচক্ষণতার সাথে ধারাবাহিকভাবে এই অপকর্ম করে যাচ্ছে, যাতে করে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের মনে সংশয় সৃষ্টি করা যায়, কোনো অমুসলিম ইসলামের সৌন্দর্য দেখে প্রভাবিত না হয় এবং মুসলমাদের মনে তাদের ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা সৃষ্টি করা যায়। এই অপকর্মের বিস্তারে তারা সীরাতে রাসুল (সঃ),

সাহাবীদের মধ্যে হযরত আবু হুরাইরা ও তাবেয়ীদের মধ্যে ইবন শিহাব যুহরী'র মত মুহাদ্দিসগণকে কলুষিত করতে প্রচেষ্টা চালায়। পাশাপাশি আরবী ভাষাসহ বিভিন্ন ভাষায় ইসলামের খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয় কুরআন ও হাদিসের প্রমাণাদি দিয়ে বিকৃত অর্থে তারা অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার মাধ্যমে ইসলামের মূল স্পিরিট ও চেতনাকে অন্য খাতে প্রবাহিত করা হয়। সাধারণ মুসলিমরা তাদের রচিত গ্রন্থ পাঠ করে বিভ্রান্ত হন। সুতরাং প্রাচ্যবিদদের এই অপকর্ম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট ধারনা প্রদান করে তাদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের যোগ্য করে তোলা বাঞ্ছনীয়।

ঙ) ঈসরাইলী বর্ণনা বর্জন করা

আমাদের সমাজে প্রচলিত অনেক ধর্মীয় গ্রন্থাদি ঈসরাইলী বর্ণনায় ভরপুর। বিশেষ করে তাফসীর ও সীরাত গ্রন্থে এইসব বর্ণনা ব্যাপক। আমাদেরকে এ বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। যে সকল গ্রন্থে এইসব বাতিল বর্ণনা বেশী আছে তা পাঠ থেকে বিরত থাকতে হবে। তাফসীর বা অন্য কোনো গ্রন্থে থাকলেই তা সঠিক মনে করে হাদিস বলে বর্ণনা করা মোটেই সঠিক নয়। বিশেষ করে অভিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণ অনেক ক্ষেত্রে টেক্সটের বর্ণনাশৈলী থেকেই আল্লাহর রাসুলের হাদিস কিনা বুঝতে পারেন।

পরিশেষে, হাদিসে নববীর সঠিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে যেমন যোগ্য ও অভিজ্ঞ মুহাদ্দিসের প্রয়োজন অনুরূপভাবে সঠিক সিলেবাস প্রণয়ন আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সঠিক পর্যায়ে হাদিস বিজ্ঞানে পান্ডিত্য অর্জন করতে পারবে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের রুখে দিতে পারবে। উপরিউক্ত বিষয়াদি সামনে রেখে মুসলিম বিশ্বের সিলেবাসের সাথে সমন্বয় করে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের মেধা-মনন তথা পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক সিলেবাস প্রণয়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম হাদীস বিজ্ঞানে স্নাতক (সম্মান) ও পর্যায়ক্রমে স্নাতকোত্তর প্রোগ্রাম শুরু করেছে যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। যাতে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা দেশেই হাদীস বিজ্ঞানে আন্তর্জাতিক মানের ডিগ্রী অর্জন করতে পারে। আল্লাহ আমাদের এই প্রচেষ্টা সফল করতে সহায়ক হোন। আমীন!

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে
বিপদ-বিপর্যয়ে মুমিনের করণীয়

ড. বি এম মফিজুর রহমান আল্-আযহারী*

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علي سيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

বিপদ-আপদ, দুর্যোগ-দূর্বিপাক মানব জীবনের অপরিহার্য অনুসঙ্গ। তবে মুমিন জীবনে রয়েছে এর ভিন্নতর আকৃতি-প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও আবেদন। যা ঈমানী অগ্নীপরীক্ষা রূপে বিশেষিত হয়। এ পরীক্ষা কখনো কখনো এত কঠিনতর আকার ধারন করে যে আপাত দৃষ্টিতে তাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় মনে হতে পারে। কী করতে হবে, তা নির্ধারন করা তাৎক্ষণিকভাব জটিল হয়ে যায়। এমনই একটি জটিল অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা এখন দিনাতিপাত করছি। এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে আজকের আলোচ্য বিষয় হিসেবে নির্বাচন করেছি, "কুরআন-হাদিসের আলোকে বিপদ-বিপর্যয়ে মুমিনের করণীয়"।

১. নিরাশার আঁধার মুছে দিয়ে সংকল্পকে আরো তীব্রতর করা :

ইসলামে নিরাশার কোন স্থান নেই। কুরআন বলছে," فلاتكن من القانطين " অর্থাৎ তুমি নিরাশদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না" (আল্-হিজর: ৫৫)। আল্লাহ ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হওয়াকে কুরআনে কুফর ও বিভ্রান্তির কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

" إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون " " কাফির কওম ছাড়া কেউই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না" (ইউসুফ:৮৭)।

" ومن يقنط من رحمة الله ربه إلا الضالون. "পথভ্রষ্টরা ছাড়া, কে তার রবের রহমত থেকে নিরাশ হয়?" (আল্-হিজর:৫৬)।

কারণ, নিরাশ ব্যক্তি আল্লাহর উপর খারাপ ধারণা পোষণ করে থাকে। আল্লাহ বলছেন:

وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

" হতে পারে কোন বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোন বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না" (আল-বাকারাহ:২১৬)।

নিরাশার প্রতিক্রিয়া মানুষের উপর অত্যন্ত ভয়বাহ। এর ফলে দায়িত্ব সম্পাদনে আলস্য সৃষ্টি হয়। আল্লাহর স্মরণ থেকে মন গাফিল থাকে। অন্যায় ও পাপাচারে মন ডুবে থাকে। মানব মন পচনশীলতার শিকার হয়। বিদূরিত হয় মনের প্রশান্তি। বঞ্চনা ও দুশ্চিন্তার সার্বক্ষণিক অনুভূতি সৃষ্টি হয়।

হযরত আলী (রা.) বলতেন,

الفقيه حق الفقيه: من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم فى معاصى الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله.

"প্রকৃত ফকীহ সেই ব্যক্তি, যে মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করে না এবং আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে কাউকে নিশ্চিন্ত করে না"।

ইবনু মাসউদ বলেন, الهلاك فى اثنتين، القنوط والعجب. "দুটো জিনিসের মধ্যে ধ্বংস: এক. নিরাশ হওয়া: দুই. আত্মম্ভরিতা"।

নিরাশার কারণসমূহ :

বিভিন্ন কারণে নিরাশার অনুভূতি সৃষ্টি হয়। যেমন:

ক. ধৈর্যের অভাব ও কোন কাজের তাৎক্ষণিক সুফল প্রাপ্তির আশা/ কর্মফলের জন্য তাড়াহুড়ো করা: وكان الإنسان عجولا. "আর মানুষ তো তাড়াহুড়া প্রবণ" (বনী ইসরাইল:১১)। হাদিসের মধ্যে এসেছে:

وعن خباب بن الأرت رضى الله عنه قال: شكونا إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له فى ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: ألا تستنصر لنا، ألا تدو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ لرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون.

হযরত খাব্বাব বিন আরাত বলেন, " আমরা রাসূলের কাছে গিয়ে মুশরিকদের অত্যাচারের বিষয়ে অভিযোগ করলাম। তখন তিনি কা'বার ছায়ায় চাদর পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। আমরা বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করবেন না? দু'আ করবেন না? রাসূল (সা.) বললেন, "তোমাদের আগে এমন লোকও ছিল যাদেরকে মাটির মধ্যে আকণ্ঠ সমাধিস্থ করে মাথার উপর করাত রেখে ফেরে দু'ভাগ করে দেয়া হয়েছে। তারপর লোহার চিরুনী দিয়ে গোশত থেকে হাড্ডি আলাদা করে দেয়া হয়েছে। এত কিছুও তাদেরকে আল্লাহর দ্বীন থেকে বিরত বা ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। আল্লাহর কসম, অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ এ দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিবেন। এমনকি একজন পথিক সান'আ থেকে হাজরা মাওত পর্যন্ত ভ্রমন করবে। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া সে কাউকে ভয় করবে না। তার ছাগলের উপর বাঘের ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা বড় তাড়াহুড়ো করছো!

---

* অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ, ও সাবেক পরিচালক, ইউনিভার্সিটি রিকোয়ারমেন্ট কোর্সেস, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।

খ. সবকিছুকে পার্থিব মানদন্ডে পরিমাপ করা :

فقد قال رجل لأحد الحكماء:إن لي أعداء،فقال له: ... ومن يتوكل على الله فهو حسبه (الطلاق: الآية ٣).. وقال الرجل: ولكنه يكيدون لي،فقال له: ...ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله (فاطر: الآيةك٤٣).. قال الرجل: ولكنهم كثيرون،فقال له: ...كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. (البقرة: الآية ٢٤٩).

এক ব্যক্তি কোন এক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিকে বললো, আমার শত্রু অনেক। তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট" (সূরা আততালাক:৩)। লোকটি বললো, কিন্তু তারাতো আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে? প্রজ্ঞাবান লোকটি বললেন, "কুটচক্রান্ত কেবল তার ধারককেই পরিবেষ্টন করবে" (ফাতির:৪৩)। লোকটি আবার বললো, তাদের সংখ্যাতো অনেক? তিনি বললেন, 'কত ছোট দল আল্লাহর হুকুমে বড় দলকে পরাজিত করেছে'!" (আল-বাকারাহ:২৪৯)।

এভাবে আমরা যদি সবকিছু আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে দেই, তাহলে নিরাশার আঁধার কখনো আমাদেরকে হাতছানি দিতে পারবে না। বরং আমাদের মন সম্পৃক্ত থাকবে আল্লাহর সাথে নতুন নতুন আশা ও স্বপ্ন নিয়ে । যিনি আমাদের রব, যার কোন শরীক নেই, যিনি সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী।

আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা, আল্লাহভীতিতে সীমাতিক্রম করা, নৈরাশ্যবাদীদের সাথে সখ্যতা, শুধুমাত্র পার্থিব উপায়-উপাদাননির্ভর হয়ে পড়া, সাহসিকতার অভাব ও বাস্তবতার কাছে নতি স্বীকার করা, অবস্থার পরিবর্তন সাধনে আগ্রহের অভাব ইত্যাদি আরো অনেক কারণে নিরাশা সৃষ্টি হতে পারে।

নিরাশার প্রতিকার :

প্রথম করণীয়: উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলার মানসিকতা ও পূর্ব প্রস্তুতি :

যে কোন ধরনের ভয়াবহ প্রতিকূলতার সম্ভাবনা সামনে রাখা এবং তা মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকা। রাসূল (সা.) শহীদ হয়েছেন- উহুদ যুদ্ধে এ ধরনের গুজব ছড়িয়ে পড়লে সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যে মানসিক অস্থিতিশীলতা, অবস্থার চরম অবনতি ঘটার উপক্রম হয়, সেই প্রেক্ষিতে ইরশাদ করা হয়েছে ঃ

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو انقلتم علي أعقابكم ومن ينقلب عل عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين. (آل عمرا: ١٤٤).

"আর মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তার পূর্বে নিশ্চয় অনেক রাসূল বিগত হয়েছে। যদি সে মারা যায় অথবা তাকে হত্যা করা হয়, তবে তোমরা কি তোমাদের পেছনে ফিরে যাবে? আর যে ব্যক্তি পেছনে ফিরে যায়, সে কখনো আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ অচিরেই কৃতজ্ঞদের প্রতিদান দেবেন" (আলে-ইমরান:১৪৪)। মূলত এ রকমই হচ্ছে ঈমানের হাক্বীক্বাত ও দাবী।

দ্বিতীয় করনীয়: চূড়ান্ত পরিণামের অপেক্ষা :

বিশ্বাস রাখতে হবে, চূড়ান্ত পরিণামে ইসলামের বিজয়ই হবে। মিথ্যার কণ্ঠ যতই উঁচু হোক না কেন তা অবশ্যই ধ্বংসের দিকে ধাবিত হবে। আল্লাহ বলছেন,

هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره علي الدين كله ولو كره المشركون.

তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি একে সকল দ্বীনের উপর বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা অপছন্দ করে (আত-তাওবাহ:৩৩)।

আমাদেরকে দুটো জিনিস মনে রাখতে হবে :

১. আল্লাহ তা'আলা প্রথমে শত্রুদের ষড়যন্ত্র, হিংসা ও ঔদ্ধত্যের কথা উল্লেখ করেছেন:

وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول من الجبال.

"আর তারা তাদের ষড়যন্ত্র করেছিল, আর আল্লাহর কাছেই তাদের ষড়যন্ত্র, যদিও তাদের ষড়যন্ত্র এমন ছিল যা দ্বারা পাহাড় অপসারিত হয়ে যায়" (ইবরাহীম:৪৬)। ঠিক তার অব্যবহিত পরেই তাঁর প্রিয় মুমিন বান্দাদের জন্য সাহায্য ও বিজয়দানের অঙ্গীকার করেছেন।

فلا تحسبن الله مخلف وعد رسله إن الله عزيز ذو انتقام.

"সুতরাং তুমি কখনো আল্লাহকে তাঁর রাসূলদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী মনে করো না। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।"(ইবরাহীম:৪৭)। অতএব, আমরা শুধু শত্রুদের ষড়যন্ত্র ও শৈর্য-বীর্যের কথাই মনে রাখবো, আর ভুলে যাবো কিংবা উপেক্ষা করবো আল্লাহর অঙ্গীকার সাহায্য ও বিজয় প্রসঙ্গে, তা কি করে হতে পারে?

২. প্রিয় বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সাহায্য দেরীতে আসার পেছনে অনেক প্রজ্ঞা ও হিকমত আছে। শহীদ সাইয়্যেদ কুতুব এগুলোর সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়েছেন এভাবে:

* মুমিনরা যেন দ্বীনের জন্য তাদের জীবন, সম্পদ, সময় ও শ্রম উৎসর্গ করে। আল্লাহ তা'আলা তা দেখতে চান। কারণ যারা ঘরের মধ্যে বসে থাকে, উদাসীন-অমনোযোগী কিংবা হাসিখেলায় মত্ত থাকে, তাদের কাছে আল্লারহ সাহায্য নাযিল হয় না।
* এভাবে আল্লাহ বাতিল ও বাতিলপন্থীদের ভয়ংকর, বিভৎস স্বরূপ উন্মোচিত করতে চান।

* আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য যেন প্রয়োজনীয় উপায়-উপাদান গ্রহণ করতে পারে। যেমন, প্রশিক্ষণ, প্রস্তুতি গ্রহণ, খাঁটি ভ্রাতৃত্ব, সুদৃঢ় ঐক্য ইত্যাদি।

আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে বিশ্বাস, তাঁর উপর সুধারণা ও তাঁর রহমতের প্রত্যাশা, আল্লাহর সাথে অটুট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও তার উপর বিশ্বাস, বিপদে ধৈর্য ধারণ করা, দু'আ করা কবুল হওয়ার বিশ্বাস নিয়ে এবং উপায় অবলম্বন করা ইত্যাদি আরো অনেক প্রকার প্রতিকার রয়েছে নিরাশার।

দ্বিতীয় করণীয়: অন্তর্দ্বন্দ্ব নিরসন করে ইসলামী শক্তি গুলোর মহা ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালানো :

অনৈক্য একটি অভিশাপ। এর চেয়ে বড় বিপর্যয় আর নেই। মুসলিম উম্মাহর শৌর্য্য-বীর্য, সম্মান-ঐতিহ্য হারানোর পেছনে এই কারণটি সর্বাধিক সক্রিয়। আজকের মুসলিম জাতি যে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে, এখান থেকে মুক্তি পেতে হলে নিজেদের ভেতরের সব বিবাদ-অনৈক্য দূর করে আবার মহা ঐক্যের পতাকাতলে ফিরে আসতে হবে। নিজেদের মধ্যকার ছোট-খাট ইজতিহাদী মতানৈক্যগুলো অতিক্রম করে ঈমান ও ইবাদাতের মৌলিক শিক্ষার চোরে ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম তৈরি করতে হবে। কুরআনের মধ্যে বিভিন্নভাবে এই ঐক্যের অনিবার্যতা তুলে ধরা হয়েছে। কখনো সরাসরি ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লারহ বাণী:

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.

"আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিভক্ত হয়ো না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। তারপর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালবাসার সঞ্চার করেছেন। অতঃপর তাঁর অনুগ্রহে তোমরা ভাই-ভাই হয়ে গেলে। আর তোমরা ছিলে আগুনের গর্তের কিনারায়, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ বয়ান করেন, যাতে তোমরা হিদায়াতপ্রাপ্ত হও" (আলে-ইমরান:১০৩)।

কখনো আবার এমন কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য অনিবার্য। যেমন, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সুস্পর্ক প্রতিষ্ঠার নির্দেশ।

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.

"নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই তোমরা তোমাদের ভাইদের মধ্যে আপোষ- মীমাংসা করে দাও"(আল্-হুজুরাত:১০)।

কখনো আল্লাহ ঐক্যনাশক পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ থেকে নিষেধাজ্ঞা জারি করে এর পরিণাম থেকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين.

"আর তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহস হারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধর, নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন"(আনফাল:৪৫)।

কখনো ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রতি পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে।

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم.

"আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়িম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (আত তাওবাহ:৭১)।

তৃতীয় করণীয় : নিজেদের অযোগ্যতা, অক্ষমতা ও ভুল-ত্রুটির জন্য আল্লাহর দরবারে ধরণা দেয়া ও তাওবাহ্ করা:

আল্লাহ বলেন, فلولا إذ جاء هم بأسنا تضرعوا "সুতরাং তারা কেন বিনীত হয় নি, যখন আমার আযাব তাদের কাছে আসল? (আন'আম:৪৩)"। হযরত ইউনুছ (আ.) এর উম্মতের মধ্যে আমাদের জন্যে রয়েছে উত্তম উদাহরণ। তারা যখন আল্লাহর আযাবের পূর্বাভাসগুলো দেখে বিনীতভাবে আল্লাহর কাছে ফিরে এসেছিলো, আল্লাহ তাদের উপর থেকে শাস্তি উঠিয়ে নিয়েছিলেন। তাদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত সুখ-শান্তিময় জীবন দান করেছিলেন। সুদ-ঘুষ, যিনা-নগ্নতা-বেহায়াপনা, খুন-খারাবী, কুরআন-বিরোধী শাসন ও সমাজ ব্যবস্থা অনুসরণ ইত্যাকার নাফরমানিতে সমাজ আজ ক্ষত-বিক্ষত। এ ক্ষেত্রে ঈমানদার হিসেবে যেভাবে দ্বীনের দাওয়াত তথা আল-আমরু বিল মারুফ ওয়ান নাহি আনিল মুনকারের মাধ্যমে সমাজ সংশোধনের দায়িত্ব পালন করার কথা ছিল, তা আমরা করছি না। তাই বালা-মুছিবাতের ঘূর্ণিপাক থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারছিনা।

আল্লাহ বলেন, ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.

"আর তোমাদের প্রতি যে মুসীবত আপতিত হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল। আর অনেক কিছুই তিনি মাফ করে দেন" (আশ্শু'আরা:৩০)। তাওবাহ্-ইস্তেগফারের মাধ্যমে নিজেদের অন্যায়-অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে আল্লাহর গযব থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. " আল্লাহ তাদেরকে আযাব দানকারী নন

এমতাবস্থায় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে" (আল-আনফাল:৩৩)। রাসূল (সা.) তায়েফের প্রান্তরে মুশরিকদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় বেহুশ হয়ে পড়েছিলেন। অতঃপর সংজ্ঞা ফিরে আসলে আল্লাহর কাছে এই বলে বিনীত প্রার্থন করেছিলেন,

اللهم اليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني علي الناس، يا أرحم الراحمين! أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلي عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذى أشرفت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك. أو يحل على سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، (ابن هشام، ١/ ٤٢٠.

"হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট আমার দুর্বলতা, আমার সহায়-সম্বলের স্বল্পতা এবং আমার প্রতি মানুষের অবজ্ঞার অভিযোগ করছি। হে দয়ালু, দয়াবান প্রভু! দুর্বল ও অসহায়দের প্রভু তুমিই, আমার মালিকও তুমিই। তুমি আমাকে কার হস্তে সোপর্দ করছো? এমন আত্মীয় ব্যক্তিদের হস্তে, যারা আমার প্রতি নির্দয় আচরণ করবে অথবা এমন শত্রুর নিকট, যাকে আমার ব্যাপারে ক্ষমতা প্রদান করেছ? কিন্তু তুমি যদি আমার উপর অসন্তুষ্ট না হও, তাহলে আমি কোন পরওয়া করি না। কারণ তোমার নিরাপত্তা দানেই আমার জন্য যথেষ্ট প্রশস্ততা রয়েছে। আমি তোমার অনুপম নুরের অছিলায়, যার দ্বারা অন্ধকার জ্যোতির্ময় এবং ইহজগত ও পরজগতের সব কিছু সঠিকভাবে পরিচালিত, তোমার ক্রোধ আমার উপর আপতিত হওয়া হতে অথবা আমি তোমার অসন্তোষের ভাগী হওয়া থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যদি না তুমি রাজি হও, তবে তিরস্কার করার এবং শাস্তিদানের অধিকার কেবল তোমারই আছে। তোমার সহায় ব্যতীত কোন ক্ষমতাই ক্ষমতা নয়"।

চতুর্থ করণীয় : ঈমানের অগ্নী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তাকওয়া ও ধৈর্যের সাথে সত্যের উপর অবিচল থাকা:

ঈমানের পথ সর্বদা কন্টকাকীর্ণ। এখানে প্রতিনিয়ত পরীক্ষা দিতে হয়। অগ্নী পরীক্ষা। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য্য ও তাকওয়া। এ পথে কোন বিশ্রাম নেই। নেই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার কোন সুযোগ। সুখে-দুঃখে, অনুকলে-প্রতিকুলে সর্ববস্থায় আল্লাহর সাথে অটুট বন্ধনে আবদ্ধ থাকার প্রতীজ্ঞা নিতে হয়। এ জন্যই আল্লাহ বলছেন,

لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور.

"অবশ্যই তোমাদেরকে তোমাদের ধন-সম্পদ ও তোমাদের নিজ জীবন সম্পর্কে পরীক্ষা করা হবে। আর অবশ্যই তোমরা শুনবে তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের পক্ষ থেকে এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তবে নিশ্চয় তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ"(আলে-ইমরান:১৮৬)।

إن تمسسكم حسن تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ان الله بما يعملون محيط.

"যদি তোমাদেরকে কোন কল্যাণ স্পর্শ করে, তখন তাদের কষ্ট হয়। আর যদি তোমাদেরকে মন্দ স্পর্শ করে, তখন তারা তাতে খুশি হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছু ক্ষতি করবে না। নিশ্চয় আল্লাহ তারা যা করে, তা পরিবেষ্টনকারী"(আলে-ইমরান:১২০)।

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب.

"নাকি তোমরা ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ এখনো তোমাদের নিকট তাদের মত কিছু আসেনি, যারা তোমাদের পূর্বে বিগত হয়েছে। তাদেরকে স্পর্শ করেছিল কষ্ট ও দুর্দশা এবং তারা কম্পিত হয়েছিল। এমনকি রাসূল ও তার সাথি মুমিনগণ বলছিল, 'কখন আলাহর সাহায্য (আসবে)'? জেনে রাখ, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী" (আল-বাকারাহ:২১৪)।

أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.

মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আর আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছি। ফলে আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্য বলে এবং অবশ্যই তিনি জেনে নেবেন, কারা মিথ্যাবাদী" (আল-আনকাবুত:২,৩)।

যারা ঈমানের এই অগ্নী পরীক্ষায় অনঢ় থাকে, তাদের জন্যই রয়েছে দুনিয়ায়-পরকালে সুসংবাদ। কালের পরিক্রমায় সাফল্য তাদের হাতেই চূড়ান্ত পর্যায়ে ধরা দেয়। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলছেন,

إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين.

"যদি তোমাদেরকে কোন আঘাত স্পর্শ করে থাকে তবে তার অনুরূপ আঘাত উক্ত কওমকেও স্পর্শ করেছে। আর এইসব দিন আমি মানুষের মধ্যে পালাক্রমে আবর্তন করি এবং যাতে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে জেনে নেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে শহীদদেরকে গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ যালিমদেরকে ভালবাসেন না" (আল্-ইমরান:১৪০)।

পঞ্চম করণীয় : শত্রুকে চেনা এবং তাকে প্রতিহত করার জন্য সক্ষমতা অনুসারে প্রস্তুতি গ্রহণ করা :

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্য কুরআনুল কারীমে মানবতার প্রকৃত শত্রুদের মুখোশ খুলে হয়েছে এবং তাদের অনিষ্টতা থেকে সুরক্ষা অর্জনের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ সব শত্রুদের মধ্যে রয়েছে: শয়তান, ইয়াহুদী, কাফির-মুশরিক এবং তাদের অনুগত-

অনুসারী। যারা ইসলাম ও মুসলিমদের ক্ষতি সাধনে সদা তৎপর। এ অর্থে ইসলাম পরিপন্থী মতবাদ-মতাদর্শ প্রণয়নকারী ও তাতে বিশ্বাসীরা বর্তমান যুগে মুসলিমদের প্রকৃত শত্রু হিসেবে পরিগণিত। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ এসব মতবাদ এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইরশাদ হয়েছে: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبة ليكونوا من أصحاب السعير.

"নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু; অতএব তাকে শত্রু হিসেবে গণ্য কর" (ফাতির:৬)।

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا.

"তুমি অবশ্যই মুমিনদের জন্য মানুষের মধ্যে শত্রুতায় অধিক কঠোর পাবে ইয়াহূদীদেরকে এবং যারা শিরক করেছে তাদেরকে" (আল-মাইদাহ:৮২)। তারা যে অনবরত তাদের শত্রুতা পোষণ করে যাবে আমাদেরকে সত্য দ্বীন থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্য সে কথাও বলা হয়েছে। ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء "তারা কামনা করে, যদি তোমরা কুফরী করতে যেভাবে তারা কুফরী করেছে। অতঃপর তোমরা সমান হয়ে যেতে" (আননিসা:৮৯)।

ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة "কাফিররা কামনা করে যদি তোমরা তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও আসবাব-পত্র সম্বন্ধে অসতর্ক হও তাহলে তারা তোমাদের উপর একসাথে ঝাঁপিয়ে পড়বে"(আননিসা:১০২)।

এ সব শত্রুর ব্যাপারে সর্বদা সর্তকতা অবলম্বন করে তাদের সংখ্যা, শক্তি, কৌশল ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক তথ্য সংগ্রহে রেখে তাদের শত্রুতা প্রতিহত করার জন্য ঈমানী শক্তির পাশাপাশি বৈষয়িক শক্তি-সামর্থ্য প্রস্তুত করা মুমিনদের আরেকটি দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون.

"আর তাদের মুকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত কর, তা দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে এবং এরা ছাড়া অন্যদেরকেও, যাদেরকে তোমরা জান না, আল্লাহ তাদেরকে জানেন। আর তোমরা যা আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর, তা তোমাদেরকে পরিপূর্ণ দেয়া হবে, আর তোমাদেরকে যুলম করা হবে না" (আনফাল:৬০)।

ষষ্ঠ করণীয়: দু'আ করা:

এটি মুমিনের একটি অন্যতম অস্ত্র। আত্মা ও হৃদয়ের প্রশান্তি। সমস্ত নবী-রাসূলের কর্মপদ্ধতি। আল্লারহ সন্তুষ্টি। শত্রুর প্রতি তীক্ষ্ণ তীর। কল্যাণের চাবিকাঠি। অথচ অনেকেই এ ব্যাপারে উদাসীন। তাই মনের আকুতি-মিনতি-ব্যথা-বেদনা সব কিছু স্রষ্টার সামনে তুলে ধরতে হবে। তাঁরই সাহায্য ও রহমত কামনায় নিজেকে নত করে দিতে হবে। জয়-পরাজয়, সাফল্য-ব্যর্থতা তাঁরই সিদ্ধান্তে নির্ণিত হয়। আল্লাহ বলেন, "তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদাত থেকে অহংকারবশত মুখ ফিরিয়ে নেয়, তারা নিকৃষ্ট অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে" (গাফির:৬০)।

واذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.

"আর যখন আমার বান্দাগণ তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, আমি তো নিশ্চয় নিকটবর্তী। আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং তারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে। আশা করা যায় তারা সঠিক পথে চলবে" (আল-বাকারাহ:১৮৬)।

সপ্তম করণীয় : ইতিহাস সচেতন হওয়া এবং অতীতের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো:

ইসলামের ইতিহাস অত্যন্ত সমৃদ্ধ ইতিহাস। এখানে রয়েছে বীরত্বগাথা, রয়েছে সাফল্যের স্বর্নযুগ। রয়েছে ব্যর্থতা-বিপর্যয়কে জয় করার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কৌশল। বিশ্ব জয়ের হাজারো ঘটনা ও স্মৃতি। প্রতিকূল ও বন্ধুর পথে চলার নানা দিকনির্দেশনা। আছে ঐতিহ্য ও নেতৃত্বের সঠিক শিক্ষা। ইতিহাস সচেতন জাতি কখনোই স্বকীয়তা বিসর্জন দেয় না। আর যে জাতি আপন স্বকীয়তায় উদ্ভাসিত, সে জাতি কখনো পরাজিত হয় না। এ কারণেই সাহাবীরা বলতেন, "আমরা আমাদের সন্তানদেরকে রাসূলের রণকৌলশ, বীরত্বগাঁথা, যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস তথা মাগাযী শিক্ষা দিতাম, যেভাবে তাদেরকে কুরআন শিক্ষা দিতাম। মুসলিমরা গোটা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিয়ে শিক্ষা-সভ্যতার দিশা দিয়েছিলেন। তাদের সেই ইতিহাস হতে পারে আমাদের চলার পথে আলোকবর্তিকা। যার আলোকে আমরা শত ভুল-ত্রুটি ও ব্যর্থতার মাঝে খুঁজে পাব, আলোর দিশা। এ দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন,

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.

"তাদের এ কাহিনীগুলোতে অবশ্যই বুদ্ধিমানদের জন্য রয়েছে শিক্ষা, এটা কোন বানানো গল্প নয়, বরং তাদের পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী এবং প্রতিটি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ। আর হিদায়াত ও রহমত ঐ কওমের জন্য যারা ঈমান আনে" (ইউসূফ:১১১)।

সর্বশেষে কবিতার একটি পক্তি দিয়েই আজকে শেষ করছি ঃ

গভীর রাত্রি শেষে
আলোর প্রভাত হাসে
ভোরের পাখিরা গাহে দিবসেরই গান
আধারে পরে আসে মুগ্ধ সকাল।

হে আল্লাহ, তুমি এ জাতির ভাগ্যাকাশে প্রভাত এনে দাও। আমীন।

উন্নত বিশ্ব ও ইসলামী আইন

আতাউর রহমান নাদভী*

একজন মুক্তমনা গবেষক ও নীতিবান চিন্তাবিদ এবং সত্যকে মেনে নেয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী Tradition of Islam & Islamic Law সম্পর্কে যতই গবেষণা করবেন তার কাছে ততই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে। তার কাছে ফুটে উঠবে ইসলামের সৌন্দর্য এবং যুগোপযোগীতা প্রমাণিত হবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে। পরিশেষে নির্দ্বিধায় বলে উঠবে বিশ্ব সৌন্দর্যের প্রতীকই হলো একমাত্র ধর্ম ইসলাম ও তার বিধান। যেহেতু এটি আল্লাহর একমাত্র মনোনীত ধর্ম, তাই এখানে কোনো কিছু অসম্পূর্ণ থাকতেই পারে না। এখানে রয়েছে আল্লাহর হিকমাত ও জ্ঞানের রঙ্গমঞ্চ। আর তাই তিনি ইসলাম সম্পর্কে পরিস্কার বলেছেন ঃ

﴿ إن الدين عند الله الإسلام ، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ﴾

"ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন-জীবন বিধান। যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিলো তারা এ দ্বীন থেকে সরে গিয়ে যেসব বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, সেগুলো অবলম্বনের এছাড়া আর কোনো কারণই ছিলো না, যে প্রকৃত জ্ঞান এসে যাওয়ার পর তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পরের বাড়াবাড়ি করার জন্যই এমনটি করেছে, আর যে কেউ আল্লাহর হিদায়াতের আনুগত্য করতে অস্বীকার করে তার কাছ থেকে হিসাব নিতে আল্লাহর মোটেও দেরী হয় না"[১]। আল্লাহ তা'য়ালা তার এই দ্বীন সম্পর্কে আরো বলেছেন ঃ

﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم﴾

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করেছি, এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছি"[২]। অতএব উপরোক্ত আয়াতে পরিস্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো মতে ও পথে শান্তি খুঁজতে গেলে সেটি কখনো পাওয়া যাবে না। আর মুসলমানের জন্য অন্যত্র শান্তি খুঁজতে যাওয়া জায়েযও নেই। আল্লাহ এ সম্পর্কে অন্যত্র বলেছেন ঃ ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾

"যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করতে চায় তার সে পদ্ধতি কখনোই গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে হবে ব্যর্থ, আশাহত ও বঞ্চিত" [৩]।

আল্লাহর আইন ও ইসলামী বিধান সমুহের মধ্যে ত্বালাক্ব ও বহু বিবাহ সংক্রান্ত বিধান হলো সকল যুগ ও সকল সমাজের এটি উপযোগী একটি বিধান। উন্নত বিশ্ব আজ নারী স্বাধীনতার নামে ইসলামের এই প্রথা বা Muslim Personal Law কে সবচেয়ে বেশী গাল-মন্দ দিচ্ছে। ইসলামের এই বিধান নারী স্বাধীনতা বিরোধী বলে শরী'য়াত পরিবর্তনের দাবী তুলে নারী উন্নয়নের মায়া কান্নাও কাঁদছে। আর অন্যদিকে যারা আজ উন্নত বিশ্ব এবং উন্নত বিশ্বের নাগরিক বলে দাবী করছে তারাই আজ তাদের সমাজে এই দু'টি প্রথা প্রবর্তনের চিন্তা-ভাবনা করছে সবচেয়ে বেশী। আমার এই দাবীর সত্যতা যাচাইয়ের জন্য খুব বেশী দূরে যেতে হবে না। আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতের দিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই ভারতে হিন্দুদের আন্দোলনের মুখে ১৯৫৫ ইংরেজীতে তদানিন্তন সরকার Hindu Code অনুযায়ী একজন হিন্দু পুরুষ একজন হিন্দু নারীকে সর্ব প্রথম ত্বালাক্বের অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছে। অথচ এর পূর্বে হিন্দু ধর্মে ত্বালাক্বের কোনো ধারণাই ছিলো না। বরং হিন্দু ধর্মে বিবাহ প্রথাকে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু পর্যন্ত একটি অটুট বন্ধন মনে করা হতো। এমন কি স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে তার চিতায় জীবিত নিক্ষেপ করা হতো এবং একই চিতায় স্বামীর সাথে জ্বলে নিজের জীবন দিয়ে স্ত্রীকে এমন অটুট বন্ধনের নামে ধর্মীয় নিষ্ঠুরতার প্রমাণ দিতে হতো। কী নিষ্ঠুর তাদের এই বিবাহ বন্ধন! কি বর্বর তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি। কিন্তু আজ হিন্দুদের এই প্রথা এবং এই অটুট বন্ধন তাদের সমাজে মাকড়সার জালের মতো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। এটির কোনো অস্তিত্ব আজ হিন্দু সমাজে নেই। সেখানে বর্তমান যখন তখন স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। অনুরূপভাবে আমরা উন্নত বিশ্বেও দেখতে পাই যেখানে খৃষ্টান ধর্ম প্রচলিত। খৃষ্টান ধর্মেও ত্বালাক্ব কোনো অবস্থাতেই জায়েয ছিলো না। ত্বালাক্ব দেয়া-নেয়া সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণাই ছিলো না। খৃষ্টানদের আক্বিদাহ বা বিশ্বাস ছিলো, যে বন্ধনের হুকুম স্বয়ং আল্লাহ দিয়েছেন সেই বন্ধন কোনো মানুষ খুলতে পারবে না। অথচ সেখানেও আজ ত্বালাক্ব দেয়াকে শুধু জায়েয বলা হয় নাই, বরং এই প্রথা তাদের সমাজে কলেরার মতো এক মারাত্মক ব্যাধির রূপ ধারণ করেছে। তাদের অনুসরণে ১৯৬৮ ইংরেজীতে কানাডায়, ১৯৬৯ ইংরেজীতে ইংল্যান্ড ও ইটালীতে ত্বালাক্বের বিল পাস করা হয় [৪]।

শুধু তাই নয়, ইটালীতে এই বিল পাস হওয়ার সাথে সাথে দশ লক্ষ মানুষ তাদের স্ত্রীদেরকে ত্বালাক্ব দেয়ার জন্য আবেদন করেছে। আমেরিকায় শুধু এক বছরের মধ্যে ১৯৭৯ সালে বার লক্ষ মানুষ তাদের স্ত্রীদেরকে ত্বালাক্ব দিয়েছে। আমেরিকার বর্তমান অবস্থা প্রতি দু'টি বিয়ের মধ্যে একটির পরিণাম হচ্ছে ত্বালাক্ব। এই একটি কারণেই আজ আমেরিকার পারিবারিক বন্ধন ধ্বংসের পথে। একজন নারীকে তার স্বামী ত্বালাক্ব দেয়ার পর সে অত্যন্ত দুঃখের সাথে তার মানসিক অবস্থা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছে :

Only woman knows what loneliness is [৫]

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, CENURC, IIUC

অর্থাৎ একাকী জীবন কত কষ্টের তা শুধুমাত্র একজন নারীই বুঝতে পারে।

তাই ত্বালাক্ব পরবর্তী পশ্চিমা জগতের নারী-পুরুষের পারিবারিক জীবন পর্যালোচনা করে মিসেস মারগান নামক একজন আমেরিকান মহিলা সম্প্রতি Total Woman নামে একটি বই লিখেছেন। উক্ত বইতে তিনি আমেরিকান নারীদেরকে সুন্দর দাম্পত্য জীবন যাপনের পরামর্শ দিতে গিয়ে লিখেছেন : Be nice to your husband, stop nagging him and understand his needs.[৬]

"তোমরা তোমাদের স্বামীর উত্তম সঙ্গিনী হও, তাকে গাল-মন্দ করো না। তার প্রয়োজন অনুভব করে তা পূরণ কর"। এক বছরের মধ্যে এই বইটি তিন মিলিয়নের চেয়েও বেশী বিক্রি হয়েছে। তার নিকট স্বামীর উত্তম সঙ্গিনী হওয়াই হলো Total Woman.[৭]

গ্রেটা গার্বো নামক একজন নারী কোনো এক সময় হলিউডের একজন প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী ছিলো। কিন্তু বয়সের সাথে সাথে সে যখন তার আকর্ষণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেললো তখন সে চিত্র জগতে মূল্যহীন হয়ে পড়লো। চিত্র জগতের পুরাতন বন্ধুরা সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেল। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ সালে সে একা একা তার ৭৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করলো। তখন তার জীবনী রচনাকারী তাকে প্রশ্ন করে তার কাছে জানতে চেয়েছে যে, আপনার অবিবাহিত জীবন কেমন লাগছে? এজন্য কি আপনার কোনো আফসোস হয়? সে অত্যন্ত দুঃখ ভরা মন নিয়ে চাপা কণ্ঠে উত্তর দিল:

No getting married was a mistake[৮] অর্থাৎ বিয়ে না করাটা জীবনের একটি মারাত্মক ভুল ছিলো।

১৯৭৬ সালে The Lonely Lady নামে একটি উপন্যাস আমেরিকায় ছাপা হয়েছে। উক্ত নভেলের মধ্যে উন্নত বিশ্ব আমেরিকার একটি দুর্বলতাকে পরিস্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। নারীদের অবিবাহিত জীবন কিভাবে এক অসহনীয় যন্ত্রণার মধ্যে শেষ হয় তার চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে লিখেছে যে, একজন নারী চিত্র জগতে তার গ্রহণযোগ্যতা ও লোকচক্ষুর কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়ায় বিবাহিত জীবন ত্যাগ করে সে চিত্র জগতের নায়িকা হয়ে যায়। এ জগতে স্থান পাওয়ার জন্য তাকে সাহায্য করে তার আকর্ষণীয় শরীর। এটিই তাকে তাড়াতাড়ি উন্নতির উচ্চশিখরে পৌঁছে দেয়। এখানে সম্মান ও খ্যাতি, সম্পদ ও প্রেমিকদের ভীড়সহ আনন্দ উপভোগের সব কিছুই সে পেয়ে যায়। তবুও সে সত্যিকারের আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। খ্যাতি ও অর্থ উপার্জনের জন্য পুরুষদের সয্যাসঙ্গী হয়ে তাদের যৌন তৃষ্ণা মিটাতে গিয়ে নিজের সব হারিয়ে পরিশেষে সে একটি Better Truth এর সন্ধান পায়। নভেলের ভাষায় ঃ

That fame has a way of fading and friends' way of disappearing when they are most needed.[৯]

অর্থাৎ মানুষের খ্যাতি কোনো একদিন শেষ হয়ে যায়, বন্ধুরা একদিন ছেড়ে চলে যায়, যখন একজন নারীর সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন একজন পুরুষের। আর এই কারণেই আমেরিকার প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তার ডায়েরীর শেষ লাইনে লিখছে : I wish I had stayed home.[১০] অর্থাৎ আহ্ যদি আমি বাসায় থাকতাম।

এসব দেখে ও পত্র-পত্রিকায় তাদের দুঃখ কষ্টের কাহিনী পড়ে আমাদের বলতে হচ্ছে যে, খুবই আশ্চর্যজনক ও আনন্দদায়ক ছিলো তাদের এই জীবনযাত্রা। পরিশেষে শুধু পরাজয়ের মাধ্যমেই জীবন চলার এমন আলোর মিছিলের পরিসমাপ্তি ঘটলো।

অপরদিকে মুসলিম বিশ্বে অথবা মুসলিম সমাজের কোথাও দু'একটি ঘটনা ঘটলেই উন্নত বিশ্বে সমান অধিকারের নামে মুসলমানদেরকে মৌলবাদী ও তাদের সরকারকে মানবাধিকার লংঘনের দায়ে অভিযুক্ত করে নারী সম্পর্কীয় ইসলামী আইনকে তারা Degradation বা অধিকারভ্রষ্টতা বলে ব্যাখ্যা দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে যায়। সুযোগ হলেই তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বীজ রোপনের অপচেষ্টা চালায়। তারই অংশ হিসাবে আমরা দেখতে পাই ইংরেজ প্রাচ্যবিশারদ এডওয়ার্ড উইলিয়াম লেন (১৮০০-১৮৭০) পবিত্র কুরআনের নির্বাচিত কিছু অংশের অনুবাদ করেছেন। উক্ত অনুবাদটি ১৮৪৩ সালে লন্ডন হতে প্রকাশিত হয়েছে। এই অনুবাদটির শুরুতে অনুবাদকের একটি ভূমিকাও ছিল। উক্ত ভূমিকায় তিনি ইসলামের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে লিখেছেন যে, ইসলামের মারাত্মক দিকটি হলো নারীকে ঘৃণিত বা অবজ্ঞার পাত্র মনে করা। তার ভাষায় ঃ

The fatal point in Islam is the degradation of women.[১১]

এডওয়ার্ড উইলিয়াম লেন এর এই কথাটি ইসলাম বিরোধী আঙ্গিনায় খুবই গুরুত্ব বহন করলো। আর তাই প্রত্যেক ব্যক্তি তার এই কথাটিকে ইসলামের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসাবে দাঁড় করাতে লাগলো। দীর্ঘ দেড়শ' বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও সাধারণ মানুষের বিশ্বাসের কোনো পরিবর্তন হয়নি। ভারতের সাবেক বিচারপতি মি. চান্দ্রা চৌর ১৯৮৫ ইংরেজীতে কলিকাতার শাহবানু মামলার যে রায় দিয়েছিলেন সেই রায়ের মধ্যেও এডওয়ার্ড উইলিয়াম লেন-এর এই কথাটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিলো। যেন এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। যা উল্লেখ করে নাগরিকদেরকে সতর্ক করা আদালতের দায়িত্ব। নারীদের ব্যাপারে ইসলামের নীতিকে Degradation বা অমর্যাদাকর ও অধিকারভ্রষ্টতা বলে চালিয়ে দেয়ার অর্থই হলো সত্যকে বিকৃত করে পেশ করা। অথচ নারীদের ব্যাপারে ইসলামের নীতি হলো শুধু "নারী পুরুষ হতে ভিন্ন"। ইসলাম শুধু নারীকে পুরুষ হতে ভিন্ন বলে, কিন্তু নারীর তুলনায় পুরুষকে উত্তম বলে না Not better but different.

জন্মগতভাবে নারী-পুরুষের মধ্যে পার্থক্য হওয়ার কারণে ইসলামের বিধান নারী-পুরুষের জন্য পৃথক। তাই ইসলাম নারীকে পর্দা হিসাবে অতিরিক্ত কাপড় দ্বারা শরীর আবৃত করতে বলেছে। অন্যদিকে শিক্ষা নারী-পুরুষ সবার উপর ফরয বলে রাসূলুল্লাহ (সা.) ১৪৩৭ বছর পূর্বেই ঘোষণা করেছেন। কারণ ইসলাম মনে করে নারীদেরকে শিক্ষা থেকে দূরে রাখলে অজ্ঞতা ও মূর্খতা নিজেদের উত্তরসূরীদের মাঝে বিস্তার লাভ করবে। আর শিক্ষার নামে নারীদেহ হতে পর্দা কেড়ে নিলে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা পরবর্তী জেনারেশনের রক্তে মাংসে ছড়িয়ে পড়বে। অতএব এটি নারী অধিকারভ্রষ্টতার পরিচয় নয়, বরং নারীর বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্বের এক ঐতিহাসিক ঘোষণা ও আসমানী সনদ। তাই পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র এক হওয়াকে ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। উভয়ের জন্মগত পার্থক্য হওয়ার কারণেই ইসলাম তাদের কর্মক্ষেত্র পৃথক হওয়ার দাবী করে মাত্র। ইসলাম তাদের কোনো কর্ম ক্ষেত্র নেই যেমন বলেনি, ঠিক তেমনিভাবে তাদেরকে কর্মক্ষেত্রে যেতে নিষেধও করেনি। এই দাবী শুধু ইসলামেরই নয়, বরং সকল ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থেও একই বিধান রয়েছে। অতীতের হাজার বছরের ইতিহাসে কোনো ধর্মেই এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ করা হয় নি। আধুনিক যুগে নারী স্বাধীনতা আন্দোলন সর্বপ্রথম এই ধারণা সৃষ্টি করে যে, নারী পুরুষ সবাই সমান। অতএব সবার কর্মক্ষেত্র এক ও অভিন্ন তাই সবাইকে সমান অধিকার দিতে হবে, এমন শ্লোগান দিয়ে মূলত তারা নারীর স্বাধীনতা চায় নি। বরং এমন সুন্দর শ্লোগানের আড়ালে তারা নারী পর্যন্ত পৌঁছার স্বাধীনতা চেয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, অবুঝ নারী এসব দুশ্চরিত্রের ধান্দাবাজ, লম্পটদের দুরভিসন্ধি ও অসৎ অভিপ্রায় বুঝতে অক্ষম।

সমান অধিকারের আন্দোলন সর্বপ্রথম আঠারো শতাব্দীতে লন্ডনে শুরু হয়ে সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকায় এটি ছড়িয়ে পড়েছে। এসব ধান্দাবাজরা মিডিয়ার বদৌলতে প্রপাগান্ডা চালিয়ে সাধারণ মানুষের মনে সমান অধিকারের ধারণা সৃষ্টি করে নারীর পারিবারিক জীবনে নতুন এক দর্শন জন্ম দিয়েছে। তা হলো নারী তার স্বামী ও মা-বাবা-ভাই-বোনসহ নিজ সন্তানের জন্য আপন গৃহে রান্না-বান্নার কাজ করলে সে নারী একটি বন্দী ও লাঞ্ছিত জীবন পার করছে। ঠিক একই নারী যদি হোটেল-মোটেল ও রেস্টুরেন্টে অপরিচিত ব্যক্তির জন্য রান্নার কাজ করে এবং জাহাজ ও বিমানে ঈমান নষ্ট করে যাত্রীদের আপ্যায়নের কাজে নিযুক্ত হয় এবং দামী শো-রুমের সামনে দাঁড়িয়ে হাস্যোজ্জ্বল চাহনি দিয়ে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অফিস আদালতে পুরুষ অফিসারের প্রণয়লীলার ভান করতে পারলে তবেই সে নারী স্বাধীনতা ভোগ করছে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন।

পশ্চিমা জগতের Mary Wollstonecraf নামক একজন লেখক ১৭৯২ ইংরেজীতে নারী অধিকার নিয়ে A Vidication of the Rights of Women নামে একটি বই লিখেছেন।

যার সারমর্ম হলো ঃ

"Women should receive the same treatment as men in education, work opportunities and politics and that the same moral standards should be applied to both sexes" (১২)

অর্থাৎ শিক্ষা, চাকুরী ও রাজনীতিসহ সকল ময়দানে নারীদেরকে পুরুষের সমান অধিকার দেয়া উচিৎ। চরিত্রেরও একই মাপকাঠি হওয়া উচিৎ যা উভয়ের জন্য প্রযোজ্য হবে। এ কথাটি এমনভাবে প্রচার হলো যে, সমান অধিকারের বিরুদ্ধে কোনো কথা বললেই তখন সেকেলে মনে করতো। বিংশ শতাব্দীর পূর্বেই তাদের এই চিন্তাধারা বিদ্যুত গতিতে সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো। সে অনুযায়ী আইন প্রণয়ন হলো। আর সে আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে সকল ময়দান নারীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হলো। কিন্তু বাস্তবতার ময়দানে তাদের এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিফলে গেল। সমান অধিকারের নামে যতোটা আরামদায়ক ও আনন্দঘন জীবন যাপনের স্বপ্ন তারা দেখছিলো বাস্তবে তার বিপরীত হলো। নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐতিহাসিক পরাজয়ের সামনে মুসলিম বিশ্বে ও মুসলিম সমাজে সংঘটিত কোনো ঘটনার তুলনাই হয় না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, যদি বিশ্বের কোথাও কোনো মুসলিম সমাজে দু' একটি "ত্বালাক্ব" সংঘটিত হয়, তখন সারা বিশ্ব মানবাধিকার লংঘনের দোহাই দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে বর্তমান বিশ্বে তারাই এমন কিছু সমস্যার জন্ম দিয়ে চলছে যে, তাদের ফর্মূলা অনুযায়ী সমান অধিকার আদায় করতে গিয়ে আজ উন্নত বিশ্বে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল ধরছে এবং স্বামী-স্ত্রী পৃথক পৃথক জীবন যাপন করছে। যারা আজ নিজেদেরকে সভ্য জাতি ও উন্নত বিশ্বের লোক বলে দাবী করছে তাদের দেশেই এর প্রবণতা সবচেয়ে বেশী। এ সম্পর্কে Encyclopedia Britannica লিখেছে ঃ "Divorce increasingly acceptatle in the industrialized parts of the world" (১৩)

অর্থাৎ বিশ্বের শিল্প এলাকাগুলোতে "ত্বালাক্ব" ক্রমবর্ধমানভাবে গ্রহণ যোগ্য হয়ে উঠেছে। অতএব, উপরোক্ত মন্তব্যে ফুটে উঠেছে যে, ইসলামের বিধান "ত্বালাক্ব" জাহেলী যুগের কোনো প্রথা বা মানবাধিকার লংঘন নয়, বরং উন্নত বিশ্বের এটি একটি সামাজিক চাহিদা। তাই ইসলামী বিধানের যতই বিরোধীতা করা হউক না কেন এবং গালমন্দ দেয়া হউক না কেন এটি একটি তিক্ত সত্য যে, উন্নত বিশ্ব আজ ত্বালাক্বের সেই ইসলামী বিধান ছাড়া সম্পূর্ণ অচল বলে প্রমাণিত হলো। উন্নত বিশ্ব আজ প্রমাণ করছে ইসলামী বিধান বর্তমান সময়ের সাথে সংগতিপূর্ণ। কারণ এই মতবাদ কোনো মানুষের গড়া মতবাদ নয়, বরং এটি আল্লাহর দেয়া একটি পরিপূর্ণ ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক বিধান ও পরিপূর্ণ একটি সমাজ ব্যবস্থা। তাই এই বিধানকে একদিন উপরতলা ও নীচতলা, আমতলা ও জামতলার সকল মানুষের মানতেই হবে। তবে যারা আজ এটির বিরোধীতা করছে তারা এটি কখন মানবে ? আমরা এমন প্রশ্নের উত্তরে আল্লামা ইক্বালের ভাষায়

বলতে পারি : জব দিয়া রন্‌জ ভুতুনেঁ তো খোদা ইয়াদ আয়া।

অর্থাৎ মূর্তি পুজায় নিরাশ হয়ে এক আল্লাহর কথাই স্মরণে আসে। আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে এধরণের লোকদের ব্যাপারে এভাবে বলেছেন ঃ

﴿ وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور﴾

"আর যখন (সমুদ্রে) একটি তরঙ্গ তাদেরকে ছেয়ে ফেলে ছাউনির মতো তখন তারা আল্লাহকে ডাকে নিজেদের আনুগত্যকে একদম তাঁর জন্য একান্ত করে নিয়ে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে স্থলদেশে পৌঁছিয়ে দেন তখন তাদের কেউ কেউ মাঝপথ বেছে নেয়, আর প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ ছাড়া আর কেউ আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে না"[১৪]। উপরোক্ত আয়াতে বুঝা গেলো না মানলে আল্ কোরআনের আলোকে আমরা হবো বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ। অতএব, আমরা বুঝতে পারলাম যে, সময় ফুরিয়ে যাওয়ার পর মানলে কোনো কাজে আসবে না।

অন্যদিকে বহুপত্নী গ্রহণের ব্যাপারেও উন্নত বিশ্ব আজ সম্পূর্ণ চৌকিদারের ভূমিকা পালন করছে। ইসলাম সামাজিক জীবন ও সামাজিকতার কারণে একজন পুরুষকে কিছু শর্তের মাধ্যমে একাধিক পত্নী গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে। এই কারণে আজ পশ্চিমা জগত ও ইসলাম বিরোধী শক্তি ইসলামকে মানবাধিকার লংঘনের দায়ে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। অন্যদিকে তারা নারী অপহরণ ও নারী ধর্ষণসহ পতিতালয়ে নারী বেচা-কেনার রাস্তা উন্মুক্ত করার পরও আজ বিচারকের আসনে অধিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য জগত ইসলামের বহুপত্নী প্রথার বিরোধীতা করলেও তারাই আজ বহুপত্নী গ্রহণ করছে সবচেয়ে বেশী। নারী যখন তার যৌবনের রূপ ও লাবণ্য হারিয়ে ফেলে তখন তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্য আরেকটি নারীকে ভোগের সামগ্রী ও যৌনক্ষুধা মিটানোর বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছে। তবুও তাদের দেশে মানবাধিকার লংঘন হয় না! কারণ কথায় বলে, শক্তিধর মাটি খেলেও দুর্বলরা মনে করে সে মিস্‌রী খাচ্ছে, আর দুর্বল মিস্‌রী খেলেও অন্যরা সবাই বলে সে মাটি খাচ্ছে।

একজন নারীর এর চেয়ে আর কি অপমান হতে পারে? একজন নারী কিছুদিন একজন পুরুষের ভোগের সামগ্রী হিসাবে ব্যবহৃত হবে, যৌবন রূপ ও দেহদান করে পুরুষের যৌন তৃষ্ণা মিটানোর পর যখন সে আকর্ষণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে তখন তাকে একটি শুকনো ফুলের ন্যায় ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করা হবে? এরই অর্থ নারী স্বাধীনতা? এটিই নারী জীবনের আনন্দ ও সকল চাওয়া পাওয়া? এরই নাম মানবাধিকার? এরই নাম নারী উন্নয়ন ও অগ্রগতি? ছি! ছি! ছি! একারণেই উন্নত বিশ্বে আজ লক্ষ লক্ষ সন্তান মাতা-পিতার পরিচয় হতে বঞ্চিত। তাদের সমাজে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার একমাত্র কারণই হলো এসব অবৈধ ও বেওয়ারিশ সন্তান।

মোটকথা বহুপত্নী প্রথার অভাবেই আজ উন্নত বিশ্বে যেনা, ব্যভিচার, অপহরণ ও ধর্ষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও অপ্রাপ্ত বয়স্ক স্কুলের ছেলে-মেয়েদের মধ্যেও আজ অবাধ মেলামেশার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই আজ উন্নত বিশ্বের মনীষীরাও হতভম্ব হয়ে বহুপত্নী প্রথা প্রচলনের দাবী তুলছে এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণের সকল উপায় উপকরণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার দাবী তুলছে। কারণ এগুলো ধর্ম ও সমাজ বিরোধী। অতএব তারা এখন বুঝতে পারছে যে, ধর্মীয় বিধি-বিধানের বিরোধীতা করে উন্নত কোনো সমাজ ও জাতি গঠন কখনো সম্ভব নয়। তাই আজ উন্নত বিশ্বেও প্রমাণিত হচ্ছে ইসলামী বিধান সহজ, সংযত ও যুগোপযোগী। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি দেশের সরকার তাদের দেশের পুরুষ নাগরিকদেরকে দু'টি বিয়ে করার হুকুম দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে অমুসলিমদের ধর্মীয় আইন তৈরী হয় তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ ও শাস্ত্র অনুযায়ী। তাই আজ তাদের নিজেদের গড়া আইন অত্যন্ত কঠোর হয়ে যাওয়ায় তাদের ধর্মীয় গ্রন্থে পরিবর্তন করে সহজ ও সরল পথের সন্ধান করা হচ্ছে। কিন্তু ইসলামী আইন জন্মলগ্ন হতেই সরল ও সহজ। একারণেই ইসলামী আইনের পরিবর্তন করা যেমন নিষ্প্রয়োজন, ঠিক তেমনি ভাবে পরিবর্তনের দাবী করাও হাস্যকর। আল্ কুরআন এ সম্পর্কে ঘোষণা দিচ্ছে ঃ ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾

"আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না"[১৫]। আল্লাহ তা'য়ালা অন্যত্র আরো বলেছেন ঃ ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾

"এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেন নি"[১৬]। সূরা আন্ নাহল এ আরো পরিস্কার করে এভাবে বলা হয়েছে ঃ ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي﴾

"আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন" [১৭]।

আর একারণেই ইসলামকে Natural Religion বা স্বাভাবিক ও স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম বলা হয়। ইসলামের বিধান যেহেতু প্রাকৃতিক বিধান তাই যুগোপযোগী এবং সর্বস্তরের জনগণের জন্য গ্রহণযোগ্য হওয়াই প্রত্যাশিত। তাই ইসলামের মধ্যে কঠিন বা অতিরঞ্জিত বলে কিছুই নেই। অতএব ইসলাম প্রকৃত ও সহজ-সরল বিধানের সমন্বয়ে গঠিত একটি সঠিক ধর্ম হওয়ার কারণে ইসলামকে দ্বীনে রাহমাতও বলা হয়। শুধু তাই নয়, ইসলামের বিধান সঠিক ও সরল হওয়ার সাথে সাথে যথাযথ যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞান সম্মত। ইসলামী সমাজ গঠনে শুধু মুসলমানরাই উপকৃত হবে না, বরং সমগ্র বিশ্বই লাভবান হবে বলে আজ সমগ্র বিশ্ব ইচ্ছাকৃত আবার কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবে ইসলামের নীতিমালার প্রতি দূর্বল হয়ে নিজেরাই ইসলামের বৈশিষ্টগুলোর নিত্য-নতুন নাম দিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠানের নামে আবার কখনো জাতি সংঘের সনদ নাম দিয়ে আবার কখনো মানবাধিকারের ঘোষণা বলে চালিয়ে দিচ্ছে। আর অথর্ব মুসলিম এসব শ্লোগান শুনে লাফিয়ে

উঠে বলে উঠছে পশ্চিমা সভ্যতা জীবন গঠনের কত সুন্দর ফর্মূলা বের করেছে। সে জানেই না যে, তার রাসূল (সা.) ১৪৩৭ বছর পূর্বে এসব ঘোষণা করে গেছেন।

অত্যন্ত দুঃখের সাথে আমরা লক্ষ্য করছি, ইসলামের এই বিজয় দেখে আমাদের সমাজের কিছু পেঁচা মন খারাপ করছে। আধুনিক বিশ্বে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হওয়ার সম্ভাবনা দেখে তাদের চেহারায় বিষণ্নতার কালো মেঘ ছড়িয়ে পড়ছে। তাই তারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে সূর্যোদয়ের পূর্বে যেমন পেঁচারা বক বক করতে করতে তাদের গোপন আস্তানায় আশ্রয় নেয়, তারাও তেমন আশ্রয় নেয়ার পূর্বে মুসলমানদেরকে কখনো মৌলবাদী আবার কখনো Fundametalist কখনো Terrorist আবার কখনো সন্ত্রাসী, কখনো কট্টরপন্থী ও জঙ্গিবাদী, হরকত ও করকত এবং সর্বশেষ আবিষ্কৃত আইএস খেতাব দিয়ে তাদের মনের ঝাল মিটাচ্ছে। একজন মুসলমানের মধ্যে যখনই তারা ইসলামী মনোভাব অনুভব করে, যা হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ এটি তার ঈমানের দাবী, তখনই তারা বলে উঠে Then you are a terrorist.

বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে আমরা দেখতে পাই, ক্ষমতার মসনদে টিকে থাকার জন্য সারা বিশ্বের মুসলিম নামধারী সরকার ও তার হাওয়ারিয়্যীন ও হাওয়াশিয়্যীন, অনুচর ও সহচর নিয়ে ইসলামের দুশমনদের সাথে হাত মিলিয়ে ইসলাম পন্থীদেরকে মৌলবাদী বলে গালি দেয়াকে নিজেদের Routine Work বানিয়ে নিয়েছে। মিথ্যা ও কাল্পনিক অভিযোগ উত্থাপন করে এবং শারী'য়াতে ইসলামিয়াকে উন্নতি ও অগ্রগতিসহ নারী স্বাধীনতার পথে বিরাট বাধা বলে হাটে-ঘাটে, মাঠে-ময়দানে, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার বদৌলতে রা'য়াদ ও বারকু, তর্জন ও গর্জন করে বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে তাদেরকে বিশ্বের চিহ্নিত সন্ত্রাসী বলে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছে।

কারণ তারা তাদের পশ্চিমা মুরুব্বীদের কাছ থেকে শিখেছে এবং তাদেরকে বলতে শুনেছে যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে মুজাহিদ আর আমেরিকার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরলে সন্ত্রাসী। কলেজে পড়লে স্টুডেন্ট আর মাদরাসায় পড়লে সন্ত্রাসী। ক্লিনসেভ করলে মডার্ন মুসলিম আর দাড়ি রাখলে সন্ত্রাসী। ইংলিশ কাটিং চুল রাখলে ফ্যাশন আর সুন্নাহ মোতাবেক চুল রাখলে সন্ত্রাসী। স্কুলে হামলায় মারা গেলে শহীদ আর মাদরাসায় বোমা মেরে হত্যা করলে সন্ত্রাসী। রাষ্ট্রের উন্নয়নের কথা বললে গঠনমূলক চিন্তা চেতনা আর ইসলামের উন্নয়নের কথা বললে সন্ত্রাসী। পৃথিবীর সকল সুপার পাওয়ার এক হয়ে বোমা মেরে মুসলমান মারলে শান্তি প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ আর মুসলমান নিজের অধিকার আদায়ের জন্য অস্ত্র হাতে নিলে সন্ত্রাসী। অর্থাৎ Muslim with a gun - Terrorist, Tribal / Dalit with a gun Naxalist, Viraat Hindu with a gun Nationalist. এসব দেখে আমরা শুধু তাদেরকে বলছি, বল বল, আরো বল যা খুশী তাই বল। কতদিন আর সত্যকে মিথ্যার চাদরে ঢেকে রাখবে? খুব তাড়াতাড়ি এমন এক আদালত প্রতিষ্ঠা হবে যেখানে প্রমাণিত হবে কারা সন্ত্রাসী আর কারা শান্তি প্রিয়।

তারা এমন এক মুহূর্তে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে এমন হাস্যকর প্রপাগান্ডা শুরু করেছে, যখন ভারতসহ উন্নত বিশ্বের বহু রাষ্ট্র তাদের দেশে প্রচলিত Family Law কে যুগোপযোগী করার জন্য Islamic Law এর সাহায্যে তাদের ধর্মীয় আইনের সংশোধন করছে। তখন ইসলামকে Fundamentalism এবং Terrorism বলা হাস্যকর ও তাদের জ্ঞানশূণ্যতা ছাড়া আর কি হতে পারে ? এখানে তারা মানব রচিত মতবাদের নিশ্চিত পরাজয় জেনে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়ার ভয়ে তাদের ধর্মীয় আইনের পরিবর্তনের সাথে সাথে Uniform Civil Code প্রণয়নের দাবী তুলে Muslim Personal Law পরিবর্তনের রাস্তা বের করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছে। তারা খুব ভালভাবেই জানে যে, Muslim Personal Law বাদ দিয়ে Uniform Civil Code প্রবর্তনের সাথে সাথে ইসলাম তার শ্রেষ্ঠত্ব হারিয়ে ফেলবে। আর এই কারণেই ভারতে আজ Uniform Civil Code প্রবর্তনের পাঁয়তারা চলছে। অথচ এটি একটি নিষ্ফল প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ এই দ্বীন পৃথিবীর হাজার ধর্মের মাঝে আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দ্বীন। তাই এটির হেফাযতের দায়িত্বও তাঁর। অতএব পর্দার আড়ালে স্কাইপি ব্যবহার করে অথবা প্রকাশ্যে ট্রাইবুন্যালের মাধ্যমে বাবার চেতনা বা মামাদের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে এ আলো নিভিয়ে দেয়ার যত চেষ্টাই করা হউক না কেন এ আলো কখনো নিভানো যাবে না। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে আসমানী ঘোষণা রয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা এসব ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আগেই বলে দিয়েছেন ঃ

﴿يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون﴾

"এরা তাদের মুখের ফুঁ দিয়ে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহর ফায়সালা হলো তিনি তার নূরকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন। কাফেররা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন" (১৮)। তাই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আল্লাহ তার বান্দার প্রচেষ্টা চান, কামিয়াবী নয়। কারণ জয়-পরাজয় সবই তাঁর হাতে। যেহেতু ইসলাম মানব জাতির জন্য রহমাত অতএব এর হিফাযাতের দায়িত্বও রহমানের। আর তাই উন্নত বিশ্ব আজ ইসলামী আইনকে তাদের জন্যও উপযুক্ত মনে করছে।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র যতোই হউক না কেন, বর্তমান উন্নত বিশ্ব ইসলামের দিকে ধাবিত হওয়াই প্রমাণ করে যে, ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান অনস্বীকার্য আর তাই ইসলাম সর্বযুগ ও সর্বকালের জন্য রহমাত।

তথ্যসূত্র ঃ

১. সূরা আলে ইমরান, আয়াতঃ ১৯।

২. সূরা আল মায়েদা, আয়াতঃ ০৩।

৩. সূরা আলে ইমরান, আয়াতঃ ৫৮।

৪. Encyclopedia Britannica, Vol. 4, P. 1003.

৫. Mr. Dyer Courtship Marriage and Family, P. 232.

৬. Times of India 8th Feb. 1978.

৭. Add.

৮. Hindustan Times, 21st Sep. 1980.

৯. Harold Robbins : the Lonely Lady, P. 445, New English Libray. London 1976.

১০. Times of India, 8th Nov. 1081.

১১. Edwara William Lane. Selections From Qur'an. London 1982. P. XC (Introduction).

১২. A Vindication of the rits of Women, X733.

১৩. Encyclopedia Britannica, Vol. 3, P.586.

১৪. সূরা লোকমান, আয়াতঃ ৩২।

১৫. সূরা আল হাজ্ব, আয়াতঃ ৭৮

১৬. সূরা আল বাক্বারা, আয়াতঃ ১৫৮।

১৭. সূরা আল হাজ্ব, আয়াতঃ ৭৮।

১৮. সূরা আন নাহ্‌ল, আয়াতঃ ৯০।

মাওলানা মাওদূদীর চিন্তাধারা

ড. ইউসুফ আলকারাদাওয়ী
অনুবাদঃ ড. সালাম আজাদী*

'মাঅ' আইম্মাতিত তাজদীদ ও রুওয়াহুম' তথা 'ইসলামি নবজাগৃতির ইমাম ও তাদের চিন্তাধারার সাথে' গ্রন্থে আল্লামা ডঃ ইউসুফ কারাদাওয়ী ইসলামি আন্দোলনের কয়েকজন ইমামের চিন্তাধারার সাথে আমাদের পরিচয় করিয়েছেন। এই বই থেকে মাওলানা মাওদূদীর প্রসঙ্গটা আলাদা করে একটা পুস্তিকা ইদানিং বের হয়েছে। এই বই এ মাওলানা মাওদূদীকে তিনি 'ইমাম' বলে সম্বোধন করেছেন। আমি এই রচনায় বইটার সার সংক্ষেপ তুলে ধরছিঃ

মাওলানা মাওদূদীর যুগে ভারতে চিন্তার যেসব দৈন্যতা ছিলো তা হলোঃ

১। **গোঁড়া তাকুলীদঃ** এই চিন্তা ছিলো খুব ব্যাপক। মনে করা হতো আগের যুগের ইমামগণ কোন কিছুই আমাদের জন্য ছেড়ে যাননি। এদের মতে ইজতিহাদের সব দরজা এখন বন্ধ। কাজেই একটা মাযহাবের তাকুলীদ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর কোন মাযহাবের বাইরে যাওয়া মানে হলো খোদ ইসলাম থেকে বের হওয়া। এই চিন্তার ধারক বাহকেরা পুরানো চিন্তার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছিলো। এরা পুরাতন ইলম কালামের প্যাঁচের মধ্যে এমন ভাবেই আবর্তিত হচ্ছিলো যেন অদেখা কিছু শত্রুর সাথে তারা বিরামহীন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন।

এমন কি ফিকুহের যে সব বিষয় আলোচনা এখন শেষ হয়ে গেছে, তা নিয়েও তাদের ব্যস্ত দেখা যায়। আসল ব্যাপার হলো, এদের কাজ ছিলো নতুন কিছু এলেই তার বিরোধিতা করা কিংবা দ্বীনের তাজদীদের কোন কাজ দেখলেই তা অমান্য করা।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলাওয়ী এই চিন্তার মর্মমূলে আঘাত করে কাঁপিয়ে দেন, এবং ইসলামি চিন্তার নতুন দ্বার উন্মোচন করেন, তার পরেও ভারতীয় আলিমগণের বড় অংশ সেই প্রাচীনতার যুপকাষ্ঠে তড়পাতে ছিলো

২। **অলিক কল্পনাঃ** ভারতীয় উপমহাদেশে এই সময় অলিক কল্পনা বিলাসী বেশ কিছু আলিম উলামাগণের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, যারা ইসলামী তাসাউফের অনুসারী ছিলো না, অথচ নিজেদেরকে তাসাউফ পন্থী বলে জাহির করতো। এরা জীবন জগত থেকে ছিলো খুবই পেছনে। এদের চিন্তার জগতে ছিলো গ্রীকদের যুক্তিবাদিতা ও তাদের দর্শন, তারা মিলিয়ে ফেলতো বেদান্ত মতবাদ, মনু ও যুরাথুষ্ঠীয় দর্শনের সাথে সঠিক ইসলামের ধ্যান ধারণা।

৩। **পাশ্চাত্যের পদলেহনঃ** এখানে অনেক আলিম উলামাদের মাঝে পাশ্চাত্যের প্রতি অন্ধ ভালোবাসাও দেখা যায় এই সময়। এরা পাশ্চাত্যের উন্নয়নকে শুধু রোল মডেল মনে করতো না, এরা পাশ্চাত্যের দর্শনকেও মনে করলো ইসলামের অল্টার্নেটিভ।

৪। **পরাজিত মানসিকতাঃ** কিছু আলিম উলামার উদ্ভবও এই ভারতে দেখতে পাই যারা মনের দিক দিয়ে ছিলো এপলোজেটিক। তারা ইসলামে কোন জটিল বিষয় দেখলেই সেগুলো অস্বীকার করে ফেলতো বা তার এমন জবাব তৈরি করতে থাকতো যাতে বুঝা যেতো ইসলাম এই বিষয়টা অবতারণা করে ভুল করেছে।

দাস প্রথা, জিহাদ, বহু বিবাহ, বিয়ে, তালাক, হিজাব ইত্যাদি বিষয়ে তাদের মতামত গুলো দেখলেই বুঝা যাবে কত পরাজিত মানসিকতার তারা ছিলো।

৫। **হাদিস অস্বীকারঃ** এই সময়ে ভারতে হাদিস অস্বীকার করার মত মানুষও দেখা গেলো। যারা মনে করতো ইসলাম মানতে এখন কুরআনই যথেষ্ঠ, হাদিসের প্রয়োজন নেই।

৬। **কাদিয়ানিদের উত্থানঃ** গোলাম আহমাদ কাদিয়ানির মাধ্যমে ভারতে শুরু হয় আরেক ফিতনাহ, যার মাধ্যমে ইসলামের নবুওয়াত-রিসালাত এর মর্মমূলে আঘাতের ষড়যন্ত্র শুরু হয়।

মাওলানা মাওদূদীর ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাধারার বিকাশঃ

এই মারাত্মক সংকটে ভারতে যে সব আলিম উলামার লেখনী ও বক্তব্য মুসলমানদের মন মগজে সঠিক ইসলামের আক্বীদা বিশ্বাস কে প্রতিস্থাপনের কাজ করেছেন, মাওলানা মাওদূদী তাদের অন্যতম। তার চিন্তা দর্শনকে নিচের কয়েকটা পয়েন্টে আলোচনা করা হলোঃ

১। ইসলামকে পরিপূর্ণ ভাবে মেনে চলাঃ

মাওদূদী যে ইসলামে বিশ্বাস করতেন তা ছিলো ঐসব মাযহাবপন্থী আলিমগণের চিন্তা ভাবনার বাইরে। ওরা মনে করতো একটা মাযহাবের বাইরে যাওয়া যাবেনা, এখন ইজতিহাদের কোন সুযোগ নেই, ওরা মনে করতো আগেকার কয়েকটা ফিকহ বইয়ের বাইরে যা আলোচনা আসবে তা বাতিল।

মাওলানা মাওদূদীর চিন্তা দর্শন ঐসব আলিমদেরও ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিলো যারা কোন মাযহাব মানে না বটে, কিন্তু কুরআন হাদিসের মূল কথা গুলো আক্ষরিক অর্থে গ্রহন করে থাকে। মাক্বাসিদে শারিয়ায় তাদের কোন দখল ছিলো না, ইসলামের মূল স্পিরিট সম্পর্কে

* লেখক বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও স্কলার, ইংল্যান্ড প্রবাসী।

তাদের গভীর জ্ঞান ছিলো না, যারা নতুন জাহেরি মতবাদ নিয়ে দাপটে বেড়াচ্ছে।

তিনি যে ইসলাম বুঝেছিলেন তা, ঐসব তাসাউফপন্থীদের নাগালের বাইরে ছিল, যারা দ্বীন মানার নাম করে এর আক্বীদাহ বিশ্বাসকে নষ্ট করে ফেলেছে, যারা ইবাদাতের প্রতিটা ক্ষেত্রে বিদ'আতের স্বর্গরাজ্য বানায়ে ফেলেছে, পীর মুরিদির নামে তারা দ্বীনকে গোসলকারীর সামনে মৃতদেহের মত বানিয়ে নিয়েছে।

যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার ভক্ত হয়ে গেলেন, কিংবা পাশ্চাত্য দর্শনের গোলাম হয়ে গেলেন, মক্কা থেকে ঘুরে ইউরোপকে যারা কিবলা বানালেন, তিনি গেলেন তাদের বাইরে।

তিনি যে ইসলামের দিকে মানুষকে ডেকেছেন তা হলো খাঁটি ইসলাম। ইসলামের নামে যেসব মতবাদ গুলিয়ে ফেলা হচ্ছিলো তার বিপরীতে তিনি দাঁড়ালেন, তিনি বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, ইসলাম ই ইসলাম। এর সাথে সমাজতন্ত্র, ডেমোক্রেসি কিংবা জাতীয়তাবাদের কোন সম্পর্ক নেই।

তিনি ইসলাম বলতে বুঝিয়েছেন, এটা শুধু আক্বীদাহ বিশ্বাসের কিছু বিষয় নয়, বরং এটা ব্যাপক। আক্বীদাহ বিশ্বাস এর মূল প্রতিপাদ্য, কিন্তু তার প্রতিফলন আসতে হবে রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। এখানে শুধু কতিপয় ইবাদাত মেনে চলার জন্য ইসলাম আসেনি, দ্বীনের প্রতিটি বিষয়ই হচ্ছে ইবাদাহ। এক্ষেত্রে তিনি ইমাম ইবনে তাইমিয়্যার চিন্তাকেই বিকশিত করেছেন।

তিনি যে ইসলাম বুঝেছেন তা কমপ্লিট কোড অফ লাইফ। এখানে চারিত্রিক সৌন্দর্যকে যেমন উপজীব্য করা হয়েছে, তেমনি এটাতে একাধারে রয়েছে ইবাদাতী যিন্দেগী, চারিত্রিক বৈশিষ্ট, সামাজিক বিধি-বিধান, অর্থনৈতিক নীতিমালা এমনকি রাজনৈতিক কর্মসূচি। কোন একটাও বাদ দেয়ার সুযোগ এখানে নেই।

২। আধুনিকতা ও যুগোপযোগিতাঃ

মাওদূদীর চিন্তাধারার আরেক বৈশিষ্ট হলো তিনি এক চোখে যেমন ইসলামকে দেখেছেন, অন্য চোখে তেমন বর্তমান যুগকেও রেখেছেন। তিনি বর্তমানকে ছেড়ে অতীত নিয়ে থেকেন নি, বরং আধুনিক মনস্কের সাথে কথা বলেন তাদেরই ভাষায়, আধুনিক দর্শনের ভাষায় তিনি যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। এই কাজ করতে যেয়ে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাকে চষে বেড়াতে যেমন হয়েছে, তেমনি আধুনিক বিভিন্ন চিন্তা দর্শনের সাথে তাকে পরিচিত হতে হয়েছে। আর এটাই হলো একজন সফল দায়ী ইলাল্লাহর গুণ। আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ আমি প্রতিটি নবীকে তার নিজ জাতির ভাষা দিয়ে পাঠিয়েছি, যাতে করে অহীর কথা গুলো জাতির কাছে পরিস্কার করে দিতে পারেন। (ইব্রাহীমঃ ৪)

এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে 'নীতিমালা' ও 'দর্শন' প্রণয়নের মত প্রতিভা দিয়েছিলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ের ছড়ানো মুক্তো মাণিকগুলো এক সুতোয় গেঁথে ছোট ছোট বিষয় গুলোকে বৃহত্তর নীতিমালায় একত্রিত করেছেন। নানা প্রশাখা গুলোকে মূলধারায় নিয়ে এসেছেন। এ থেকেই তৈরি হতে পেরেছে ইসলামি দর্শনের। চিন্তা ও জ্ঞানের জগতে এ ধরণের প্রতিভা খুবই বিরল। তিনি ছিলেন সেই বিরল প্রতিভার অধিকারী। মাওদূদীর লেখা বই গুলো পড়লে যে বিষয়টা সহজে চোখে ধরে তাহলোঃ তিনি আসলে তার যুগেই বাস করেছেন; এই যুগের সমস্যাগুলো তিনি পরিস্কার ভাবে বুঝতে পেরেছেন; তার সমাজে যেসব স্রোতধারা চলেছে তার সম্পর্কে যথেষ্ঠ অভিজ্ঞতা তার ছিলো। যেসব প্রভাবশালী নতুন দর্শন ও সভ্যতা আধুনিক বিশ্বকে নাড়িয়ে দিয়েছে, কিংবা জ্ঞান-বিজ্ঞানের যেসব অবদান আজ বর্তমান জেনারেশানকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে তা গভীর ভাবে অধ্যায়ন করেছেন। তিনি এই সব চাকচিক্যময় সভ্যতার অন্ধকার অলি গলি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখতেন। ফলে তিনি তার দূর্বলতা গুলো আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। তিনি বর্তমান সভ্যতার মূল উৎসগুলো গভীর ভাবে গবেষণা করে দেখেছেন। যে সব দার্শনিক ভিত্তিমূলে বর্তমান সভ্যতা দাঁড়িয়েছে তা ছিলো তার নখ-দর্পণে। তিনি এর বৈশিষ্ট্যগুলো জানতেন, এর রোগগুলো ও তার ব্যাপ্তি বুঝতেন; ফলে এর বহিরাবরণ দেখে তিনি প্রতারিত হননি, রূপ দেখে ভড়কে যাননি, বাইরের সৌন্দর্য দেখে বিমোহিত হয়ে ভেতরের অন্ধকার সম্পর্কে চোখ বন্ধ রাখেননি।

৩। চ্যালেঞ্জ গ্রহন করাঃ

ইসলামের যে সব স্কলার ইসলামের উপর আরোপিত প্রশ্নের সামনে কিছুটা 'অনুনয়ের' সুর তোলেন, কিংবা পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারী লিবারেল ও সমাজতান্ত্রিকদের অপ্রতিরোধ্য অপপ্রচারে কাতর হয়ে "ইসলামে কিছু দূর্বলতা আছে" ভেবে যারা আত্মরক্ষা মূলক অবস্থান নিয়ে 'আইনজীবি'র ভূমিকা পালন করেন, মাওদূদী সে পথে চলেন নি। সত্যিই, মাওদূদী কখনো পাশ্চাত্য সভ্যতার সামনে কিংবা তাদের দর্শনের মুকাবিলায়, অথবা ঐ সব বাতিলের সয়লাবে নিজে আত্মরক্ষা মূলক পদক্ষেপ নেন নি, আইনজীবির ভূমিকা গ্রহন করেন নি। বরং তিনি ছিলেন ওদের চ্যালেঞ্জ গ্রহনকারী, এবং ছুড়েও দিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক চ্যালেঞ্জ। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার ঐসব বড় বড় মূর্তি সমূহের সামনে অন্যদের মত হাঁটু গেড়ে বসে যান নি। এই সভ্যতার সামনে অন্যদের মত মাথা নত করে সেজদায় লুটেন নি।

বরং তিনি ইসলামপন্থী হওয়ায় গর্ব বোধ করেছেন, ইসলামের সার্বজনীন মেসেজের প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখতেন। তিনি মনে করতেন, আমাদের বুঝার দূর্বলতা থাকতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে চলার জন্য যা দিয়েছেন তার ধারে কাছেও কোন মনুষ্য রচিত জীবন বিধান যেতে পারে না। "সৃষ্টি যিনি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনিই সর্বোজ্ঞ এবং পারদর্শি... (আল মুলকঃ ১৪)

তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার সমস্যা ও দূর্বলতা সম্পর্কে ব্যাপক জানতেন। জানতেন ইসলামের সাথে কোথায় কোথায় তা সাংঘর্ষিক। এজন্যই তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে পাশ্চাত্য সভ্যতার মর্মমূলে আঘাত হানা, সম্ভব হয়েছে এর দোষ ও ত্রুটিগুলো অত্যন্ত সাবলিল ও সমালোচনার ভাষায় তুলে ধরা। এ জন্য যারা এই কাজে ব্রতী ছিলেন তিনি তাদের মধ্যে বেশী শক্তিশালী। এতে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিপরীতে ইসলামের প্রতি আস্থা বৃদ্ধিতে দারুণ সহায়ক হয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি আসলেই পথিকৃত হয়ে রইবেন।

তিনি 'পর্দা ও ইসলাম' বই লিখে পাশ্চাত্যের সামাজিক জীবনধারার কঠোর সমালোচনা করেন, এবং তার বিপরীতে পবিত্রতা অর্জন ও নারী এবং পরিবার সম্পর্কে ইসলামি দর্শনের ব্যাখ্যা করেন। এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন ইসলাম এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের জীবন দর্শনের চেয়ে কত ব্যাপক ও গভীরতর হতে পারে।

তিনি 'সুদ' বই টি লিখে পাশ্চাত্য সভ্যতার অর্থনৈতিক দর্শনের অসারতা প্রমান করেছেন। তিনি এই সভ্যতার মূল দর্শন পুঁজিবাদি অর্থব্যবস্থার দূর্বলতা তুলে ধরে সুদের বিরুদ্ধে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সা.) যুদ্ধ ঘোষণার কারণ গুলো ব্যাখ্যা করেছেন।

তিনি 'ইসলামিক ব্যাঙ্কিং' এর উপর বই লিখে পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক দর্শনের সমালোচনা করেছেন এবং ইসলামি ব্যাঙ্কিং এর নীতিমালা ব্যাখ্যা করেছেন। যার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে আজকের ইসলামি ব্যাংকের সফল প্রতিষ্ঠান।

এখানে চ্যালেঞ্জ ও চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় মাওদূদীর কিছু ত্রুটি হয়ত হয়ে গেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিপরীতে ইসলামি আইডেন্টেটি রক্ষায়, ইসলামি সভ্যতার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে এবং ইসলামি দৃষ্টিকোণের ব্যাখ্যায় তিনি কিছুটা কঠোরতা দেখিয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি অন্যদের মত কোন দূর্বলতা বা কম্প্রোমাইজের আশ্রয় নেয়া ভালো মনে করেন নি। আমরা দেখতে পেয়েছি ইসলামে পর্দার ব্যাখ্যা করতে যেয়ে তিনি নিকাব (মুখ ঢাকা) ওয়াজিব মনে করেছেন, এমনকি চাচা ও মামার সামনেও মুখ ঢাকা ফরজ মনে করেছেন।

ইসলামি অর্থনীতির আলোচনা করতে যেয়ে অন্যান্য স্কলার যেমন ড. মুস্তফা সিবাঈ তার 'ইসলামের সমাজতন্ত্র' বইয়ে ও মুহাম্মাদ গাযযালি তার 'ইসলাম ও সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতি' বইয়ে ইসলামের সামাজিক সুবিচার সংক্রান্ত বিষয়ে বেশ উদারতা দেখিয়েছেন। কিন্তু মাওদূদী এখানে খুব কট্টর।

রাজনৈতিক দর্শন আলোচনা করতে যেয়ে মাওদূদী ডেমোক্রেসিকে অগ্রহণ যোগ্য মনে করেছেন। এর কঠোর সমালোচনা করেছেন। কারণ তিনি এর মূল দর্শনের দিকে তাকিয়েছেন বেশি এবং ভেবেছেন এটা আল্লাহর আইনের শাসনের বিপরীতে মানুষের শাসন। তিনি অন্য কোন দৃষ্টিকোণে এটার বিচার বিশ্লেষণ করেন নি। সরকার প্রধান নির্বাচন, নীতি নির্ধারক নির্বাচন ও তাদের ইম্পীচমেন্ট বা বহিস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা ইত্যাদিতে গণতন্ত্র থেকে নেয়ার মত অনেক কিছু আছে। গণতন্ত্র আসলে একনায়কতন্ত্রের বিপরীতে জনগণের ক্ষমতায়ন। গণতন্ত্রের মূল কথা হলো ক্ষমতা জনতার হাতে থাকবে, সরকারের হাতে নয়। আর মুসলিম বিশ্বে গনতন্ত্র ইসলামি শারীয়াহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। এই দৃষ্টিকোণে তিনি গনতন্ত্রকে দেখেন নি বলে মনে হয়েছে।

৪। একজন সংস্কারক হিসেবে মাওদূদীঃ

প্রতিটি স্কলার যে একজন সংস্কারক হবেন তা নয়। অনেক স্কলারকে দেখা যায় তারা চিন্তা, দর্শন ও গবেষণা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন, সমাজ ও সংস্কার নিয়ে ভাবেন না। সংস্কারের জন্য কাজ করেন তারা সমাজের সমস্যা ও তার উৎস নিয়ে গুরুত্ব দেন, যাতে রোগ নির্ণয় সহজ হয় ঔষধ দেয়াও যায় দ্রুত। মাওদূদী ছিলেন উম্মাতের একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার। তিনি উম্মাহর মূল সমস্যা গুলো চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। সেটা ছিলো তার ভাষায় জাহিলিয়্যাত। তিনি এই রোগটাকে মানব জাতির ইতিহাসের সব চেয়ে প্রাচীনতম রোগ বলে অভিহিত করেছেন। তিনি মনে করেন জাহিলিয়্যাতের মূলোৎপাটনই ছিলো নবী রাসূল (আ.) গণকে পাঠানোর অন্যতম কারণ। তিনি এই জাহিলিয়্যাতকে কয়েকভাগে বিভক্ত করেছেন, খাঁটি জাহেলিয়্যাত, শিরক ও অলিক কল্পনা মিশ্রিত জাহিলিয়্যাত কিংবা বৈরাগ্যবাদি জাহিলিয়্যাত। তিনি মনে করেন এ জাহিলিয়্যাত সমূহের সাথেই যুগে যুগে নবী রাসূলেরা (আ.) লড়াই করেছেন। তিনি এটাও মনে করেন একজন পূর্ণ মুজাদ্দিদের কাজ হলো এই জাহিলিয়্যাতের ধ্বজাধারিদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে আনা।

তিনি মনে করেন জাহিলিয়্যাতের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। অনেকেই মনে করেন ইসলামের আগের যুগকে জাহিলিয়্যাতের যুগ বলে। এটা ঠিক নয়। বরং জাহিলিয়্যাত হলো চিন্তা দর্শন, অনুভূতি ও কিছু ক্ষেত্র। যেখানেই তা পাওয়া যাবে জাহিলিয়্যাত হিসাবে তাকে চিহ্নিত করা হবে। এই জাহিলিয়্যাতের চিহ্ন হলো আল্লাহর হেদায়েতের বাইরে চলা, এবং আল্লাহর হুকুম ও শাসন পদ্ধতির বাইরে যাওয়া।

তিনি এই জাহিলিয়্যাতের মুলোৎপাটন করতে যেয়ে পরিপূর্ণ ভাবে আন্দোলনের গুরুত্বারোপ করেছেন, এক্ষেত্রে কোন সন্ধি করা যাবে না বলে পথ দেখিয়েছেন। আর সেই আন্দোলনের পথ হবে 'ইসলামি বিপ্লবের পথ'।

অনৈক্যঃ কারণ ও প্রতিকার

ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম*

ঐক্য শান্তির ডাক, শক্তির ডাক, সফলতার ডাক, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সমাজ বিনির্মানের ডাক। ইসলাম মানবতার ধর্ম। আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য একমাত্র জীবন ব্যবস্থা। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূল (সঃ) তাদের স্বজাতীয়দের প্রতি অভিন্ন সূরে আহবান ছিল এক আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণার পাশাপাশি পরিপূর্ণ ভাবে তারই গোলামী করা ও পরস্পরে দ্বন্দ্ব-অনৈক্যে না জড়ানো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেনঃ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রশি (কোরআন) কে শক্ত করে আকড়ে ধরো এবং কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।(১)

অত্র আয়াতে আল্লাহ তায়ালা দল-মত নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কোন অবস্থাতেই বিচ্ছিন্ন না হওয়ার কথা বলেছেন। সমাজবদ্ধ মানুষগুলো তাদের পারস্পারিক চিন্তা ও মতের ভিন্নতা থাকতে পারে বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা সৌন্দর্যের প্রতীকও বটে। কিন্তু কখনও তা অনৈক্য ও দ্বন্দ্ব-কলহে রুপ নিতে পারে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার বান্দাদের প্রতি ৩টি বিষয়ে খুবই সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। যা বিশ্ব নবী (সঃ) এর কণ্ঠে ঘোষিত হয়েছে ঃ "আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে ৩টি বিষয়ে খুশি হয়ে থাকেন, তাহলো তোমরা কেবল তারই ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকে শরীক (অংশীদারিত্ব) করবে না এবং সকলেই আল্লাহর রজ্জুকে (দ্বীন) ঐক্যবদ্ধ ভাবে (শক্ত ভাবে) ধারণ করবে"(২) অথচ যদি প্রশ্ন করা হয় আজ মুসলিম উম্মাহর সব চেয়ে বড় সমস্যা কি? এ প্রশ্নের জবাবে অনেকে বলবেন যোগ্য নেতৃত্বের অভাবই সবচেয়ে বড় সমস্যা কেউ বা বলবেন নীতি-নৈতিকথার অভাব। আবার কেউ বলবেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের। পশ্চাদপদতা। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে মুসলিম উম্মাহর অন্যতম বড় সমস্যা হলো অনৈক্য তথা ঐক্যবদ্ধ না থাকা। আজকে মুসলিম বিশ্বে সম্পদের অভাব নেই, নেই তেমন জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিচরণ করার মত মানুষের অভাব। তেমনি রয়েছে ধর্ম ভিত্তিক অনুসারী হিসাবে দ্বিতীয় অবস্থান। এতো কিছুর পরেও আজ মুসলমানরা নির্যাতিত নিপীড়িত। যার পিছনে অন্যতম কারণ হলো অনৈক্য, কিন্তু কেন? সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ ইহার কারণ গুলো তুলে ধরছি।

গোড়ামী সংকীর্ণমনা ঃ

উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের মাঝে (কম-বেশী) রয়েছে গোড়ামী। চাই তা মাযহাবী দৃষ্টিকোণ থেকে হোক বা রাজনৈতিক কিংবা ধর্মীয়। গোড়ামীর আবর্তে নিমজ্জিত হওয়ার দরুণ মনের প্রশস্ততার পরিবর্তে সংকীর্নতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে কুন্ঠাবোধ করে না অথচ সংকীর্নতাবোধ মানুষকে তার মূল লক্ষ্যে পৌছাতে চরম ভাবে বাধা গ্রস্থ করে। যার ফলে চরম বিরোধীরাতো দূরের কথা একই আদর্শ ও ন্যায় ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের কর্মীদের মাঝেও বিস্তর ফারাক বা অনৈক্য দেখা দেয়। কিন্তু বিশ্বনবী (সঃ) সব ধরনের গোড়ামী ও সংকীর্নতার উর্ধ্বে উঠে সকলকে আপন করে নিয়েছিলেন। যা তার জীবনী চর্চার মাধ্যমে আমরা জানতে পারি।

সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতা ঃ

অনৈক্যের অন্যতম কারণ হলো মনের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতার বীজ লালন করা। আজ সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে ইজম বা আঞ্চলিকতার বীষ বৃক্ষ মারাত্মক ভাবে গজায়েছে। আঞ্চলিকতার ফাঁদে পা দিয়ে একই দলের নেতা-কর্মীদের মাঝে সীমাহীন বিশৃঙ্খলা চলছে। ব্যক্তির উপর ব্যক্তির কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কোন সম্প্রদায় অপর কোন সম্প্রদায়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কেবল মাপকাঠি তাকওয়া। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ ﴿ إن أكرمكم عند الله أتقاكم ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে তোমাদের মাঝে সর্বাধিক মর্যাদা সম্পন্ন ব্যাক্তি হচ্ছে সে, যে আল্লাহকে বেশী ভয় করে।"(৩) বিশ্ব নবী (সঃ) ঘোষণা করেছেন ঃ ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى

"কোন অনারবের উপর আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কোন আরবের উপর অনারবের উপর শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কোন কালোর উপর লালের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কোন লালের উপর কালোর শ্রেষ্ঠত্ব নেই, শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি কেবল তাকওয়া"(৪)

একবার দরবারে নববীতে হযরত ওমর (রাঃ) এর কণ্ঠ থেকে বের হয়ে পড়ল। বিলাল তুমি কালো এক হাবশী এ কথা শুনে নবী করীম (সঃ) বললেন, ওমর এখনো তোমার মধ্যে জাহিলিয়াতের অন্ধ আভিজাত্যের গন্ধ রয়ে গেছে। হযরত ওমর অনুশোচনায় মাটিতে নুইয়ে পড়লেন। উঠতে বলা হলে বললেন, বিলাল আমাকে পা দিয়ে তুলে না দেয়া পর্যন্ত আমি উঠব না। শেষে সত্যিই তিনি বিলাল (রাঃ) কে বাধ্য করলেন তাকে পা দিয়ে উঠিয়ে দিতে।

পরমত সহিষ্ণু না হওয়া ঃ

উম্মাহর আজ অন্যতম ব্যাধি হলো অপরের মতকে সহ্য না করা। অথচ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো পরমত সহিষ্ণু হওয়া। কিন্তু প্রিয় নবী (সঃ) এবং সাহাবীদের চরিত্র ছিল নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দেয়া। যুদ্ধের মত Sensetive issue তেও নবী (সঃ) সকলের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। সেখানে নিজের মতকে চাপিয়ে দেননি। আজকাল কিছু মানুষ শুধুমাত্র বিরোধীতার খাতিরেই বিরোধিতা করছেন। যার ফলে সমাজে ক্রমাগত অনৈক্যই বাড়ছে এবং কল্যাণমুখী সমাজ গঠনে চরম ভাবে অন্তরায় সৃষ্টি হচ্ছে।

* সহযোগী অধ্যাপক, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আই আই ইউ সি।

কুরআন সুন্নাহকে আকঁড়ে না ধরা ঃরাসূলে কারীম (সঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে প্রায় সোয়ালাখ সাহাবীকে সামনে রেখে বিশ্ব বাসীকে লক্ষ্য করে ঘোষনা দিয়েছেন ঃ تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه.

"আমি তোমাদের জন্য দুটি বিষয় রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তার শক্ত ভাবে ধারণ করবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, আর তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব তথা আল কুরআন এবং তার নবীর সুন্নাত তথা আল হাদীস"(৫)

নবীজির এই অমীয় বাণীর মধ্যে রয়েছে পথ ভ্রষ্ট না হওয়ার গ্যারান্টি এবং বিনিদ্র ঐক্যের সুর সমাজ বদ্ধ মানুষের মাঝে যদি কোন বিষয়ে দ্বন্ধ বা অমত দেখা যায় তাহলে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহের দিকে যেতে বলা হয়েছে। যেমন আল্লাহর বাণী ঃ

فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.

অতপর কোন ব্যাপারে তোমরা যদি একে অপরের সাথে মতবিরোধ করো, তাহলে সে বিষয়টি (ফয়সালার জন্য আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, যদি তোমরা আল্লাহর উপর এবং শেষ বিচার দিনের উপর ঈমান এনে থাক।(৬)

দুনিয়া প্রীতি ঃ উম্মাহর মধ্যে শতমত ও দলের পিছনে অন্যতম কারণ হলো অযাচিত দুনিয়া প্রীতি ও মরণের কথা হৃদয়ের ভিতরে সদা জাগ্রত না থাকা। যার কারণে মুমিন জীবনের চূড়ান্ত সফলতা অধরাই থেকে যায়, এবং মুসলমানদের শক্তি সামর্থ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। এ প্রসঙ্গে নবীজি (সঃ) বলেছেন ঃ

يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة علي قصعتها قال: قلنا: يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ كثير ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل تنتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت.

"অচিরেই এ উম্মতের লোকদের উপর এমন একটি সময় আসবে তোমাদের বিপক্ষে তোমাদেরকে এমনভাবে ডাকা হবে যেমনটি মেজবান মেহমানদের খাওয়ার টেবিলের দিকে ডাকতে থাকে। এ কথা শুনে একজন সাহাবী বলল, সেদিন কি আমাদের মুসলিমদের সংখ্যা কম হবে? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। বরং, সেদিন তোমাদের সংখ্যা আরও বেশি হবে! তবে তোমরা সেদিন বন্যার পানিতে ভেসে আসা আবর্জনার মত হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাদের দুশমনদের অন্তর থেকে তোমাদের ভীতিকে দুর করে দেবে এবং তোমাদের অন্তরসমূহে "ওহান" ঢেলে দেবে। তারপর একজন সাহাবী দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল "ওহান" জিনিষটি কি? উত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ওহান" হল, দুনিয়ার মহব্বত ও মৃত্যুকে অপছন্দ করা"।(৭)

উম্মাহর অনৈক্যের অসংখ্য কারণের মধ্যে মৌলিক কয়েকটি কারণ আমরা উল্লেখ করলাম। এ পর্যায়ে তাদের পারস্পরিক অনৈক্য দূর করার উপায় ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। যা উভয় জাহানের সফলতার জন্য একান্ত প্রয়োজন। তা হলো-

হৃদয়ের প্রশস্ততা ঃ জীবনের চূড়ান্ত সফলতার্জনে ঐক্যবদ্ধ জীবনের কোন বিকল্প নেই। যার প্রধান হাতিয়ার হলো দলমত নির্বিশেষে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে সকলকে আপন করে নেয়া। সংকীর্ণ পথ পরিহার করে জীবনের প্রতিটি পরতে পরতে প্রশস্ত মনের পরিচয় দিতে হবে। যা আমরা মহানবীর (সঃ) জীবনের প্রতিটি স্তরে লক্ষ্য করছি। যে মুহাম্মদ (সঃ) এর ব্যাপারে মক্কার কাফের মুশরিকেরা হত্যা সহ নানা যড়যন্ত্র করেছিল, তাদেরকেই মহানবী (সঃ) প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে মক্কা বিজয়ের দিন ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কোন রকম প্রতিশোধ পরায়নপর হননি। মহানবীর কণ্ঠে আল্লাহর বাণী ঘোষিত হলো ঃ لا تثريب عليكم اليوم "আজ তোমাদের ওপর (আমার) কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ক্ষমা করে দিন। কেননা তিনি সব দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।"(৮)

অন্য মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া ঃ প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ তায়ালা ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যার কারণে প্রত্যেকেই ভিন্ন মত ও দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। নিজের মতের সাথে সামঞ্জশ্যহীন বলেই অপর মতের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল হবে তা কখনো ইসলাম গ্রহণ করে না। বরং কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরামর্শ মোতাবেক অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত হবে তা নির্দ্বিধায় মেনে নেয়াই হলো ঐক্যের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। এবং সুখী সমৃদ্ধশালী সমাজ গঠনের অন্যতম হাতিয়ার।

গোড়ামী পরিহার করা ঃ গোড়ামী বা Extrimism কে জীবনের প্রতিটি স্তর থেকে চিরদিনের জন্য পরিহার করতে হবে। মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শত্রুর মোবাবেলা ওসফলতার্জনে ব্রতী হতে হলে জাহিলিয়াতের অন্ধ গোড়ামীর করাল গ্রাস থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজনে "মতভেদ সহ ঐক্য" এই নীতি অবলম্বন করে লক্ষ্য পানে অগ্রসর হতে হেব।

ত্যাগের উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থাপন করা ঃ ভোগ নয় ত্যাগেই শান্তি' এ নীতি অবলম্বন করে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্যকে সমুন্নত রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া সময়ের দাবী।

অতএব উভয় জগতের সফলতার্জনে কোরআন-সুন্নাহের মানদন্ডে সকলকে ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপন করার কোন বিকল্প নেই।

তথ্যসূত্র ঃ

১। সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৩।

২। কুশাইরী, আবুল হোসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ, **সহীহ মুসলিম**, বৈরুতঃ দারু ইহয়াউত তুরাস আল আরাবী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা নং ১৩০, হাদীস নং ঃ ৪৫৭৮।

৩। সূরা আল হুজুরাত, আয়াত ১৩

৪। আবু আব্দুল্লাহ আহ্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে হাম্বাল, **মুসনাদে আহ্মাদ**, ১ম সংস্কারণ, মুয়াচ্ছাছাতুর রেসালাহ, ২০০১ইং, পৃঃ ৪৭৪।

৫। মালেক ইবনে আনাছ, **আলমুয়াত্তা**, ১ম সংস্কারণ, (আবুধাবী ঃ মুয়াচ্ছাছাতুর জায়েদ ইবনে সুলতান আলে নাহইয়ান, ২০০৪), খন্ড ৫, পৃঃ ১৩২৫।

৬। সূরা আন্ নিসা, আয়াত ৫৯।

৭। আবু আব্দুল্লাহ আহ্মদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে হাম্বাল, প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮২।

৮। সূরা ইউসুফ, আয়াত ৯২।

বিভিন্ন সভ্যতা ও ধর্মে হিজাবের অস্তিত্ব

মুহাম্মদ নাজমুল হুদা সোহেল

ভূমিকা:

সমাজে একটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে, হিজাব শুধুমাত্র ইসলামই প্রবর্তন করেছে এবং ইসলাম আবির্ভাবের আগে আরব উপদ্বীপ কিংবা পৃথিবীর কোথাও হিজাবের প্রচলন ছিল না। পশ্চিমা বিশ্ব ইসলাম কর্তৃক নারীদের উপর কঠোরতার প্রমান স্বরুপ হিজাব নিয়ে আপত্তি করে থাকে। তারা ইসলাম কর্তৃক নারীদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখারও অভিযোগ তোলে। অথচ ইতিহাসের তথ্য উপাত্ত, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থসমুহ এবং গবেষকদের গবেষণা প্রমান করে এটি চরম ভূল ধারণা, বরং মানব সভ্যতার সূচনা থেকেই নানান নামে এবং স্টাইলে হিজাবের ধারণা ও ব্যবহার প্রচলিত ছিল। হিজাবের চর্চা কেবল ইসলামে আছে তা নয়। ভিন্ন নামে, ভিন্ন পরিচয়ে তা জারি আছে অন্যান্য রহিত শরীয়ত ও ধর্ম বিশ্বাসীদের মধ্যেও। ইহুদি ধর্মে এমন কোন ধর্মীয় বিধান পাওয়া যাবে না যেখানে একজন বিবাহিত নারীকে মাথার চুল খোলা রেখে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। হিজাব ভদ্রতার পরিচায়ক হওয়ার কারণে পূর্ববর্তী ইহুদি সমাজে ব্যভিচারী মহিলাদের হিজাব পরিধানের অনুমতি ছিল না। বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী খ্রীষ্টপূর্ব ১৩শ শতাব্দী থেকে হিজাব বা চুল আবৃত করার পোশাক ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী হিন্দুদের ধর্ম ধর্মগ্রন্থ গীতাতেও শরীর কিংবা মাথা আবৃত রাখার কথা বলা আছে। ঋগবেদ-এর ১৯-২০ মন্ত্রে বলা হয়েছে, পুরুষদের নারীদের বস্ত্র পরিধান করা উচিত নয়। রামায়ন থেকে জানা যায়, সীতার প্রতি রামের নির্দেশ ছিলো নিজেকে ঢেকে রাখার।(১) কিন্তু বিশ্বাস ও কর্মের নানাবিধ বিকৃতির কারণে উপরোক্ত ধর্মবিশ্বাসীদের মাঝে হিজাবের বাস্তব অনুশীলন লক্ষ্য করা যায় না; যদিও তাদের ধর্মীয় উৎসসমুহ তাদেরকে হিজাবের নির্দেশ দিয়েছে। এ পর্যায়ে প্রসিদ্ধ কয়েকটি ধর্মের নিজস্ব উৎস থেকে গৃহীত দলীলের ভিত্তিতে হিজাব ও তৎসাদৃশ পোশাকের সার্বজনীনতার বিষয়টি প্রমাণের চেষ্টা করবো।

ইহুদি ধর্মে হিজাব:

ইহুদি ধর্মে ধর্মীয় বিধি বিধানের দু'টি প্রসিদ্ধ উৎসের একটি ওল্ড টেস্টামেন্ট যা লিখিত এবং তালমুদ যা অলিখিত। ওল্ড টেস্টামেন্টে এমন অনেক উদ্ধৃতি রয়েছে যেখানে পবিস্কার ভাষায় বলা হয়েছে, হিজাব প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একটি আবশ্যকীয় বিধান। বিখ্যাত ইহুদি বিশ্বকোষ The Universal Jewish Enchyclopedia পর্দা (Veil) শিরোণামে ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত নিকাব সম্পর্কিত আলোচনা প্রসংগে বলছে: 'নিকাব ব্যবহার করা হয় মূখমন্ডল ঢাকার জন্য। পবিত্র গ্রন্থে এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলোর সাধারণ অর্থ নিকাব বা পর্দা। কিন্তু এ শব্দগুলোর সূক্ষ অর্থ অজানা, সম্ভবত এগুলো দ্বারা এমন আরো কিছু পোশাকের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে যেগুলো দ্বারাও মুখমন্ডল ঢাকা হয়। ইয়েশিভা বিশ্ববিদ্যালয়ের "বাইবেল শিক্ষা" বিভাগের প্রফেসর ড. মিনাখিম এম. ব্রায়ার তার "ইহুদিদের আইনে ইহুদি মহিলা" নামক গ্রন্থে লিখেছেন: "ইহদি মহিলারা মাথা ঢেকে বাইরে যেতেন। প্রায়ই তারা একটি চক্ষু ছাড়া পূর্ণাংগ চেহারা ঢেকে রাখতো "(২) তিনি তার কথার প্রমান দিতে গিয়ে পূর্ববর্তী বিখ্যাত ইহুদি পন্ডিতদের বিভিন্ন বক্তব্য নিয়ে এসেছেন।

প্রফেসর ড. মিনাখিম এম. ব্রায়ার আরো বলেন: "টান্নইটিক যুগে যেসব ইহুদি মহিলা মাথা অনাবৃত রাখতো তাদেরকে নির্লজ্জ হিসেবে গণ্য করে ৪০০ দিরহাম জরিমানা করা হতো"। তিনি আরো বলেন: "ইহুদিদের এই হিজাব শুধুমাত্র তাদের ভদ্রতারই পরিচায়ক হতো না বরং এটা বিলাসিতা ও মর্যাদার পার্থক্যকারী বিবেচিত হতো। হিজাব পরলে বুঝা যেত এ মহিলা ভদ্র ও উচ্চ বংশীয়।(৩) হিজাব মহিলার সামাজিক মর্যাদারই পরিচয় বহন করে এবং তার মর্যাদাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। সমাজের নিম্ন শ্রেণির মহিলারা হিজাব পরত যেন তাদেরকে উচ্চ বংশীয়দের মত দেখায়। হিজাব ভদ্রতার পরিচায়ক হওয়ার কারণে পূর্ববর্তী ইহুদি সমাজে ব্যভিচারী মহিলাদের হিজাব পরিধানের অনুমতি ছিল না। তাই নিজেদেরকে সতী-সাধবী প্রমান করতে সে যুগে তারা বিশেষ ধরণের স্কার্ফ ব্যবহার করতো।(৪) হযরত ঈসা আ. এর আগমনের পূর্বে ইহুদিদের পোশাক সম্পর্কে খুব বেশী বর্ণনা পাওয়া না গেলেও যতটুকু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া গিয়েছে তাতে দেখা যায়, তৎকালে ইহুদি নারীগণ তাদের মাথা এবং কখনো কখনো চেহারা ঢেকে রাখতেন। যেমন General Introduction to the Sacred Scriptures গ্রন্থে ইবরানিদের পোশাক অধ্যায়ে বলা হয়েছে 'ইহুদি ও ইবরানি নারীগণ ঘরের বাইরে কখনো খিমার (ওড়না) ছাড়া বের হতেন না।'(৫) । আরো বলা হয়েছে, 'প্রাচীনকালে ইবরানীদের পোশাক কখনো এত লম্বা হতো যে তা পুরো শরীরকেই ঢেকে ফেলতো।'(৬)

---

* লেকচারার, SHIS, আই আই ইউ সি।

হিজাবের বিধান সাব্যস্ত করার জন্য ইহুদী পাদ্রীগণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে গ্রন্থীয় দলীলটি ব্যবহার করেন তা হলো 'আল-আদাদ' গ্রন্থের 'আত্মসম্মানের বিধান' অংশটি। এতে বলা হয়েছে "কোন ব্যক্তি তার স্ত্রী ব্যভিচার করার সন্দেহ করলে এবং তা বিচারকের সামনে সাব্যস্ত করার কোন বস্তুগত প্রমান না থাকলে সে তার স্ত্রীকে পাদ্রীর নিকট নিয়ে যাবে। পাদ্রী উক্ত মহিলার মাথা থেকে কাপড় সরিয়ে নিবে এবং তার হাতে আত্মসম্মানের একটি প্রতীকি উপহার রাখবে। এরপর পাদ্রী নিজ হাতে অভিশপ্ত পানি নিয়ে মহিলাকে এই বলে শপথ পাঠ করাবে 'যদি অন্য কোন পুরুষ তোমার শয্যাসংগী না হয়ে থাকে এবং তুমি তোমার স্বামীর খেয়ানত না করে থাকো তাহলে তুমি এ অভিশপ্ত পানি থেকে মুক্ত..... এ ক্ষেত্রে পাদ্রী মহিলার হিজাবে আবৃত মুখমন্ডল ছাড়া অন্য কিছু খুলতে পারবে না।'[৭]

উপরোক্ত অংশের ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট ইহুদি পাদ্রী ও বনী ইসরাইলী আলেমদের অন্যতম পুরোধা রাশী বলেন: 'এই উদ্ধৃতি থেকে প্রমানীত হয় বনী ইসরাইলের নারীরা মাথা খোলা রেখে বাইরে যেতে অভ্যস্ত ছিল না।'[৮] পরবর্তী যুগের ইহুদী পন্ডিত Vilna Gaon ও মনে করেন বনী ইসরাইলের নারীদের জন্য মাথা খোলা রাখা হারাম হওয়ার পক্ষে এটি একটি প্রমান। Dictionary of Judaism in the Biblical Period এ এসেছে রোমান সম্রাট Vespasian সত্তর (৭০) খ্রিস্টাব্দে ইহুদি অধ্যুষিত এলাকায় Judaea Capta coins স্বনামে যে মুদ্রা প্রবর্তন করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে একজন নারী হিজাব বা এজাতীয় পোশাকে ঘরের বাইরের একটি দৃশ্যে বসে আছেন :[৯]

ইহুদি পাদ্রী Mayer Schiller বলেন ঃ ইহুদি ধর্মে এমন কোন ধর্মীয় বিধান পাওয়া যাবে না যেখানে একজন বিবাহিতা নারীকে মাথার চুল খোলা রেখে বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে।[১০] আরেক ইহুদি পাদ্রী Getsel Ellinson এ বিষয়ে ধর্মীয় ঐকমত্য থাকার কথা উল্লেখ করে বলেন ঃ ইহুদি আলেমদের সকল শাখা একমত যে, বিবাহিতা নারীরা বাইরে যাওয়ার সময় মাথার চুল খোলা রাখতে পারবে না, যদিও এ ক্ষেত্রে শাখা পর্যায়ে কিছু মতভেদ রয়েছে।[১১]

১৯০৮ ইং সালে প্রকাশিত বিখ্যাত অভিধান A Dictionary of the Bible এর মলাটে দেখা যাচ্ছে, হাতে আঁকা পূর্ববর্তী আহলে কিতাবীদের কিছু ছবি রয়েছে, যেখানে দু'জন নারীর মধ্যে একজন হিজাব পরিহিতা আর অন্যজন মাথা আবৃত অবস্থায় রয়েছেন। ইউরোপের ইহুদি মেয়েরা উনবিংশ শতাব্দীতে তাদের জীবনধারা সেক্যুলারিজমের সাথে মিশে যাওয়ার আগ পর্যন্ত পর্দা মেনে চলতো। ইউরোপের সমাজ ব্যবস্থা অনেককে হিজাব খুলতে বাধ্য করেছে। এখন অধিক ধার্মিকা ইহুদি নারীরা তাদের উপাশনালয় ছাড়া অন্য কোথাও মাথার চুল ঢেকে রাখেন না।[১২]

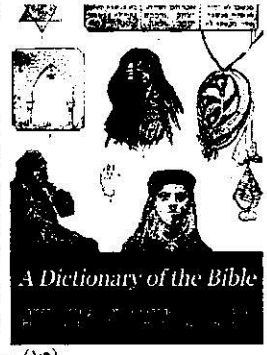

খৃস্টান ধর্মে হিজাব

এটা প্রসিদ্ধ যে, ক্যাথলিক খৃষ্টান যাজক মহিলাগণ শত শত বছর ধরে পর্দার বিধান মেনে চলছেন। পর্দা সম্পর্কে নিউ টেস্টামেন্টে পোল বলেছিলেন: 'আমি চাই তোমাদের জেনে রাখা উচিত যে, প্রত্যেক পুরুষের মাথাই যীশু। আর প্রত্যেক মহিলার মাথাই পুরুষ এবং যীশুর মাথা যেন স্রষ্টা। কোন পুরুষ ইবাদত বন্দেগী করা অবস্থায় মাথায় কিছু থাকলে তার মাথাকে অপমান করা হবে। পক্ষান্তরে কোন মহিলা খালি মাথায় ইবাদত বন্দেগী করলে তার মাথাকে অপমান করা হবে। মাথাকে অপমান করা মানে মাথার চুল কামিয়ে দেয়া। অতএব কোন মহিলা মাথা ঢেকে না রাখলে তার মাথার চুল কামিয়ে দিতে হবে। যদি কোন মহিলার জন্য তার মাথার চুল কামিয়ে ফেলা অপমানজনক মনে হয়; তাহলে সে যেন তার মাথা ঢেকে রাখে। আর পুরুষের মাথা স্রষ্টার প্রতিচ্ছবি হওয়ায় মাথা ঢেকে রাখা উচিত নয়।[১৩]

পোলের পর্দার বিধান ঘোষণার মূল কারণ হচ্ছে, স্রষ্টারুপী পুরুষের সম্মান রক্ষা করা। কেননা পুরুষ থেকে এবং পুরুষের জন্যই তার জন্ম হয়েছে। বিশিষ্ট ধর্মজাযক টারটোলিয়ান তার বিখ্যাত গ্রন্থ নারীর পর্দা তে লিখেছেন: "নারীর উচিত রাস্তাঘাট, গীর্জা, নিজ ভাতৃবর্গ ও বেগানা পুরুষদের সামনে হিজাব পরিধান করা।" বর্তমানেও ক্যথলিক খৃষ্টানদের নিয়ম হচ্ছে- মহিলাগণ গীর্জার ভিতরে অবশ্যই তাদের মাথা ঢেকে রাখবে।[১৪]

আমিশ, মিনোনাইট প্রমুখ খৃষ্টানগণ আজও হিজাব পরিধান করে থাকেন। নিম্নের ছবিটির দিকে লক্ষ্য করলে এর কিছু প্রমাণ পাওয়া যাবে।

শপথ পাঠরত খৃস্টান নানগণ হিজাব বা তৎসদৃশ পোশাক পরে আছেন।[১৫]

পর্দা সম্পর্কে গীর্জার পাদ্রীগণ বলে থাকেন যে, পর্দা হলো স্বামীর প্রতি নারীর আনুগত্য ও স্রষ্টার আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ। একথাটি নিউ টেস্টামেন্টে পোল নিজেই বলে গেছেন।[১৬]

উল্লেখ্য, ইসলামে পর্দার বিধান খৃষ্টানদের আকীদার পুরোপুরি বিপরীত। এটা পুরুষের সম্মান বা আনুগত্যের দলীল নয়, বরং তা মুসলিম নারীর নিরাপত্তা, সম্মান ও চরিত্রের গ্যারান্টি স্বরুপ। খৃস্টানদের বিভিন্ন গীর্জায় মারয়াম আ. এর যেসব প্রতিমা ও তৈলচিত্র রয়েছে তাতে ও তাকে পুরো শরীরে হিজাব পরিহিত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে।[১৭]

আরব্য জাহেলিয়ায় হিজাব ও নিকাবের আলোচনা :

জাহেলী যুগে বিভিন্ন কবিতার পংক্তি প্রমাণ করে যে, ইসলামের পূর্বে অনেক আরববাসীর নিকট নিকাব শব্দের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। যেমন কবি উম্মে আমর বিনতে বিকদানের কবিতা ঃ

তুমি যদি তোমার ভাইয়ের প্রতিশোধ না চাও
তোমার হাতিয়ার কাদা-মাটিতে ফেলে দাও
যাতে তা নষ্ট হয়ে যায়।
তুমি চোখে সুরমা লাগাও এবং
গাঢ় লাল-হলদে রংয়ের পোশাক পরো
নারীদের মত **নিকাব** পরো,
জেনে রেখো পরাজিত দল কতই না নিকৃষ্ট।

অন্য একজন কবি বলেন :

আইলান গোত্রের কায়েসকে তোমরা কি দেখোনি
সে তার সৌন্দর্য **বোরকা** দিয়ে ঢেকে রেখেছে
এবং তার তীর সে ভালোবাসার বিনিময়ে
বিক্রি করে দিয়েছে।

কবি হাতিয়া'র কবিতা :

উসামা ঘোড়ায় চড়ে
বারবার ভ্রমণ করেছে
নিকাব পরা অবস্থায়
তার গঠন প্রকৃতি কতই না সুন্দর।

কবি নাবেগা জুযাদী'র কবিতা :

গরিণীর গাল
যুবতীর **নিকাবের** মতো সৌন্দর্যমন্ডিত
চলন্ত অবস্থায় তার দু'টি শিং
খোসা ছাড়ানো ফলের ন্যায় উজ্জ্বল।

এছাড়া জিলবাব ও খিমার উভয়টাই জাহেলী যুগে প্রচলিত পোশাক ছিল, জাহেলী যুগের কবিতাই এর প্রমাণ। এ ধরনের কিছু পোশাকের উদাহরণ আমরা উপস্থাপন করছি:

আমর যুল কালব-এর বোন জানুন শোক গাথায় বলেন :

বাজ পাখি ঘুরছে, অথচ সে আসছে,
তার পাশ দিয়ে **চাদর পরিহিতা** যুবতীগণ
চলাফেরা করছে।

কবি আ'শা বলেন :

ঘন মসৃণ বালুকণার ন্যায় তার গঠন-প্রকৃতি
চলাফেরা অতি আকর্ষণীয়,
তবে তার পেছনের অংশ ছেঁড়া
অথচ সে **চাদর** পরে সৌন্দর্য প্রকাশ করে চলছে।

কবি কায়েস ইবনে হাতীম বলেন :

মনে হয় লবঙ্গ ও আদার ন্যায় **জিলবাব** পরিহিতা নারী
দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে পথিকের।

কবি সখর ইবনে আমর তার বোন খানসা সম্পর্কে বলেন :

আল্লাহর শপথ আমি তাকে নিকৃষ্টতম উটটিও দেবো না,
যদি আমি ধ্বংসও হয়ে যাই,
আর সে তার ওড়না টুকরো টুকরো করে ফেলে
এবং চুল দিয়ে ওড়না তৈরি করে।

কবি বশর ইবনে আবি খাযেম তার ঘোড়ার শুভ্রতার প্রশংসা করে বলেন :

দ্রুত গতিতে চলার প্রতিযোগিতায়
অন্যান্য ঘোড়ার সাথে এমনভাবে চলে যেন
তার এ শুভ্রতা **ওড়নার** মত মনে হয়।

কবি খানসা বলেন :

এমনভাবে সে ভর্ৎসনা করতে থাকে,
চলতে থাকে অনবরত যন্ত্রণাকারীর যন্ত্রণার মতো এবং
বন্ধ হয় না **ওড়না** দিয়ে মুখ বেঁধে ফেললেও।[১৮]

নিকাবের মতো ওড়না ও চাদর জাহেলী যুগের পোশাক হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ ছিল না। কিন্তু এখানে বড় পার্থক্য হলো, জাহেলিয়াতের সময়ে যে পোশাক ছিল, ইসলাম এসে তা ব্যবহার ও পরিধানের জন্য মুমিন নারীদেরকে পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর প্রকাশ্য নির্দেশনার মাধ্যমে নিশ্চয়তা প্রদান করে। ফাররা বলেন, জাহেলী যুগে নারীরা ওড়না পেছন দিক থেকে ঝুলিয়ে রাখতো এবং সামনের দিক খোলা রাখতো, পরে আবৃত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।[১৯] অতঃপর সুন্নাহের নির্দেশক্রমে পুরুষের সাথে সাক্ষাত ও নামাযের মধ্যে ওড়না পরিধান করা ওয়াজিব হিসেবে গণ্য হয়। আয়েশা রা. বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ প্রাথমিক যুগের মুহাজির মহিলাদের প্রতি রহম করুন! যখন আল্লাহ এ আয়াতটি নাযিল করেন তখন মহিলাগণ তাদের বস্ত্রখন্ড ছিঁড়ে মুখমন্ডল ঢেকে ফেলে। অন্য বর্ণনায় আছে, মহিলারা তাদের কোমরবন্ধের কাপড়ের প্রান্তদেশ কেটে সেই টুকরো দিয়ে চেহারা ঢেকে রাখে।[২০]

উপসংহার ঃ এ সমস্ত প্রমানাদি দ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, হিজাব ইসলাম কর্তৃক নির্দেশিত নতুন কোন বিধান নয়। বরং, ইসলাম শুধুমাত্র হিজাব বা পর্দার বিধান পালনের জন্যে তাগিদ দিয়েছে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন মু'মিন নারী ও পুরুষদেরকে দৃষ্টি অবনত রাখা ও চরিত্রকে নিষ্কলুষ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। যারা আজ হিজাবকে মৌলবাদের প্রতীক বলে কটাক্ষ করার চেষ্টা করে তাদের ইতিহাসের মূলেও হিজাবের বিধান ছিলো বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। সুতরাং হিজাব কোনো নতুন আবিস্কার নয়; বরং প্রতিটি সুস্থ সভ্যতা ও আসমানী শরীয়তে এর অস্তিত্ব কম-বেশি কার্যকর ছিল।

তথ্যসূত্র:

১. http://www.priyo.com/2015/04/05/141450-বিভিন্ন-ধর্মের হিজাব
২. Menachem M. Brayer, **The Jewish Woman in Rabbinic Literature: A Psychosocial Perspective** (Hoboken, NJ: Ktav Publishing House, 1986) p. 316-317
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।
৪. Susan W. Schneider, **Jewish and Female** (New York: Simon and Schuster, 1984) p. 237
৫. Joseph Dixon, **A General Introduction to the sacred Scriptures** (Baltimore: John Murphy and Company, 1853), v. 2, p. 163
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।
৭. সামি আমেরী, আল-হিজাব শরীয়াতুল্লাহ ফিল ইসলাম ওয়াল ইয়াহুদীয়্যা ওয়ান নাসরানিয়্যাহ, পৃ. ৬১, অনলাইন ভার্সনে লিংক: (http://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single3/ar_Hijab_Sami_Ameri.pdf)
৮. Yehuda Henkin, **Responsa on Contemporary Jewish Women's Issues,** (New Jersey: KTAV Publishing House, 2003) , p.131
৯. Jacob Neusner. ed. Chief, **Dictionary of Judaism in the Biblical Period:450 B.C.E. to 600 C.E.,** (New York: Macmillan Library Reference, 1996), v. 2, p. 656
১০. https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/judaica/ejud_0002_0008_0_08618.html
১১. G. Ellinson, **Women and Mitzvot: The Modest Way, A Guide to the Rabbinic Sources** (Jerusalem: Feldheim Publishers, 1992) p.121
১২. Ibid., p. 238-239
১৩. ড. শারীফ আব্দুল আজিম, ইসলামে নারী বনাম পুস্তক ও বাস্তবতায় ইহুদী ও খৃস্টান ধর্মে নারী, বাংলা অনুবাদ: মু. ইসমাইল জাবীহুল্লাহ, (মিশর: অনলাইনে প্রকাশিত, ২০১০ ইং), পৃ. ৬০
১৪. Clara Henning, **Canon Law and the Battle of the Sexes,** ed. Religion and Sexism (New York: Simon and Schuster, 1974), p.272
১৫. https://www.google.com.bd/ christian nun
১৬. Donald B. Kraybill, **The riddle of the Amish Culture** (USA: Johns Hopkins University Press, 2001), p.56
১৭. সামি আমেরী, আল-হিজাব শরীয়াতুল্লাহ ফিল ইসলাম ওয়াল ইয়াহুদীয়্যা ওয়ান নাসরানিয়্যাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।
১৮. আবদুল হালীম আবু শুক্কাহ, রসূলের স. যুগে নারী স্বাধীনতা (ঢাকা: বি.আই.আই.টি, ২০০৬ ইং), খন্ড: ৪, পৃ. ২১৯।
১৯. হাজর আবুল ফজল আল-আসকালানী, ফাতহুল বারী, (বৈরুত: দারুল মা'রিফা, ১৩৭৯ হি.), খন্ড: ১০, পৃ. ১০৬।
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

ইংরেজি জানা আলেমদের ক্যারিয়ার

- আহমাদ যোবায়ের*

মানজুর সাহেব দক্ষিণ কোরিয়াতে থেকেই প্ল্যান করলেন, দেশে এসে একটা ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্‌রাসা স্থাপন করবেন। ঢাকায় শনির আখড়ার কাছাকাছি তাঁর একটা জায়গা আছে যেখানে ১০ তলা ভবন তৈরি করা যাবে। পুরো জায়গাটা তিনি মাদ্‌রাসা জন্য দান করে দেবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন মানজুর সাহেবের এই ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্রাসায় ৯ মাস ইংরেজি ও গণিতের শিক্ষক ছিলাম। মাদ্‌রাসা বয়স তখনও একবছর হয়নি। আমার এর আগে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ও'লেভেল-এ'লেভেলে শিক্ষকতা করার অভিজ্ঞতা ছিল বিধায় মাদ্‌রাসা শুরু দিকে অনেকগুলো কাজ আমাকেই করতে হয়েছিল। কারিক্যুলাম, সিলেবাস, পাঠ্যবই ইত্যাদির পরিকল্পনা করা আমার জীবনের অন্যতম একটা স্মরণীয় অধ্যায়। মানজুর সাহেবের এই ইংলিশ মিডিয়াম মাদ্‌রাসা করার পেছনে একটা গল্প আছে।

তিনি একবার ব্যবসায়িক কাজে দক্ষিণ কোরিয়া গিয়েছিলেন। বাংলাদেশে বেশ কিছু শিল্প-কলকারখানা রয়েছে তাঁর। গুলশানে আছে বাড়ি। গল্প লেখার কারণে এখানে তাঁর আসল নাম দেয়া যাবে না। তাই আমরা একটা নাম দিলাম- মানজুর আহমাদ। ব্যক্তিগত জীবনে তাবলীগ জামায়াতের সিলসিলা থেকে ইসলাম শিখেছেন। সে অনুযায়ী আমল করছেন। কোরিয়াতে থাকাকালীন একদিন সালাতুল জুম'আ আদায়ের জন্য বাংলাদেশি মুসলিমদের পরিচালিত একটা মাসজিদে গেলেন তিনি। ইমাম সাহেব বাংলাদেশি হলেও জুম'আর আলোচনা করছিলেন ইংরেজিতে। এত সুন্দর ইংরেজি শুনে মানজুর সাহেবের একটু কৌতূহল হল। তিনি সালাতের পর ইমাম সাহেবের সাথে কথা বলতে এগিয়ে গেলেন। সালাম দিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। আলাপচারিতায় উঠে এল অনেক বাস্তবতা যা মানজুর সাহেবকে এমন একটা উদ্যোগ নিতে অনুপ্রাণিত করল।

ইমাম সাহেব জানালেন, বর্তমানে অমুসলিম দেশগুলোতে ইংরেজি জানা আলেমের খুবই প্রয়োজন। কারণ, বিশ্বায়নের এই যুগে ইংরেজির সাথে মানুষের সম্পর্ক দিন দিন বেড়েই চলেছে। তাছাড়া পশ্চিমা দেশগুলোয় বসবাসরত মুসলিমদের জন্য নির্মিত মাসজিদগুলোতে এমন ইমাম দরকার, যিনি ইংরেজিতে বয়ান করতে পারবেন। যদিও ইংরেজি জানা মুসলিমের সংখ্যা সেসব দেশে অনেক। কিন্তু তাঁরা কেউই সার্টিফিকেটধারী আলেম না। কোন ইসলামী প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁদের ডিগ্রি নেই।
অপরদিকে ইউরোপ, আমেরিকা ও ওশেনিয়া মহাদেশের বেশিরভাগ দেশেই অফিসিয়াল ভাষা হল ইংরেজি। সেসব দেশের মুসলমানরা তাদের মাসজিদগুলোতে এমন আলেম পান না, যিনি ইংরেজিতে ভাল। এর কারণ হল, অমুসলিম দেশগুলোতে বসবাসরত মুসলমানরা তাঁদের সন্তানদের ইসলামী শিক্ষার জন্য সপ্তাহে স্কুল ছুটির দিনগুলোতে কিছু দ্বীনি স্কুল পরিচালনা করেন। সেগুলো বড় জোর প্রাইমারি লেভেল পর্যন্ত। ফুলটাইম মাদ্‌রাসা বা বিশ্ববিদ্যালয় লেভেল পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠান তাঁরা তৈরি করতে পারছেন না বলে আলেম তৈরি করা যাচ্ছে না।

ইমাম সাহেব বেশ আক্ষেপ করে বললেন, কেবলমাত্র মুসলিম দেশগুলোর সে সুযোগ আছে। মুসলিম দেশগুলোতে প্রচুর মাদ্‌রাসা ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যেখান থেকে প্রতিবছর অনেক আলেম বের হচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা ইংরেজিতে ভাল না হবার কারণে অমুসলিম দেশগুলোতে গিয়ে দা'ওয়াহ্‌র কাজ করতে পারছেন না। তিনি মানজুর সাহেবকে বললেন, আপনারা যদি বাংলাদেশ থেকে ইংরেজি জানা আলেম আমাদের তৈরি করে দিতে পারেন, আমি গ্যারান্টি দিতে পারি ইউরোপ-আমেরিকার মত দেশে তাঁদের কাজের অনেক সুযোগ তৈরি করে দিতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

তিনি আরও জানালেন, বর্তমান পরিবর্তিত বিশ্ব প্রেক্ষাপটে মুসলিম উম্মাহর হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য ওলামায়ে কেরামকেই এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমানে বেশিরভাগ মুসলিমই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন অথচ তাঁদের দ্বীনি ইল্‌ম না থাকায় উম্মাহ্‌কে কোন সার্ভিস দিতে পারছেন না। অপরদিকে ওলামায়ে কেরাম দ্বীনি ইল্‌ম হাসিলের পাশাপাশি যদি ইংরেজিতে দক্ষ হতেন, কম্পিউটার টেকনোলজিতে পারদর্শী হতেন; উম্মাহ্‌ অনেক বেশি বেনিফিট পেত।

দেশে ফিরেই মানজুর সাহেব মাদ্‌রাসা স্থাপনের কাজে নেমে পড়লেন। তাঁর খুব ঘনিষ্ট এক মুফতি সাহেবকে নিয়োগ দিলেন মাদ্রাসার

* শিক্ষক, IIUC'র অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিভাগ। ecozobayer@gmail.com

প্রিন্সিপাল হিসেবে। তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দুই বছরের মধ্যেই মাদ্‌রাসা ছাত্র ভর্তি শুরু হল। কিন্তু আমি জয়েন করার পর দেখলাম, ইংলিশ মিডিয়াম সম্পর্কে তাঁদের কোন অভিজ্ঞতা না থাকায় যে কারিক্যুলাম ও সিলেবাস তৈরি করা হয়েছে তাতে মাদ্‌রাসা লক্ষ্য হাসিল হবে না। পরে অবশ্য প্রিন্সিপাল হুজুর আমার পরামর্শ মত সিলেবাস, কারিক্যুলাম ও পাঠ্যবই চেঞ্জ করে নিতে রাজী হলেন। আর পুরো দায়িত্ব এসে পড়ল আমার উপর।

আমরা সাধারণ শিক্ষিত মুসলিমরা এখনকার বিশ্বে দ্বীনি কোন বিষয় জানার প্রয়োজন হলে বিভিন্ন অনলাইন সোর্স খুঁজি। ইউটিউবে কোন ইসলামিক স্কলারের লেকচার শুনে থাকি। আর এসব কিছুর বেশিরভাগই ইংলিশ। বাংলায় সহীহ্ বিষয়গুলো অনলাইনে তেমন পাওয়া যায় না। এজন্যই আরও বেশি ইংলিশে দক্ষ ইসলামিক স্কলার তৈরি করা দরকার।

ইংলিশে দক্ষ ইসলামিক স্কলাররা গোটা বিশ্বব্যাপী দা'ওয়াহ্‌র কাজ করার পাশাপাশি অনলাইন থেকে আয়ও করতে পারেন। যেমন বর্তমানে ডা. জাকির নায়েক, নুমান আলী খান, মুফতি ইসমাইল মেনক, ইয়াসির ক্বাদী, ইয়াহিয়া ইব্রাহিম সহ অনেক ইসলামিক স্কলারদের লেকচারসমূহ ইউটিউব বা বিভিন্ন সাইটে অনেক বেশি পরিমাণ ভিউ হচ্ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার বার ক্লিক হচ্ছে একটা লিংকে। এভাবে কোন একটা ভিডিও কী পরিমাণ দেখা হয় তার উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞাপনদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো টাকা দিয়ে থাকে।

আগামীর বিশ্বে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক লিগ্যাসি ধরে রাখা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইসলামিক স্কলারদের অবদান ও ইসলামী রেনেসাঁকে এগিয়ে নিতে প্রতিটি মুসলিমকেই দ্বীনি ইল্‌মের পাশাপাশি জাগতিক জ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করতে হবে। আর না হয় একটি ইসলামী সমাজ বিনির্মানের স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে যুগ থেকে যুগান্তরে।

শিয়া সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, বিশ্বাসের মূলনীতি ও বিভাজন

রায়হান আজাদ*

ইসলাম একটি সার্বজনীন জীবনাদর্শ। জীবনের সর্বস্তরের সমাধান ইসলামে বিধৃত। বিশ্বনবী তাঁর উম্মাতকে সব সময় ঐক্যবদ্ধ থাকার উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু হযরত উসমানের খিলাফতের শেষ দিকে মুসলমানদের মাঝে অনৈক্যের সৃষ্টি হয়। যে মুসলমানরা কুরআন ও সুন্নাহর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে কুফরি শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার কথা ছিল তারাই কিনা পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদে জড়িয়ে পড়ে ইসলামী পরিবেশকে কলুষিত করে।

উমাইয়া যুগে আলী (রা.) এর সন্তানদের উপর যখন প্রচন্ড আক্রমন হয় এবং তারা অনেক কষ্টের সম্মুখীন হন তখন তাদের প্রতি মানুষের ভালবাসা ফুঁসে উঠে যেহেতু তারা আহলে বায়ত তথা রাসুলুল্লাহর বংশধর ছিলেন। যার ফলে শিয়া সম্প্রদায়ের পরিধি প্রশস্ত হয় এবং তাদের সহযোগীগণের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আরবী শিয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ দল, অনুসারী, সাহায্যকারী। পারিভাষিক অর্থে শিয়া বলতে শিয়াতু আলী বা আলী (রা.) এর দল, আলীর অনুসারী বা আলীর সাহায্যকারী বুঝানো হয়। শিয়া ফিরকার মূল ভিত্তি হযরত আলী ও তার বংশধরদের জন্য রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের দাবি। এ দাবিকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে অগণিত আকীদার উদ্ভব হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর আবির্ভাবের সময় আরবে কোন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব না থাকলেও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে রাষ্ট্রব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল আর তা হল বংশতান্ত্রিক বা রক্ত সম্পর্কীয়। রাষ্ট্রের মালিক রাজা। রাজার অন্যান্য সম্পদের মত রাষ্ট্রের মালিকানাও লাভ করবে তার সন্তানেরা বা বংশের মানুষেরা। তখন অধিকাংশ ধর্মও ছিল বংশতান্ত্রিক। ইহুদি ধর্ম, পারস্যের মাজুসী ধর্ম, মিশরের প্রাচীন ধর্ম ও অন্যান্য অনেক ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যেই রক্ত সম্পর্কের বিশেষ ধর্মীয় মর্যাদা ও অলৌকিকত্বের বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল। আরবরা গোত্রভিত্তিক আনুগত্যের ফ্রেমে বাঁধা ছিল। এমতাবস্তায় রাসূলুল্লাহ (সা.) সর্বপ্রথম আরবে একটি আধুনিক পরামর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এ ব্যবস্থার দুটি বিশেষ দিক ছিল। ১. রাজা ও প্রজার সম্পর্ক মালিক ও অধীনস্থের নয় বরং মালিক ও ব্যবস্থাপকের। তবে মালিক রাজা নন। রাষ্ট্রের মালিক জনগণ। রাজা তাদের খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে তা পরিচালনা করবেন। জনগণই তাকে মনোনীত করবেন এবং জনগণই তাকে সংশোধন ও অপসারণ করবেন। ২. রাষ্ট্র প্রধান নির্ধারণ করা একটি জাগতিক কর্ম এবং তা জনগণের কর্ম। জনগণের পরামর্শের ভিত্তিতে তা সম্পন্ন হবে। এ পরামর্শের ধরণ নির্ধারিত নয়। যুগ, দেশ ও জাতির অবস্থা অনুসারে তা পরিবর্তিত হতে পারে। যোগ্যতার মাপকাঠি রক্তসম্পর্ক নয় বরং তাকওয়া বা খোদাভীতি। কুরআন ও হাদীছে এ বিষয়ে অনেক বর্ণনা রয়েছে। সাহাবীগণ কুরআন ও হাদিসের নির্দেশনা অনুসারে এভাবেই বুঝেছিলেন। তারা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের ক্ষেত্রে মতভেদ করেছেন, তবে বিভক্ত হননি। রাসুলুল্লাহর (সা.) ওফাতের পরে রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাঁর বংশের কেউ কেউ আশা করতেন যে, হয়ত আলীকেই নির্বাচন করা হবে। আনসারগণ তাদের মধ্য হতে খলীফা নির্বাচনের বিষয়ে চিন্তা করেন। শেষ পর্যন্ত হযরত আবু বকর রা: কে খলীফা নির্বাচন করা হয় এবং হযরত আলীসহ সকল সাহাবী এতে একমত হয়ে যান।

ইসলামের বিশ্বজনীনতা অনুধাবনে অক্ষম, পূর্ববর্তী ধর্ম বা দেশীয় ব্যবস্থার প্রভাব বা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের আগ্রহে হযরত উসমানের সময় থেকে কিছু মানুষ প্রচার করতে থাকেন যে, ইসলামের রাষ্ট্র ব্যবস্থা জনগণতান্ত্রিক নয় বরং বংশতান্ত্রিক। ইসলামের ধর্মীয় বিধান ও অহীর নির্দেশনা মোতাবেক রাষ্ট্রক্ষমতা বা ইমামত আলী ও তার বংশধরদের পাওনা। তাদের বাদ দিয়ে যারা ক্ষমতা গ্রহণ করেছে তারা এবং তাদের অনুসারীগণ জালিম ও অহী অমান্যকারী। সর্বোপরি তারা দাবি করে যে, আলীর বংশের রাষ্ট্রক্ষমতা বা ইমামতে বিশ্বাস করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও ঈমানের রুকন। তাওহীদ ও রিসালতের বিশ্বাসের পরে বিশ্বাসের তৃতীয় রুকন হল আলী (রা.) ও তাঁর বংশের ইমামতের সাক্ষ্য দেয়া। এ ধরনের হাস্যকর ও বিকৃত চিন্তাধারা থেকেই শিয়ার উৎপত্তি। তাদের উক্ত বিশ্বাসগুলোকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে আরো অনেক মনগড়া বিশ্বাস জন্ম নেয় যা কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীদের জীবনাদর্শের বাইরে অন্য কোন মতবাদ সৃষ্টি করলে তা আল্লাহ পাকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

রাসুলুল্লাহর (সা.) ওফাতের পর মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব কেবল মাত্র হযরত আলী ও তার বংশধরদেরই প্রাপ্য। যারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন তারা অবৈধ শিয়াদের ইমামতের এ আকীদা কুরআনে কারীমে কোনভাবেই বিদ্যমান নেই। সাহাবীগণ কেউ তা জানেন না। স্বয়ং আলীও তা কখনো দাবি করেননি। কোন হাদীছেও তা স্পষ্ট নেই। কাজেই এ অভিনব বিশ্বাস প্রমাণ করতে তারা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে।

এক: তাফসীর বা ব্যাখ্যার পথ। আবদুল্লাহ ইবনে সাবাসহ শিয়াদের কিছু আলিম কুরআনের আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা করতেন। কখনো কখনো শানে নুযুলের কাহিনী, কখনো কোন মুফাস্সিরের বক্তব্য এবং কখনো তারা নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। সকল ক্ষেত্রে তারা কুরআনের মুতাওয়াতির বর্ণনার সাথে একক বর্ণনা, ব্যক্তিগত ঘটনা বা আভিধানিক ব্যাখ্যা সংযোজন করে আকীদার অংশ বানিয়েছেন।

লেখক: সেক্রেটারী, সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, স্টাডিজ-CRPS

দুই: যুক্তির পথ। আবদুল্লাহ ইবনু সাবা যুক্তি উপস্থাপন করে যে, পূর্ববর্তী সকল নবী স্থলাভিষিক্ত রেখে গিয়েছেন, কাজেই মুহাম্মদ (সাঃ) স্থলাভিষিক্ত না রেখে যেতে পারেন না। পরবর্তীতে অন্যান্য শিয়াগণ এরূপ অনেক যুক্তি পেশ করেছেন। এসকল উদ্ভট যুক্তির মাধ্যমে তারা অহীর অতিরিক্ত মনগড়া বিষয়কে আকীদার অংশ হিসেবে বানিয়ে নেন ।

তিন: কুরআন বিকৃতির দাবি। শিয়াগণ যে আকীদাকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে নিয়েছে তা কুরআনে কারীমে কোথাও নেই। বিষয়টি তাদেরকে সর্বদা পরাজিত করে। এজন্য তাদের অনেকেই দাবি করেন যে, মূল কুরআনে আলী ও তাঁর বংশধরদের বিষয়টি ছিল। তিন খলীফা ও সাধারণ সাধাবীগণ তা বিকৃত করেছেন।

চার: সাহাবীগণের বিচ্যুতির দাবি। রাসুলুল্লাহর (সা.) আজীবন সাহচর্যে লালিত সাহাবীগণকে কুরআনে কারীমে সফললকাম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে এসব উদ্ভট আকীদার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এজন্য শিয়াগণ সাহাবীগণকে সত্য বিচ্যুত ও ধর্ম বিচ্যুত বলে বিশ্বাস করে।

পাঁচ: সাহাবীদের মাধ্যমে প্রাপ্ত হাদীস অস্বীকার। যেহেতু শিয়াগণ সাহাবীগণকে সত্য বিচ্যুত বলে বিশ্বাস করে, সেহেতু তারা তাদের মাধ্যমে বর্ণিত কোন হাদিস সঠিক বলে স্বীকার করে না। বরং তারা তাদের নিজেদের সূত্রে রাসুলুল্লাহ (সা.) ও তাদের ইমামগণের থেকে কিছু কথা সংকলন করে সেগুলোকে হাদীস বলে আখ্যায়িত করে।

ছয়: তাকিয়্যা বা আত্মার তত্ত্ব আবিস্কার । শিয়াগণ যাদেরকে ইমাম বলে দাবি করে তারা মুসলিম সমাজের মূলধারার সাথে বাস করেছেন। আলী (রা.) তিন খলীফার খিলাফত স্বীকার করেছেন। তাদের প্রশংসা করেছেন। অনুরূপভাবে তার বংশধরগণও। এগুলোকে বাতিল করার জন্য শিয়াগণ তাকিয়্যা বা আত্মার জন্য মিথ্যা বলার তত্ত্ব আবিস্কার করে। তারা দাবি করে যে, আলী ও ইমামগণ আত্মার জন্য মিথ্যা বলতেন।

সাত: ব্যক্তির নির্ভুলতা এবং বিশেষ জ্ঞান দাবির পথ। শিয়া বিভ্রান্তির অন্যতম দিক রাসুলুল্লাহর পরে অন্য অনেক মানুষের নির্ভূলতা এবং আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে বিশেষ জ্ঞান লাভের প্রচার। তারা প্রচার করে যে, কুরআন- হাদিস সবকিছু নেই। এছাড়া কুরআন-হাদিস যা আছে তা বুঝতেও আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক ও বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন। এরূপ জ্ঞান শুধু শীয়া ইমামগণ ও তাদের প্রতিনিধিদেরই রয়েছে। কাজেই তারা যা কিছু বলবে সবই অহীর জ্ঞান হিসেবে গণ্য এবং আকীদার ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হবে। এভাবে অগণিত কুসংস্কারকে তারা আকীদা বলে চালিয়ে দেয়।

আট: জালিয়াতির পথ। রাসুলুল্লাহ (সা.) ও ইমামগণের নামে অগণিত জাল হাদীস, জাল গল্প ও কাহিনী রটনা করা এবং সেগুলোর মাধ্যমে নিজেদের উদ্ভট ও মনগড়া আকীদাগুলো সত্য প্রমাণ করা শিয়াগণের অতি পরিচিত বৈশিষ্ট্য।

সময়ের পরিক্রমায় শিয়া সম্প্রদায় অনেক উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। শিয়াদের মধ্যে চরমপন্থী ও মধ্যমপন্থী দুটো গ্রুপই দেখা দেয়। চরমপন্থীরা খুবই মারাত্মক। তারা ইসলামের ব্যাপারে যে বাড়াবাড়ি করে অনেক কাফির-মুশরিকদের মাঝেও তা দেখা যায় না। বর্তমানে বিদ্যমান শিয়াগণের মধ্যে সবচেয়ে বড় দল দ্বাদশ ইমামপন্থী বা ইমামী শিয়াগণ। ইরান, ভারত, বাংলাদেশ ও অন্যান্য দেশের অধিকাংশ শিয়া এদলের। এদের আকীদাগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ।

দ্বাদশ ইমামপন্থী শীয়াগণ

১. ইমামতের বিশ্বাস: তাদের মতে, আলী (রা.) ও তার বংশের ১২ জনের ইমামতের বিশ্বাস ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের মতে, ইমামত নস্ বা সুস্পষ্ট নির্দেশের মাধ্যমে নির্ধারণ হতে হবে। এখানে ইজতিহাদ, শূরা বা পরামর্শের কোন সুযোগ নেই। পূর্ববর্তী ইমাম যাকে ইমাম হিসেবে নির্ধারিত করবেন তিনিই ইমাম। তাদের বিশ্বাসানুসারে ১২ ইমাম হলেন ঃ

১. আলী রা (২৩ পূর্ব হিজরী-৪০ হিজরী)
২. হাসান ইবনু আলী রা: (৩-৫০ হি.)
৩. হুসাইন ইবনু আলী (৪-৬১ হি.)
৪. যাইনুল আবেদীন আলী ইবনু হুসাইন (৩৮-৯৫ হি.)
৫. মুহাম্মদ আলী বাকির ইবনু যাইনুল আবেদীন (৫৭-১১৪ হি)
৬. জা'ফর আস সাদিক ইবনু মুহাম্মদ বাকির (৮৩-১৪৮হি.)
৭. মুসা কাযিম ইবনু জাফর সাদিক (১৪৮-২০৩হি.)
৮. আলী রিযা ইবনু মুসা কাযিম (১৪৮-২০৩ হি.)
৯. মুহাম্মদ জাওয়াদ ইবনু আলী রিযা (১৯৫- ২২০ হি.
১০.আলী হাদী ইবনু মুহাম্মদ জাওয়াদ (২১২-২৫৪)
১১.হাসান আসকারী ইবনু আলী হাদী (২৩২-২৬০হি.)
১২. মুহাম্মদ মাহদী ইবনু হাসান আসকারী (২৫৬ হি.-)

২. ইসমতের বিশ্বাস: তারা বিশ্বাস করে যে, দ্বাদশ ইমাম সকল পাপ ও ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিষ্পাপ ও সংরক্ষিত।

৩. ইলম'র বিশ্বাস: তারা বিশ্বাস করে যে, ইমামগণ রাসুলুল্লাহ এর থেকে 'সিনায় সিনায়' ইমাম পরম্পরায় এবং আল্লাহর পথ থেকে ইলহাম, ইলম লাদুন্নী ও বিশেষ সম্পর্কের মাধ্যমে অলৌকিক ও গাইবী জ্ঞানপ্রাপ্ত।

৪. গাইবাহ বা অদৃশ্য হওয়ায় বিশ্বাস: তারা বিশ্বাস করে যে, তাদের দ্বাদশতম ইমাম অদৃশ্য হয়ে আছেন। তিনি অদৃশ্য থেকেই বিশ্ব পরিচালনা করছেন।

৫. ইমামগণের মু'জিযায় বিশ্বাস: তারা বিশ্বাস করে যে, ইমামগণ অলৌকিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তারা অলৌকিক কর্ম করতে পারেন এবং করেন। এগুলোকে তারা মু'জিযা বলে।

৬. রাজআত বা প্রত্যাবর্তন: তারা বিশ্বাস করে যে, দ্বাদশ ইমাম মুহাম্মদ মাহদী শেষ যামানায় ইমাম মাহদী রূপে ফিরে আসবেন।

ইসমাঈলিয়া বাতেনীয়া শিয়া: শিয়া সম্প্রদায়ের অনেক উপদলের একটি ইসমাঈলিয়া সম্প্রদায়। আমরা দেখেছি যে, দ্বাদশ ইমামপন্থী ইমামী শিয়াগণ বিশ্বাস করে, হযরত আলী বংশের ৬ষ্ঠ ইমাম জাফর সাদেক (৮৩-১৪৮ হি.) পরে তার কনিষ্ট পুত্র মুসা কাযিম (১৪৮-২০৩হি.) ইমামতি লাভ করেন। কিন্তু ইসমাঈলিয়া শিয়াগণ বিশ্বাস করে যে, জাফর সাদিকের পরে ৭ম ইমাম জাফর সাদিকের জৈষ্ঠ্য পুত্র ইসমাইল (১৪৮ হি.) ছিলেন প্রকৃত ইমাম। তাঁর পরে এ ইমামত তার সন্তানদের মধ্যে অব্যাহত থাকে। এদেরকে ইসমাঈলিয়া বাতেনিয়া সম্প্রদায় বলা হয়।

যাঈদিয়া শিয়া: শিয়াগণের মধ্যে আকীদা বিশ্বাসে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের কাছাকাছি ফিরকা যাইদীয়া শিয়াগণ। বর্তমান ইয়ামানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এ মতের অনুসারী। যাইদীয়া শিয়াগণ নিজেদেরকে ইমাম যাঈদের (৭৯-১২২হি.) অনুসারী বলে দাবি করেন। যাঈদ ছিলেন ১২ ইমামপন্থী শিয়াগণের ইমাম যাইনুল আবেদীনের পুত্র ও ইমাম মুহাম্মদ বাকিরের ভাই। তিনি একজন বড় আলিম ছিলেন এবং বিশ্বাস ও কর্মে আহলে সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। ইমাম আবু হানিফা ও অন্যান্য সকল প্রসিদ্ধ তাবেয়ী-তাবে তাবেয়ী তাকে ভালবাসতেন এবং শ্রদ্ধা করতেন। তিনি উমাইয়া শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। যাঈদী শিয়াগণ বিশ্বাস করে যে, ১. ইমামত ও রাষ্ট্র ক্ষমতার অগ্রাধিকার ফাতিমার রা: বংশধরদের। ২. ইমামত বা রাষ্ট্র ক্ষমতার জন্য অহী বা পূর্ববর্তী ইমামের সুস্পষ্ট নির্দেশের প্রয়োজন নেই, বরং ফাতিমার বংশের যে কোন ব্যক্তি যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়ে ইমাম হবেন। ৩. ফাতিমার বংশের যোগ্য ব্যক্তির অবর্তমানে অন্য বংশের মানুষ বা কম যোগ্য মানুষ খলীফা হলে তা বৈধ হবে। ৪. প্রথম খলীফা আবুবকর ও উমারের মর্যাদায় বিশ্বাস। ৫. তৃতীয় খলীফা উসমান ইবনু আফফানের খিলাফতে বিশ্বাস। তবে তাদের অনেকে তার সম্পর্কে কিছু ভুল-ভ্রান্তির কথা বলে। ৬. সাধারণভাবে সকল সাহাবীকে ভাল বলা এবং গালি না দেয়া। ৭. তারা তাকিয়্যাতে বিশ্বাস করেন না। ৮. তাদের মতে, ইমাম গুপ্ত বা লুকায়িত থাকতে পারেন না। ৯. তারা ইমামগণের ইমামত বিশ্বাস করে না । তবে কেউ কেউ আলী, ফাতিমা, হাসান ও হোসাইন এ চারজনের ইমামতে বিশ্বাস করেন। ১০. ফিকহী বিষয়ে যাঈদী ফিকহ হানাফী ফিকহের সাথে মিল রাখে।

সাবাইয়্যা শিয়া: আবদুল্লাহ ইবনে সাবার অনুসারীকে সাবাইয়া বলা হয়। সে ছিল হীরা দেশের নাগরিক। সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তার মা এক কালো দাসী। এ কারণে তাকে ইবনুস সাওদাও বলা হতো। মুসলমানদের তৃতীয় খলীফা উসমানের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারীদের মধ্যে সে ছিল অন্যতম। ক্রমান্বয়ে সে মুসলমানদের মাঝে তার চিন্তা-চেতনা প্রচার করে। তার মূল বিষয় ছিল, সে তাওরাত কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলত, প্রতি নবীর একজন অছী বা প্রতিনিধি হয়ে থাকে। আলী মুহাম্মদ (সা.) এর অছী ছিলেন আর তিনি উত্তম অছী। সে আরো বলত যে, মুহাম্মদ (সা.) দুনিয়াতে পুনরায় আসবেন। আরও প্রচার করত যে, আলী ইলাহ। আলী তার এসব ভ্রান্ত মতবাদ প্রচার করার কারণে তাকে হত্যা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস নিষেধ করেন এবং বলেন, তাকে যদি আপনি হত্যা করেন তার অনুসারীরা আপনার বিপক্ষ হয়ে যাবে। ফলে তাকে মাদায়েনে বিতাড়িত করা হয়। আলীর ইন্তেকালের পর সে প্রচার করে যে, মৃত ব্যক্তি আলী নয়: সে শয়তান। মানুষের সামনে তার দৃশ্য অবলম্বন করে। আলীকে আকাশে উঠানো হয় যেভাবে ঈসা বিন মরিয়মকে উঠানো হয়। আকাশের গর্জন আলীর কণ্ঠ, বিজলী তার হাসি। আলী আকাশ থেকে নেমে গোটা পৃথিবীর মালিক হবেন। সাবায়ী গ্রুপের অনেকে বলে, আল্লাহ আলীর ভিতরে প্রবেশ করেছেন এবং তার পরবর্তী ইমামদের ভেতরে আল্লাহ প্রবেশ করেন। এধরনের মতামত প্রাচীন ধর্মে ছিল।

সমাপ্তি কথা: শিয়া একটি রাজনৈতিক ফিরকা। কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবীদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত এ ফিরকা জাহেলি যুগের কতিপয় ধ্যান-ধারনাকে ইসলামের সাথে মিশিয়ে বিভ্রান্তির অতল তলে তলিয়ে আছে। তাদের যুক্তি-তর্ক ও কর্মতৎপরতা মনগড়া ও পৌত্তলিকতা প্রভাবিত। কতিপয় স্বার্থান্বেষী ইহুদি-খৃষ্টান-মুনাফিক ও অগ্নি পূজারির দল ইসলাম ধর্মে অনুপ্রবেশ করে শয়তানি চক্রান্ত বাস্তবায়ন করেছে শিয়া নামে আলীর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে। যারা ইসলামের মুল তাওহীদ, রিসালত ও আরকানুল ঈমানে বিশ্বাস করে বলে দাবি করেন, এর সুস্পষ্ট বিপরীত কোন বিশ্বাস পোষন করেন বলে দাবি না করেন, ইসলামের সর্বজন পরিজ্ঞাত অত্যাবশ্যকীয় কোন বিষয় অস্বীকার করেন না অথচ তাদের নিজেরদের স্বীকৃত বিশ্বাস বা আকীদার মধ্যে এমন বিষয় রয়েছে যা কুরআন-হাদীসে নেই বা রাসুলুল্লাহ থেকে ও সাহাবীগণ থেকে সুপরিজ্ঞাত বিশ্বাসের ব্যতিক্রম তাদেরকে বিভক্ত ও বিভ্রান্ত ফিরকা বলে। এদের মধ্যে শিয়া হলো একটি বৃহত্তম দল। আর যারা তাদের বিশ্বাস -আকীদায় রাসুলুল্লাহ (সা.) ও তার সাহাবীগণের হুবহু অনুসরণ করেন, তারা যা বলেছেন তা বলেন এবং তারা যা বলেননি তা আকীদার মধ্যে সংযোগ করেন না, তাদের মুখের দাবি তাদের বাস্তব কর্ম ও স্বীকৃত আকীদা বিশ্বাস দ্বারা প্রমাণিত হয় তাদেরকে সঠিক মুসলমান তথা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামায়াত বলে মনে করতে হবে। বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আলোচিত রাষ্ট্র ইরান শিয়া অধ্যুষিত। এখানে শিয়ারা তাদের কথিত ইসলামী হুকুমাত কায়িম করেছে। তারা বলিষ্ট ও কর্মঠ জাতি। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি যেমনি ইসলামী তেমনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্বারা লালিত। গত চার বছর ধরে মধ্যপ্রাচ্যে সিরিয়া ও ইয়ামেন ইস্যুতে শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্ব মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ইরান তাবেদার আসাদ সরকারকে রক্ষা করার জন্য কম্যুনিস্ট রাশিয়ার সহযোগিতায় সিরিয়ার সুন্নী জনগণের উপর গণহত্যা চালাচ্ছে। মার্কিন-রাশিয়া-ইসরাঈলের ইন্ধনে ইরাকের সাধারণ মুসলমানদের পাশবিক কায়দায় নির্বিচারে গুলি করছে। আমাদের দেশেও কিছু কিছু স্থানে স্বল্প সংখ্যক শিয়া ফিরকা দেখা যায়। বিশেষ করে পুরান ঢাকার হোসনী দালান কেন্দ্রিক ১০ মহররম তাদের বিশেষ ধর্মীয় তৎপরতা তাজিয়া মিছিল সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, যখন শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্ব-সংঘাত পরিলক্ষিত হবে তখন মুসলিম উম্মাহকে সঠিক অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে তাবৎ অপশক্তির চক্রান্ত মুকাবিলা করে খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শকে সমুন্নত রাখতে হবে। আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লা আমাদেরকে সে তৌফিক দান করুন। আমীন।

বাংলা অঞ্চলে হাদিস চর্চার ইতিহাস

মো: আব্দুল আজিজ*

ভূমিকা:

হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসুল ছিলেন। সাথে সাথে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষও ছিলেন। এই জন্য রাসুল (সা.) এর জীবনের কার্যাবলী যা তিনি নবী ও রাসুল পদের দায়িত্ব পালন করার জন্য করেছেন। এসকল কাজ আল্লাহর নিয়ন্ত্রনাধীনে সম্পাদিত হয়েছে। যেমন আয়েশা (রাঃ) এর কাছে জানতে চাওয়া হয় রাসুল (সা.) এর চরিত্র সম্পর্কে তখন আয়েশা বললেন "রাসুল (সা.)এর চরিত্র হল আল-কুরআন" তাহলে বুঝতে পারি যে রাসুল (সা.) হলেন জীবন্ত আল-কুরআন। সুতরাং আল-কুরআন বুঝার জন্য রাসুল (সা.) এর হাদিসের বিকল্প নেই। আমরা জানি যে, সাহাবীগণ হাদিস চর্চা ও প্রচারকল্পে সুদূর দামেশক চলে যেতেন । দূরপ্রাচ্য চীনে পাড়ি জমাতেন এবং রাসুল (সা.) এর হাদিস অবিকল-হুবহু সংরক্ষণ ও প্রচার প্রসার করার জন্য কঠোর সাবধানতা অবলম্বন করতেন। এমনিভাবে মুসলিম উম্মাহ যুগ-যুগান্তরে হাদিস চর্চাকে কল্যাণকর, পূণ্যময় ও ইবাদত মনে করতেন। তারই ধারাবাহিকতায় রাসুলের (সা.) সাহাবীগণ ও তৎপরবর্তী মুসলিমগণ রাসুলের (সা.) বাণী বুকে ধারণ করে বাংলা অঞ্চলে হাদিস চর্চা শুরু করেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় ৭ম শতাব্দির গোড়ার দিকে এই অঞ্চলে ব্যক্তি কেন্দ্রীক হাদিস চর্চা শুরু হয়। নিদেনপক্ষে রাষ্ট্রীয়ভাবে ১৩শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে হাদিসের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। পরবর্তীতে শাহজালাল ইয়ামানী (রা.) সিলেটে, শেখ নূর কুতুব পশ্চিম বঙ্গের পারুয়ায়, হাজী শরীয়তুল্লাহ (রা.) শরীয়তপুরে এভাবে অসংখ্য মুহাদ্দিসদের অক্লান্ত পরিশ্রমে যুগ যুগ ধরে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে হাদিস চর্চা চলতে থাকে। বৃটিশ আমলের মাঝামাঝি সময়ে হাদিস চর্চা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলেও কলকাতা আলিয়া ও দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়ে তা প্রতিরোধ করে। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে, যার প্রভাবে বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও হাদিসের উচ্চতর গবেষণা হয়।

বাংলা অঞ্চলে হাদিস চর্চার প্রাচীণ কাল (৬৯১-১৮৯৯) :

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। এ দেশে হাদিসে নববীর চর্চা অতীব প্রাচীন। ত্রয়োদশ শতাব্দির গোড়াতেই এ ভূখন্ডে মুসলিম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। সে থেকে সুদীর্ঘ সাড়ে ছ'শ বছর হাদিস চর্চা ব্যাপক রুপ লাভ করে। পলাশি ট্রাজিডির পরও এর গতি একেবারে থেমে যায়নি। বৃটিশ শাসনামলেও হাদিস চর্চা এ জনপদের মুসলিম মিল্লাতকে উজ্জীবিত রাখে। ইসলামের সূচনা কাল থেকে বাংলা অঞ্চলে হাদিস চর্চা শুরু হয়, তা দেখতে পাই ১৯৯৩ ইং সালে কুড়িগ্রামের মজদেরআরা নামক এলাকায় আবিষ্কৃত মসজিদটির ফলকে আরবি সংখ্যায় লিপিবদ্ধ আছে ৬৯ হিজরী সন।

এই হিসাবে মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাসূল (সা.) এর ওফাতের মাত্র ৫৮ বছর পরে। এর থেকে বুঝা যায় যে, বাংলাদেশে সেই যুগ থেকে হাদিসে রাসুল (সা.) এর চর্চা কত ব্যাপক আকারে হয়েছিল ।

সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ হতে বাংলা অঞ্চলে হাদিস চর্চা শুরু হয়। মহানবী (সা.) এর সাত লক্ষ হাদিসের বিশাল বহর আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগরের বুক চিরে গতিশীল বেগে চট্টগ্রাম বন্দরে অবতরণ করে। তখন নবীপ্রেমী ও হাদিস চর্চাকারী ওলামায়ে কেরাম তা বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌছানোর পবিত্র দায়িত্ব গ্রহন করেন।

ডঃ এনামুল হক, ডঃ দানি, ডঃ আব্দুর রহিম, ডঃ মহর আলী মত প্রকাশ করেন যে, ৭ম শতকের প্রথমার্ধে সাহাবী আবু ওয়াক্কাছ (রা.) ও তাঁর সাথীদের মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামের আগমন হয়। ইতিহাসবিদগন তিন জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করেন।

(১) কাইছ ইবনে খুজামাহ (২) উরওয়া ইবনে আসাসা (৩) আবু ক্বাইছ ইবনে হারিছ।

তাঁরা আবিসিনিয়া হিজরত করার পর স্বদেশ মক্কায় না গিয়ে চীন দেশের উদ্দেশে অভিযাত্রা করেন। যাত্রা পথে বিশ্বের প্রাচীন ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা বন্দর নগরী চট্টগ্রামে যাত্রা বিরতি করেন। তাঁরা চট্টগ্রাম ও তাঁর পার্শ্ববর্তী এলাকা শীকলবাহা ও সন্দ্বীপে দ্বীন প্রচারের উদ্দেশে রাসুল (সা.) এর অনুসারী খোজেন। ৩ আরব দল এবার কিন্তু ব্যবসার উদ্দেশে পণ্য নিয়ে বের হয়নি, বরং ইসলাম এবং দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যই মূল লক্ষ্য ছিল। তারাই বাংলাদেশের প্রথম হাদিসের শিক্ষক হিসাবে বেশ কিছুদিন হাদিস শিক্ষা দানের পর পাল তোলা নৌকাযোগে সুদূর চীন দেশে হাদিস চর্চার উদ্দেশে পাড়ি দেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, চীনের ক্যান্টন শহরে আবু ওয়াক্কাছ (রা.) এর কবর এখনো বিদ্যমান রয়েছে। এই হিসাবে বাংলাদেশের হাদিস চর্চার গোড়াপত্তন হয় ৭ম শতকে। ১৩ শতকের গোড়ার দিকে এখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতেয়ার খিলজী বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদিস চর্চার ব্যাপক প্রচার-প্রসার হয় । বাংলাদেশের হাদিস চর্চার আনুষ্ঠানিক স্থপতি শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ বাংলার তৎকালীন সোনারগাঁয়ে ১২৭০ সালে বিরাট মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমে ব্যাপক ভাবে হাদিস চর্চা হয়। মোগল সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত লালবাগ দুর্গ এলাকায় মাদ্রাসা ছিল সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মাদ্রাসা ।

---

* ছাত্র, ৭ম সেমিস্টার, সাইন্সেস অব হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিস, আই আই ইউ সি।

* অন্য দিকে যে বিশিষ্ট দা'য়ীগণ বাংলায় এসে ইসলাম প্রচার ও হাদিস চর্চায় ব্যাপক প্রচার চালান। তাদের মধ্যে ১৩৫০ খ্রিঃ শাহ জালাল ইয়ামেনী (রহ.) ৩০০ জন অনুসারী নিয়ে বৃহত্তর সিলেটে ইলমে হাদিসের ব্যাপক প্রচার-প্রসার করেন। উল্লেখ্য যে, তাদের মধ্যে অনেকেই খ্যাতনামা মুহাদ্দিসও ছিলেন।

* ১৩৯০ খ্রিঃ বাহারুল হাদিস শেখ নুর কুতুব পশ্চিম বঙ্গের পাবুয়ায় ব্যাপক হাদিস চর্চার ব্যাবস্থা করেন। দক্ষিন বাংলার খুলনা ও বাগেরহাটে খান জাহান আলী (রহ.) ১৪৪০ খ্রিঃ আগমন করেন। তিনি দ্বীনি দা'ওয়াতের প্রেরণা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বলে হাদিসের ব্যাপক প্রচার-প্রসার করেন।

* শায়খ আখি সিরাজ বাঙ্গালী হাদিস পঠন-পাঠনের মাধ্যমে ব্যাপক খেদমত করেন। তিনি হাদিস গ্রন্থ "মাশারেকুল আনওয়ার এর হাফেজ ছিলেন। বাংলায় হাদিস চর্চার দিকপাল হাজী শারীয়তুল্লাহ (রহ.) কলকাতায়, অত:পর বিশ্বের অন্যান্য হাদিস কেন্দ্রের অন্যতম স্থান মক্কায় ২০ বছর পর্যন্ত হাদিসে রাসুলের অধ্যাবসায়ের পর মাতৃভূমি শরীয়তপুর-এ ইলমে হাদিস এর বিরাট খেদমত করেন।

* শায়খ মজদুদ্দীন ওরফে মোল্লা মদন শাহ জাহানপুরী হাদিসে রাসুলের প্রোজ্জ্বল মিনারা ছিলেন। ১৭৮০খ্রিঃ কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা তারই প্রচেষ্টায় বৃটিশ সরকারের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় তিনি মিশকাত শরীফ পাঠ দান করতেন।

* সুলতান আলাউদ্দিনের শাসনামলে ১৪৯৯-১৫২১ খ্রিঃ হাদিসের বাংলার পুরোধা ছিলেন শায়খ মুহাম্মদ ইবনে এয়াযদুন বখশ বাঙ্গালী। তিনি স্বহস্তে বুখারী শরীফ লিপিবদ্ধ করেন এবং এক কপি সোনারগাঁয় হাদিয়া দেন। যে কপিটি ভারতের পাঠনা এলাকার বাংকিপুর লাইব্রেরীতে এখনো সংরক্ষিত আছে।

প্রকাশ থাকে যে, বাংলায় হাদিস চর্চার প্রথম স্তরে কুতুবে সিত্তাহ'র চর্চা অপেক্ষা মাশারেকুল আনওয়ার ও মিশকাত শরীফের চর্চা বেশি হতো। বলা বাহুল্য, ১৭৮০ ইং সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্টা করা হলেও সরকারী দখলদারিত্বের কারণে পূর্ণ ১০০ বছর পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য তেমন কোন খেদমত হয়নি বটে, কিন্তু পরবর্তীতে কলকাতা আলিয়া ,তার পর ঢাকা আলিয়া হতে হাদীসে রাসুলের (সা.) ব্যাপক চর্চা হয়েছে। কলকাতা আলিয়ায় ১৯০৭ সাল পর্যন্ত মিশকাতুল মাসাবীহ এর দারস চলত। অত:পর দীর্ঘ বিশ বছর পর পর্যন্ত হাদিস ও তাফসীর পাঠদান স্থগিত থাকার পর ১৯২৮ ইং হতে কুতুবে সিত্তার দারস আরম্ভ হয়।

* ১৮৬৬ ইং সালে ভারতে সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে, সৈয়দ আহমদ বেরলভী ও শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) এর চিন্তা-চেতনাকে লালন করার জন্যে এবং জিহাদী প্রেরণাকে উজ্জীবিত ও জাগ্রত রাখার উদ্দেশ্যে হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসিম নানুতভী (রহ.) এর নেতৃত্বে দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই দারুল উলুম দেওবন্দ চারটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠা হয়। (১) নির্ভেজাল তাওহীদ (২) অতিরঞ্জনবিহীন রিসালাত (৩) বিশুদ্ধ মা'রিফাত ও(৪) ইসলামের প্রচার ও প্রসার। এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠার পর পরই তার আদলে দেশ-বিদেশে বহু ক্বাওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই দারুল উলুম দেওবন্দ ভারতের মাটিতে প্রতিষ্ঠা হলেও এর শাখা-প্রশাখা বাংলাদেশের হাদিস চর্চার মূল চালিকা শক্তি। দারুল উলুম দেওবন্দ ইলমে হাদিসের আকাশচুম্বী মিনারা (১) হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা রশীদ আহমদ গাঙ্গহী (রহ.) (২) হযরত হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) (৩) শায়খুল হিন্দ হযরত মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহ.) (৩) আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) প্রমূখের বাংলাদেশী শিষ্যরাই এখানে ব্যাপক ভাবে হাদিস চর্চার উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

হাদিস চর্চার বর্তমান কাল:-১৯০০-২০১৬ইং:

এ স্তরটির প্রথম ১০০ বছরকে বাংলাদেশে হাদিস চর্চার সোনালী যুগ বলা চলে। এ স্তরে ব্যক্তি অপেক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক কেন্দ্রেই উৎপত্তি ও বিকাশ লাভ করে। বর্তমানে বাংলাদেশে দুই ধরনের হাদিস চর্চা হয়। (১) প্রাতিষ্ঠানিক (২) অপ্রাতিষ্ঠানিক

১। প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক হাদিস চর্চা হয় তিন ধরণের :

* আলিয়া ধারায় প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা সমূহ।
* ক্বাওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা সমূহ।
* বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি, কুরআন, হাদিস, দা'ওয়া ও ইসলামিক ষ্ট্যাডিজ বিভাগ সমূহ।

আলিয়া ধারায় প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা :

১৭৮০ সালে তৎকালীন বড় লাট ওয়ারেন্ট হেস্টিংস্ কর্তৃক কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা বৌবাজারে স্থাপিত হয়। ১৯০৭ সালে কামিল শ্রেণী পর্যন্ত হাদিস চালু করা হয়। ১৮৭৪ সালে কলকাতা আলিয়ার আদলে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে তিনটি মাদ্রাসা (বর্তমানে ফাযিল পর্যন্ত) স্থাপন করা হয়। এগুলো ছিল প্রথম সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান গুলো মুহসেনিয়া মাদ্রাসা নামে পরিচিত চার দশক ধরে (১৮৭৪-১৯১৫) এ প্রতিষ্ঠানগুলো হাদিস শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ অবদান রাখে। ১৯১৫ সালে মাদ্রাসায় নিউস্কিম পদ্ধতি চালু হয়। এ পদ্ধতি অনুযায়ী যারা হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় পাশ করে, তারা শিক্ষার ম্যাট্রিকুলেশন এর সমমান সনদ অর্জন করে। ১৯৪৭ সালে পূর্ব পর্যন্ত বাংলায় প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা সমূহ 'সেন্ট্রাল বোর্ড এর মাদ্রাসা একজামিনেশন, কলিকাতা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতো। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা জিয়াউল হক (রহ.) ও তাঁর সহকর্মীদের প্রচেষ্টায় মাদ্রাসাটি তার বিরাট লাইব্রেরীসহ ঢাকায়

স্থানান্তরিত হয়। ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মাদ্রাসার আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে ঢাকায় মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সরকার অনুমোদিত সকল মাদ্‌রাসা উক্ত বোর্ডের অধীনে চলে যায় ।

কওমী ধারার মাদ্রাসা:

উনবিংশ শতাব্দির শেষ পর্যায়ে এবং বিংশ শতাব্দির সূচনালগ্নে সারা বাংলাদেশে দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার হিড়িক পড়ে যায় এবং হাদিস চর্চায়ও নব জাগরণের সূচনা হয় । বলতে গেলে বিংশ শতাব্দীই হচ্ছে সামগ্রিক ভাবে সারা বাংলাদেশে হাদিস চর্চার সোনালী যুগ। এ শতাব্দিতে হাদিস চর্চা সারা দেশে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এর কারণ হল বৃটিশের পতনের পদধ্বনী মুসলমানদের জন্য আলাদা ভূখন্ডের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের প্রত্যাশা এবং র্সবোপরি দু'টি মাদ্রাসা তথা দেওবন্দ ও কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার সনদধারী কৃতি শিক্ষার্থীরা সারা দেশে হাজার হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বিশেষ করে হাটহাজারী দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম মাদ্রাসা ও দারুল উলুম আলিয়া মাদ্রাসার ভূমিকা ছিল অন্যতম। বাংলাদেশের অনেক ক্বাওমী মাদ্রাসা আছে যেখানে দাওরায়ে হাদিসে কতুবে সিত্তার পঠন-পাঠন চলছে পুরোদমে। উভয় ধারা থেকে অনেক বড় বড় আলেম খ্যাতিমান-ক্ষণজন্মা ও আলোকিত মানুষ সৃষ্টি হয়েছে ও হচ্ছে।

*এভাবে আলিয়া ও ক্বাওমী ধারার আলিমগন লেখনির মাধ্যমে হাদিসের উল্লেখযোগ্য খেদমত করেছেন।

১। সৈয়দ মুফতি আমীমুল ইহসান (রহ.) রচিত "ফিকহুস সুনান ওয়াল আছার" একটি কালজয়ী গ্রন্থ।

২। মাওলানা আব্দুর রহীম (রহ.) এর "হাদীস সংকলনের ইতিহাস"।

৩। মাও:আবুল হাসান (রহ.) কর্তৃক রচিত "তানযীমুল আশতাত"।

৪। মাও: রফিক আহমদ সাহেবের "ঈযাহুল মিশকাত"।

৫। বাঁশখালীর আবু ওসমান মুহাম্মদ ছলীমুর রহমান (রহ.) এর তা'লীক্বাতুল ক্বামারী শরহে বুখারী এবং নাসায়ী ও শামায়েলে তিরমিযীর শারহ।

৬। নোয়াখালীর আল্লামা ফজলুল করীম "তাক্বরীরে সহীহ বুখারী"।

আরো অনেক হাদিসের গ্রন্থ অনুবাদ ও শারহ লিখেছেন এদেশের আলেমগন।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে হাদিস চর্চা: বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে হাদিস চর্চা দু'ধরনের (১) সরকারী (২) বেসরকারী ।

সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়: ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীসহ বিশ্ববিদ্যালয় গুলোতে আরবী ও ইসলামিক ষ্ট্যাডিজ আছে। শুধু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়াতে কুরআন, হাদিস, দাওয়া, ফিকুহ ইত্যাদি বিভাগে ইলমে হাদিসের ব্যাপক খেদমত হচ্ছে। অপর দিকে বর্তমান সরকার ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশের ৩১টি মাদ্রাসায় হাদিসের উপরে অনার্স প্রোগ্রাম চালু করেছেন এবং আরো প্রায় ৭০টি মাদ্রাসায় হাদিস বিষয়ে অনার্স প্রোগ্রাম প্রকিয়াধীন, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের হাদীস চর্চার ব্যাপক খেদমত হবে ইনশাল্লাহ ।

বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়: দেশের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯২টি তার মধ্যে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম, দারুল ইহসান, বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকাসহ আরো কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শরীয়া অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে পাঠ্যসূচিতে হাদিস অন্তর্ভূত রয়েছে। আর্ন্তজাতিক ইসমলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামে হাদিসের উপরে অনার্স কোর্স চালু করেছে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদিসের পাঠ্যসূচির আলোকে যাতে করে ক্রেডিট ট্রান্সফার করে এখান থেকে বিশ্বের যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স শেষ করা যায়।

উপসংহার :

বাংলাদেশের হাদিস চর্চার গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিহাস এবং বর্তমানে হাদিস প্রচার-প্রসারের উদ্দেশ্যে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে গবেষণামূলক কার্যক্রমে সরকারী ও বেসরকারী মাদ্রাসা গুলোর গতিশীল পদক্ষেপসমূহ ও ওলামা মাশায়েখের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক উদ্যোগ পর্যালচনান্তে এ বিষয়ে সচেতন নাগরিক হিসাবে হাদিসের উজ্জ্বল ও সম্ভবনাময় ভবিষ্যতের সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখতে পাই।

বিজ্ঞান ও জীবন দর্শন

ফয়জুল্লাহ নোমানী*

এটা প্রায়ই খুব গর্ব করে দাবি করা হয়, একুশ শতকে মানুষ অনেক এগিয়ে গেছে, অনেক উন্নত হয়েছে, তবে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে "এগিয়ে যাওয়া" কিংবা "উন্নতি"এই শব্দগুলোর অর্থ খুব একটা পরিষ্কার না, এই শব্দগুলো খুবই বিমূর্ত অর্থ প্রকাশ করে। যার চোখে যেমন লেন্স সে ঠিক তেমনই দেখে। বর্তমান সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতিকেও অনেক বড় উন্নতি হিসেবে দেখা হয়। আমাদেরকে বইতে বোঝানো হয়েছে যে উন্নত দেশ হল আমেরিকা, ব্রিটেন- কারণ হিসেবে বুঝেছি সেখানকার লোকজন হরদম এসির বাতাস খায়, গাড়িতে আর প্লেনে চলে, উচু বিল্ডিং এ থাকে তবে এসির বাতাসে যতই অপকর্ম হোক, সেটা উন্নতির সংজ্ঞাকে বাধাগ্রস্থ করছে না। আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবিরা উন্নত বলতে বুঝিয়ে থাকেন পশ্চিমা দেশগুলোকে কারণ সেসব দেশে আছে "গণতন্ত্র", "ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ", "liberalism", "ফ্রিডম", "বাকস্বাধীনতা"," "জেন্ডারইকুয়ালিটি", এসব থাকা সত্ত্বেও হয়ত সে দেশটি চরম ভাবে অনাচার আর পাপাচারে লিপ্ত।

উত্তর আমেরিকা ওরফে ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকা। অজ্ঞাত কারণে কথিত বুদ্ধিজীবিরা এ ব্যাপারগুলোকে এড়িয়ে যান যদিও তারা জানেন, এগুলো কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। মানুষ, তার চিন্তাচেতনা এবং কাজকর্ম সমাজেরই প্রোডাক্ট। ব্রিটেনের ধর্মনিরপেক্ষ উদারপন্থী সমাজে দিনে হাজার খানের ধর্ষণ হয়, পারিবারিক বন্ধন সেইসব দেশে হুমকির মুখে, আমেরিকার মত জায়গায় প্রচুর বেকার আর এডিক্টেড ছেলেমেয়ে; চারিত্রিক অধপতন তো আছেই। সেখানে ফ্রিডম অফ স্পিচ এর ভাল প্র্যাকটিস হয়? "ফ্রিডম অফ ইনসাল্টে", জাতিসংঘে যখন রেসিজমেরবিরুদ্ধে কনফারেন্স করে তখন ইসরায়েলের অপকর্মের কথাগুলো ড্রাফট রেজুলেশন থেকেই বাদ দিতে হয় সে উন্নত পশ্চিমা দেশগুলোরই চাপে।

এক সময় জাপানের মানুষদের অনেক উন্নত মনে হত, পরে শুনলাম তাদের মধ্যে নাকি আত্মহত্যার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি, তখন মনে হল, যে জীবনব্যবস্থা জীবনের প্রতিই বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে সে জীবন উন্নত হয় কেমন করে?

আমাদের সমাজটা ২০১৬ সালেও অজ্ঞতা আর মুর্খামির যুগে বসে আছে, এ অজ্ঞতা আর মুর্খামি গুহা মানবদের যুগ (যদি থেকে থাকে) থেকে উচু দালানে এসির বাতাস হয়ে আসছে। আমাদের সমাজে পরীক্ষার জন্য নিজ সন্তান আর পরিবারকে বাদ দিয়ে কখনও স্বামী, কখনও বা স্ত্রী ছুটে যাচ্ছে আরেক জনের কাছে, আনিসুল হকও শিখিয়ে দিচ্ছে "এ এক অপ্রতিরোধ্য ভালবাসা"। কোন একটা ছেলের যখন কোন মেয়েকে ভাল লাগছে তখন সে আশপাশ না ভেবে সেই মেয়েকে একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ভেবে ছুটে যাচ্ছে, মেয়েটাকে না পেলে হয়ত ১৪ ফেব্রুয়ারি নিজের গায়ে আগুন দিচ্ছে, কিংবা মেয়েটিকেই মেরে ফেলছে। তবে হিন্দি সিরিয়াল আর সিনেমার প্রেমকাহিনী পরিবারের সবাই বসে উপভোগ করবে, নিজেদের জীবনে ঘটলে পরে তাদের মাথায় দুশ্চিন্তার উদ্রেক হয়ে, চিন্তার উদ্রেক হয় না। যে মানুষটার টাকা দরকার সে ঘুষ খেয়ে হোক বা লাশ নয় টুকরা করে হোক সে তার টাকা আদায় করেই ছাড়ছে। চিন্তা করছে না কাজটা করা কি ঠিক নাকি ভুল। এদেশের লোকজন সবচেয়ে বেশি প্রতারণার শিকার রাজনীতিবিদদের হাতে, তবু ৫ বছর পরপর তারা ঠিকই ভোট দিচ্ছে আর ভাবছে, "বাহ! গণতান্ত্রিক অধিকার পালন করলাম!"। মাস খানেক পর যাকে সে ভোট দিয়েছে তাকে আবার গালাগাল দিতে একটুও দেরি করছে না! সে ভোট দেবে, গালিও দেবে, যেটা সে করবে না তা হল কাজটা করার আগে একটুখানি চিন্তা। বিশ্ব মোড়ল আমেরিকার আচরণও এর ভিন্ন রকম কিছু নয়, যখন কোন দেশে তাদের স্বার্থ ব্যাঘাত ঘটে তখনই তারা সে দেশে আল-কায়দা বসিয়ে দেয় আর বলে "আমরা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সদা তৎপর"। তবে লোকজন এখন ব্যাপারটা বোঝে যে এটা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নয়, এটা ইসলামের বিরুদ্ধে।

আমাদের হলুদ মিডিয়াগুলো অনেক কাজের! তারা খবর ছাপে, টকশো আয়োজন করে কিন্তু সেই পুরানো প্যাচাল গুলোই পাড়তে থাকে। আমরা কেউ কি খেয়াল করে দেখেছি যে আমরা একটি লুপে আটকা পড়ে গিয়েছি, আমরা নির্দিষ্ট কিছু ধারণার বাহিরে যেতে পারছি না ? আমরা সে গণতন্ত্রের কথা বলছি অনেক বছর ধরে, আমরা সেই সংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদ আর ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়ে বেড়াচ্ছি, সরকার পতন করছি, নতুন সরকার আসছে কিন্তু অবস্থার কোন সত্যিকার পরিবর্তন কি আসলে হয়েছে আমাদের আসলে কি প্রয়োজন সেটা কি ভেবে দেখেছি নাকি যা মাথায় আসছে তাই করছি, আজ সবকিছু বিচার করা হয় ভুল পালণ্টাতে। সমস্যা আজ সমস্যা নয়, সমস্যা হল আমাদের চিন্তা পদ্ধতি। আজ আমরা আমাদের ভাল মন্দকে সত্যের উপর প্রাধান্য দিয়ে বসে থাকি। যা আমাদের পছন্দ নয় তা সত্য হলেও অস্বীকার করি, যা আমাদের পছন্দ তা সত্য না হলেও সেটা বিশ্বাস করতে ভালবাসি। আমরা উপাসনা করি আমাদের প্রবৃত্তির। আমরা যখনই কোন কাজ করছি প্রথমেই চিন্তা করছি আমাদের স্বার্থের কথা, কাজটির সত্যতা বা সঠিকতার কথা নয়। আমরা বারবার যে ভুলটা করছি তা হল, আমাদের সত্যের উপরে স্থান দিচ্ছি আমাদের কামনা-বাসনাকে। আমরা কি subjective ভাবে চিন্তা করি নাকি Objectively ইসলামে ফ্রি মিক্সিং নেই বলে ইসলামকে ব্যাকডেটেড বলছি ইসলামে চোরের শাস্তি হাত কাটা, উন্নত বিশ্বে জরিমানা- বলে ইসলাম নিষ্ঠুর ? ইসলাম পারিবারিক বন্ধনকে খুব গুরুত্বের সাথে এবং ইসলামে ব্যাভিচারের শাস্তি দোররা-মারা। এজন্য ইসলাম বর্বর? আমরা পশ্চিমাদের মত লিভ টুগেদারে বিশ্বাস করিনা বলে তারা এগিয়ে আছে আর আমরা পিছিয়ে আছি আমাদের

* ছাত্র, ২য় সেমিস্টার, সাইন্সেস অব হাদীস এন্ড ইসলামিক স্টাডিস, আই আই ইউ সি।

মেয়েরা পশ্চিমাদের মত খোলামেলা কাপড় না পরে শরীর ঢেকে চলে বলে তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত ,আর তারা স্মার্ট liberated ইসলামে কর্পোরেট পতিতাদের স্থান নেই বলে নারী 'স্বাধীনতা'র ভারি অভাব? ইসলামে মদ খাওয়া যায় না তাই ইসলামে সহনশীলতার অভাব ? ইসলামে হোমোসেক্সুয়ালিটি নেই, উন্নত বিশ্বে আছে- এই জন্যে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ ?

ইসলামে গণতন্ত্র নেই বলে ইসলামের শাসন ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ? ইসলামে ফ্রি-মার্কেট ইকোনমি নেই বলে ইসলাম একুশ শতকে যায় না? "যা-ইচ্ছে-তাই" করার স্বাধীনতা নেই বলে ইসলাম বর্জন করে সেকুলার হতে হবে? একুশ শতক মানেই ব্রিটিশ-আমেরিকান-ফরাসী নীতি আর ইসলাম মানেই সেকেলে? আমরা মানতে পারছি না বলেই ইসলামে "বাড়াবাড়ি" আছে ? আমাদের ঠিক "পছন্দ" হচ্ছে না বলে ইসলামে কি যেন নাই ? আমাদের ঐতিহ্যের সাথে সাংঘর্ষিক বলে ইসলামকে বাদ দিয়ে ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিকে prioritize করতে হবে ? পশ্চিমাদের জীবনাদর্শ এবং এবং তাদের দালাল বুদ্ধিজীবিদের কেচ্ছা-কাহিনীর সাথে ইসলামের মিল নেই বলে আজ ইসলামকে বাদ দিয়ে পশ্চিমাদের থেকে সব কিছু নিলে আমরা স্মার্ট হয়ে যাব, আজকে আমরা যখন ইসলামকে দেখি তখন কিছু নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে ইসলামকে মেপে দেখি, যখন দেখি তার সেক্যুলার মূল্যবোধ যেমন personal freedom, human rights, democracy ইত্যাদির সাথে ইসলাম যায় না, তখনই ইসলামকে লেবেল লাগিয়ে দিই "ব্যাকডেটেড"। হতে পারে আমাদের মাপকাঠিতেই ভুল আছে, কিন্তু এই মৌলিক আলোচনায় না গিয়েই আমরা "ফতোয়া" দিতে দেরি করি না। প্রচলিত সেকুলার সমাধান গুলোর সাথে ইসলামের সমাধান গুলোর মিল নেই বলেই ইসলামের কার্যকারিতা হারিয়ে গেছে মিডিয়াগুলো কি আমাদেরকে এটাই শেখাচ্ছে না ? ইসলামকে কি আমরা স্বার্থ, সেকুলারিজম আর ফ্রিডমের লেন্স দিয়ে দেখছি না? উন্নতি এবং সভ্য জাতির আলোচনায় ফিরে আসি। একটা মানুষ বা জাতি আসলে কখন উন্নত হবে ? উন্নতির মাপকাঠি টাকা-পয়সা বা প্রযুক্তিগত বিদ্যা নয়, কিংবা নিজেদের মত করে সংজ্ঞায়িত করা কিছু নৈতিকতার ভিত্তিতে নয়, কিংবা পশ্চিমা জীবনব্যবস্থা, মতাদর্শ বা মতবাদকে আদর্শ ধরেও নয়। সে মানুষ বা জাতিই প্রকৃত উন্নত যে সত্যকে চিহ্নিত করেছে, গ্রহণ করেছে এবং সত্য ধারণাকে তার বিশ্বাস, জীবনব্যবস্থা এবং কাজকর্মের ভিত্তি হিসেবে নিরঙ্কুশচিত্তে গ্রহণ করেছে। মানুষকে পশু থেকে যে ব্যাপারটি স্বকীয় করে সেটা হল চিন্তা, লেজ নয়। পশু চিন্তা করে না, মানুষ করে। এটা ছাড়া আর বাকি সব কিছুতেই অনেক মিল, বেচে থাকার জন্য যে প্রয়োজনীয় জাগতিক জ্ঞান সেটা মানুষের যেমন আছে সেটি পশুরও আছে।আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে গত অনেক দিন ধরে অনেক গুলো কুকুর নিজেদের মাঝে খুব পাকায়। তারা খায়, ঘুমায়, দৌড়ায় আর মারামারি করে। আমার প্রবল সন্দেহ এই মারামারির পেছনে দুইটা কারণ একটা হল কোন বিরোধপূর্ণ টেরিটরির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন সংক্রান্ত, আরেকটি নারী ঘটিত। আমরা মানুষরা যদি চিন্তা না করি তাহলে আমরা এই কুকুরের মতই। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা অনেক বার বলেছেন সবকিছু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে এবং গভীরভাবে চিন্তা করতে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন: তারা কি ভেবে দেখে না যে, আল্লাহ আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী সব কিছু সৃষ্টি করেছেন যথাযথরূপে ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, কিন্তু অনেক মানুষ তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতে অবিশ্বাসী। (৩০:০৮)

আল্লাহ আরো বলেন : তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না? নাকি তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? (৪৭:২৪)

এবং নিষেধ করেছেন বাপ-দাদার অন্ধ অনুকরণ না করতে, নিষেধ করেছেন ট্রেডিশনের সাথে গা ভাসিয়ে না দিতে,

"আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর যা আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না, আমরাতো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব। যাতে আমরা আমাদের বাপদাদাদেরকে দেখেছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও [২:১৭০] শুধুমাত্র "আমাদের ভাল লাগে না" এই যুক্তিতে আমরা কোন কিছুকে ত্যাগ করতে পারি না। আমরা এজন্যও কোন কিছুকে আকড়ে ও ধরে রাখতে পারি না এই যুক্তিতে যে, এটা আমাদের "করতে ভাল লাগে" বা এটা আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের জানতে হবে কোনটা আসলেই সত্য। সত্যকে অস্বীকার করার মধ্যে স্মার্টনেসটা কোথায়? সত্য না জেনে অন্ধকারে বসে থাকাটা কিভাবে ভাল হতে পারে? তাই কোন ধারণা বা আদর্শ বা বিশ্বাসকে যখনই আমরা judge করতে যাব তখনই আমাদের মাথা থেকে পুরোন সব ধ্যান ধারণা ঝেড়ে ফেলে তারপর judge করা দরকার। আমাদের বিচার করতে হবে একটা আইডিয়া কতটুকু সত্য, আইডিয়াটি আমাদের স্বার্থ উদ্ধার করছে কিনা সেটা আলোচনার বিষয় নয়, আইডিয়াটি প্রচলিত ধারণা বা ঐতিহ্যের সাথে সাথে সাংঘর্ষিক কি না সেটাও ভাবার বিষয় নয়, কেননা আমাদের প্রচলিত ধারণাগুলোও ভুল হতে পারে। আমাদের দেখতে হবে, আইডিয়াটির বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি (intellectual foundation) কতটুকু সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।তাই আমরা যখন ইসলাম বা অন্য কোন কিছুকে গ্রহণ করব প্রথমেই দেখতে হবে সেটি সত্য ধারণা থেকে এসেছে কিনা। ইসলামকে বিচার করতে হলে তাই প্রথমেই যে আলোচনাটি আসবে তা হল সৃষ্টি কর্তা আসলেই আছেন কিনা, ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে কিনা? অথবা গণতন্ত্র আছে কিনা বা ইসলাম নারীদেরকে পশ্চিমাদের মত করে দেখে কিন্তু সেই আলোচনা নয়। বরং সৃষ্টিকর্তা আছে কি নেই এর জন্য এমন একটি উত্তর প্রয়োজন যা মানুষের যুক্তি-চেতনার (rational thinking and human reasoning) সাথে মানানসই, এটা ভিন্ন জীবনাদর্শ বা সংস্কৃতির সাথে মানানসই হওয়া কিংবা আবেগপ্রবণ মনকে স্যাটিসফাই করা জরুরি নয়।

ধৈর্যই বিজয়ের সিঁড়ি

হুসাইন মুহাম্মদ সারওয়ার*

যে কোন কাজে সফলতার প্রচেষ্টায় অটল ও অবিচল থাকার নাম ধৈর্য। যিনি ধৈর্যের সাথে কাজ করেন তাকে আমরা ধৈর্যশীল বলে থাকি। বলা হয় থাকে ধৈর্য একটি মহৎ গুণ। প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে এ গুণ বা বৈশিষ্ট্য থাকা অনস্বীকার্য। অস্ত্র বা পেশি শক্তির জোরে নয়, ধৈর্য দিয়েই পৃথিবীর মানুষকে করা যায় জয়, অর্জন করা যায় যে কোন সফলতা। তাই সবর বা ধৈর্যের অনুপস্থিতিতে কোন প্রকার মিশন কিংবা টার্গেট বাস্তবায়ন হতে পারে না। সেই মিশনের উদ্দেশ্য যতই যুগোপযোগী ও মহৎ হোক না কেন, উদ্দেশ্য লালনকারী জনগোষ্ঠি যদি পরিশ্রম প্রিয়, দক্ষকর্মশীল, কষ্টসহিষ্ণু না হোন তাহলে কোন কাজেই সফলতার দরজাটি ছোঁয়া সম্ভব নয়। যে বা যারাই এই পৃথিবীর বুকে সফল হয়েছেন তারা সকলেই পরিশ্রম প্রিয় ছিলেন। ধৈর্যশীল ছিলেন। ধৈর্যের মাপ কাঠিতে উত্তীর্ণ হয়েছেন তারা সকলেই পরিশ্রম প্রিয় ছিলেন। ধৈর্য্যর মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ফলে তারা বড় হয়েছিলেন। অনেক বড়। যতক্ষন পর্যন্ত না আপনার মাকসুদ পূর্ণ হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতে হবে। যে যাই বলুক পিছপা হওয়া যাবে না। কোন কান কথায় মন দেয়া যাবে না। সর্বদা ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। তাই বলে ধৈর্যের অর্থ এই নয় যে, আপনি পিঠ পেতে বসে থাকবেন আর বাতিল শক্তির (খোদাদ্রোহী গোষ্ঠির) মার খেতে থাকবেন..... । বরং আপনি যে উদ্দ্যেশ্যে হাঁটছেন তার সফলতার চূড়ায় পৌছানোই হবে আপনার কাজ।

আমরা যদি ইসলামের ইতিহাসের দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখা যাবে ধৈর্যের চূড়ান্ত স্তরের উপরই ইসলাম টিকে ছিল। ইসলাম ফুল বিছানো কোন পথ ধরে আসেনি। বরং অগণিত নির্যাতন নিষ্পেষনের ঘাত-প্রতিঘাত অতিক্রম করেই ইসলাম এসেছে। যার প্রমাণ মেলে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দীতে ঘটে যাওয়া ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্যগুলোতে। ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নির্যাতিত হয়েছিলেন নবী-রাসূলগণ। আল্লাহর পথে যারা চেষ্টা-প্রচেষ্টা করছেন তাদেরকেও একই কায়দায় জুলুম নির্যাতনের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এ পথে অটল ও অবিচল থাকার নামই ধৈর্য। এটার নামই সবর। মনে পড়ে গেল ইসলামী রেনেসাঁর কবি মতিউর রহমান মল্লিকের লিখা একটি গান- "আল কুরআনকে ভালবেসে প্রাণ দিয়েছিল যারা/আজকে দেখ সামনে এসে রক্তমাখা শহীদ বেশে ফের দাঁড়িয়েছে তারা....."

একথাটি বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এই ধরাধামে যতদিন কুরআন, ইসলাম, ইসলামী তমুদ্দুন থাকবে ততদিন ইসলাম বিরোধী শক্তিও থাকবে। কিন্তু তারা ইসলামের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। সুতরাং লক্ষ্য বাস্তবায়নে যত বাধা বিপত্তি, জুলুম-অত্যাচারই আসুক না কেন সেগুলো ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করতে হবে। সাহাবীগণও তাই করতেন। যার প্রমাণ হাদিসে মেলে।
হযরত খাব্বাব ইবনুল আরিত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসুল (সা.) এর নিকটে গেলাম তখন তিনি কা'বা শরীফের ছায়ায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (সা.), আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবেন না এবং দোয়া করবেন না? আমাদের কথা শুনে রাসূল (সা.) বললেন, তোমাদের আগে যারা এই পৃথিবীতে দ্বীনের দাওয়াত দিতে এসেছিলেন তাদেরকে ধরা হতো, অতঃপর তাদের জন্য জমিনে গর্ত খনন করা হতো, এর পর সে গর্তে তাদেরকে গেঁড়ে দেয়া হতো, এরপর করাত আনা হতো, সে করাত তাদের মাথার ওপরে রাখা হতো, এরপর করাত চালিয়ে জীবিত মানুষটাকে চিরে দ্বিখন্ডিত করা হতো, লোহার চিরুনি দিয়ে হাঁড় থেকে মাংস তুলে নেয়া হতো। এসব নির্যাতন তাদেরকে দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। আল্লাহর শপথ! তিনি তাঁর দ্বীনকে এমন ভাবে বিজয়ী করবেন, যাতে সান'আ থেকে হাদারামাউত পর্যন্ত মানুষ চলাফেরা করবে, আর তাদের মনে আল্লাহর ভয় ছাড়া কোন ভয় থাকবে না। আর মেষ পালের জন্য বাঘের ভয় ছাড়া কোন ভয় থাকবে না। কিন্তু তোমরা বড্ড তাড়াহুড়ো করছ।
(সহীহ বুখারী)

সুতরাং এই পৃথিবীতে দ্বীনের দা'ওয়াহ্ দিতে গিয়ে সাহাবাদেরকে কতটুকু ধৈর্যধারণ করতে হয়েছিল, তা উপরোক্ত হাদিস থেকে সহজেই অনুমেয়। রাসূল (সা.) এর দেখানো সঠিক পথে যে বা যারাই দ্বীনের দা'ওয়াহ্র কাজে সম্পৃক্ত হবেন, তাদের জীবনেও একই পদ্ধতির পরীক্ষা আসতে পারে এটাই স্বাভাবিক।
তাই আসুন, ধৈর্যকে পুঁজি করেই যে কোন কাজ বাস্তবায়ন করতে চেষ্টা করি। ধৈর্যের অপর নাম সফলতা। মূলত ঃ ধৈর্যেই বিজয়ের সিঁড়ি।

* ছাত্র, ৬ষ্ঠ সেমিষ্টার, কুরআনিক সাইন্সেস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আই আই ইউ সি।

ধৈর্যের প্রতিদান জান্নাত

সায়েমা ইয়াছমিন ছিদ্দিকা*

মহাগ্রন্থ আল্-কুরআনের ঘোষনা হচ্ছে-

"আর তাদের ধৈর্যের পুরস্কার স্বরুপ তাদেরকে জান্নাত ও রেশমী পোশাক দান করবেন"। (সূরা আদ্-দাহর-১২)

ধৈর্য এমন একটি গুণ যা সকলকে দেওয়া হয় না, তা কেবলমাত্র আল্লাহর পছন্দের ব্যক্তিদের দিয়ে থাকেন ।

যেমন মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বাণী- "এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল,এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকে যারা মহা ভাগ্যবান" । (সূরা হামীম-সাজদা-৩৫)

সাধারণত ধৈর্যের আরবী হল সবর । এর দ্বারা বুঝানো হয়- আটকে রাখা, নিবৃত্ত রাখা, থামিয়ে রাখা । পরিভাষায় ধৈর্য্যকে একটি উত্তম মানবিক চরিত্র বা মানবিক উৎকর্ষতাকে বুঝায় । ধৈর্য হল পাটি গণিতের সরল অংকের মতো যেমন তা বাস্তবে সমাধান করা অনেক জটিল । তেমনি ধৈর্য অর্জন করা খুবই কঠিন । তবে এই গুণ অর্জন করতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে চেষ্টা করতে হবে । রাসূল (সা.) বলেছেন- "যে ধৈর্য্য ধারণ করবে, আল্লাহ তাকে ধৈর্য্যশীল করবেন । আর যে কেউ স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে স্বাবলম্বী করবেন । ধৈর্য্যের চেয়ে উত্তম আর কোন বড় নেয়ামত কেউ পেতে পারে না"। (বুখারী-৬৪৭০)

আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে বহু সমস্যার সম্মুখীন হই । তবে এসব সমস্যাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে হলে আমাদের সত্য সহকারে ধৈর্যধারণ করতে হবে, তবে আমরা সফল হব । অন্যথায় ব্যর্থতায় আমাদের জীবনের অংশ হয়ে যাবে । যেমন রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন- "নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালবাসেন তখন তিনি তাদেরকে পরীক্ষা করেন। যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য রয়েছে সন্তুষ্টি আর যে তাতে ক্রুদ্ধ হয় তার জন্য রয়েছে গজব"। সব কিছুতে আমাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে, যদি আমরা উত্তম প্রতিফলের আশা করি । তাছাড়া তাড়াহুড়া শয়তানের পক্ষ থেকে হয়, আর এর ফল ও দাড়ায় ভিন্ন ।

যেমন আরবরা বলে থাকেনঃ-

"রশি যদি বেশি কষে তবে তা ছিড়ে যায়।"

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)বলেন,

"ধৈর্যশীলরাই সর্বোত্তম লক্ষ্য অর্জন করে।"

জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন- "জ্ঞানী ও মূর্খদের মধ্যে পার্থক্য হল, জ্ঞানী ব্যক্তি বিপদে পড়লে নিজেকে দু'ভাবে সান্ত্বনা দেয়, প্রথমত পরিতৃপ্ত হয়, দ্বিতীয়ত ধৈর্য ধারণ করে। আর মূর্খ ব্যক্তি বিচলিত ও ভীত হয় এবং মানুষের কাছে সাহায্য চায়। "

তাছাড়া ধৈর্যের কিছু বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলঃ-

১. ধৈর্য কেবল মাত্র মুমিনরাই উপভোগ করে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-"তুমি ধৈর্য ধারণ করো, তোমার ধৈর্য তো আল্লাহ তা'য়ালারই সাহায্য।" (সূরা নাহল-১২৭)

২. ধৈর্য সফলতার ও উন্নতির পূর্বশর্ত । যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-"হে ঈমানদার গণ! তোমরা ধৈর্য অবলম্বন কর ও তার পর অটল থাক এবং লড়াইড়ের জন্য প্রস্তুত থাক আর আল্লাহকে ভয় কর। যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা আল-ইমরন-২০০)

৩. ধৈর্য আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের অন্যতম মাধ্যম। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-"তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (সূর আনফাল-৪৬)

৪. ধৈর্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার মাধ্যম। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-"আর তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাও। আর এ কাজ খুবই কঠিন তবে বিনয়ীগণ ব্যতীত।" (সূরা বাকারা-১৫)

৫. ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে জান্নাতে ফেরেস্তারা স্যালুট করবে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-"এবং বলবে, তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ বলে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, কত ভাল এ পরিণাম।" (সূরা রাদ-২৪)

৬. আল্লাহ তা'য়ালার ক্ষমা এবং পুরস্কার লাভের উপযুক্ত হতে হলে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। যেমন আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-"কিন্তু যারা ধৈর্যশীল ও সৎকর্মপরায়ণ তাদেরই জন্য আছে ক্ষমা এবং মহাপুরস্কার।" (আয়াত নং)

আল্লাহর অফুরন্ত দয়া পাওয়ার শর্ত ধৈর্য, আর ধৈর্যহীনরা ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত।

সুতরাং পরিশেষে বলতে চাই, আসুন আমরা সকলে ধৈর্য্যরশীল হতে চেষ্টা করি। কেননা, সত্যিকার ঈমানদারের মাঝে যে সব গুণ পাওয়া যায় তা হল ধৈর্য, অধ্যবসায়, অটলতা, সৌম্যতা এবং আল্লাহর বান্দা হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব পালনের খাঁটি ইচ্ছা। আমরা যদি নিজেদেরকে খাঁটি মু'মিন ও মুক্তিকামী মানুষে পরিণত করতে চাই তবে ধৈর্য্যশীল হতে হবে। কেননা, মুক্তিকামী মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই ধৈর্য্যরশীলতা। যেমন মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন-"তারপর তাদের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হওয়া যারা ঈমান এনেছে এবং যারা পরস্পরকে উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের ও দয়া করুণার। এরাই ডান হাতওয়ালা।" (সূরা বালাদ-১৭-১৮)

আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে এ গুণ অর্জনের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করার তাওফিক দান করেন । আমিন।

---

* ছাত্রী ,৫ম সেমিষ্টার, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আই আই ইউ সি।

বিলাসিতার মাঝে হারিয়ে যায় রমাদানের মাহাত্ম্য

রাবেয়া আকতার*

রমাদান আসার আগে থেকে শুরু হয়ে যায় ঈদের প্রস্তুতি। আর রামাদান আসলে এর তোড়জোড় বেড়ে যায় বহুগুণ। মার্কেট, শপিং সেন্টার, সুপারশপে গেলে এর কিছুটা আঁচ করা যায়। সবার মাঝে পোশাক নিয়ে শুরু হয় সংলাপ, আলাপ-আলোচনা।

সেদিন বাসে দুই বান্ধবীর কথা শুনতেছিলাম। একজন অপর জনকে প্রশ্ন করছে কেমন ড্রেস নিবে ঈদে, বা বাজেট কেমন। অপরজন বলল এবার ঈদে পাঁচ-ছয় হাজারের মধ্যে ড্রেস নিব সাথে কন্টেষ্ট করা কানের দুল, অর্নামেন্টস জুতো তো আছেই। এসব ক্ষেত্রে আন্টি চাচিরা যারা ভারতীয় সিরিয়ালে মগ্ন হয়ে থাকেন তারা আরো এক ধাপ এগিয়ে। কোন্ সিরিয়ালের কোন্ নায়িকা কোন্ শাড়িটা পড়েছেন তাকে সেই শাড়িটা কিনতে হবে। আর কিনে এনে থেমে যাবেন না তা আশেপাশের আন্টিদের মাঝে প্রদর্শনী করে বেড়াবেন। তা দেখে অতি উৎসাহী পাশের আন্টি আরো চড়া দামে শাড়ী কিনে অহংকারের ঢেকুর তুলবেন। এর বিপরীতে রমাদান মাসের গুরুত্ব মাহাত্ম্য ও কুরআনের মাসকে ঘিরে কোন আলাপ আলোচনা ও ইবাদতের পরিকল্পনা করা হয় না। রমাদানের মাসয়ালা-মাসায়েল এবং আনুষাঙ্গিক জ্ঞান অর্জনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। অথচ, আল্লাহ সুবহানাহু ও তায়ালা বলেছেন 'এই মাস হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম', কতখানি গুরুত্ব দেওয়া উচিত আর আমরা কি নিয়ে ব্যস্ত!

দুনিয়ার ভোগ বিলাসিতা আমাদেরকে আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহ থেকে দূরে রেখেছে বঞ্চিত করছে আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে। জান্নাতীদের তালিকায় নিজের নাম না উঠিয়ে জাহান্নামীদের কাতারে নিজেরা নিজেদের শামিল করে নিচ্ছি। রাসূল (সা.) বলেছেন, যে রমাদান পেলো কিন্তু নিজেদের গুনাহ সমূহ মাফ করে নিতে পারলো না, সে হচ্ছে সব চেয়ে হতভাগা। হায় আফসোস, হতভাগাদের কাতারে তারা পড়ে। অথচ পাঁচ-ছয় হাজার টাকা দামের পোশাক, শাড়ী না কিনে, এর অর্ধেক দাম দিয়ে কিনে, বাকী অর্ধেক দিয়ে কোন গরীব অসহায়ের এক মাসের ইফতারের রসদ যুগিয়ে দিতে পারেন। একজনকে ইফতার করিয়ে তার সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করতে পারেন। যা নিজ একাউন্টে জমা থাকলো। আপনার আশে পাশের লোকজন আপনাকে দেখে উৎসাহিত হত। সমপরিমাণ সাওয়াব আপনি অর্জন করতে পারতেন। আর অন্তরের প্রশান্তি লাভ করতেন। তার তুলনা কোন কিছুর সাথে হয় না। আমার এক স্যার বলেছিলেন, এক রমাদানে তিনি ওমরা করতে সৌদী আরবে গেলেন, ইফতারের আগ মুহূর্তে মদিনার অলিতে গলিতে বাচ্চরা ছুটে বেড়াতেন, অচেনা কাউকে দেখলে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে যেতেন। স্যারের নিকট যখন আসলো, তিনি এর কারণ জানতে চাইলেন, বাচ্চাছেলেটি জানালো তাদের আব্বু-আম্মু বলেছে, কোন রোযাদার ব্যক্তিকে ইফতার করালে তার সমপরিমাণ নেকী অর্জন করা যায়। সুবহানাল্লাহ। কি অনুপম শিক্ষা। ছোটবেলা থেকে উদারতা, দানশীলতা ও ভালো কাজের সঠিক শিক্ষাটা ওই সব বাবা মায়েরা দিয়েছেন। সঠিক জিনিস সঞ্চয়ের দিকে (আমল) উদ্বুদ্ধ করেছেন। আমাদের অভিবাকদের ভেবে দেখা প্রয়োজন, আমরা ফ্যাশন, বিলাসিতা ও দুনিয়ার মোহের পেছনে ছুটতে গিয়ে নিজেদেরকে পাপের অতল গহবরে ভাসিয়ে দিচ্ছি। হায়! চিরস্থায়ী জীবন সম্পর্কে বেখবর হয়ে আছি। দুনিয়া মুমিনের জন্য অভীষ্ট লক্ষ্য নয়। আখিরাত হল আসল ঠিকানা। তাই আমাদের উচিত রমাদানের সময়কে যথাযথ ভাবে কাজে লাগানোর বিষয়ে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকা। দুনিয়ার কল্যাণ এবং আখিরাতের মুক্তি হাসিল করা।

* ছাত্রী, ১ম সেমিষ্টার, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আই আই ইউ সি।

Honesty is the Best Policy

Dilruba yeasmin

The Arabic words used for honesty are 'Istiqaamah' and 'Mustaqeem'. These two words are extremely powerful in their meaning and connotation. According to the Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic:

Istiqaama means straightness, sincerity, uprightness, rectitude, integrity, probity, honesty, rightness, soundness, correctness.
Mustaqeem means upright, erect, straight, dead straight, proper, in order, harmonious, honorable.
Allah (S) said that, "Guide us unto the straight path, the upright path, the correct path" {Sura Al Fatiha-6}

We do make this supplication every now and then. For us honesty is a way of life.
In the Hadith verses that, Sufyaan bin Abdullah (R) reported, I asked the prophet, "O messenger of Allah tell me something of Islam which I will not ask anyone else about it, He said, say "I believe in Allah and then be honest to your belief by being steadfast."

This advice is very important for our life. So, say: I believe in Allah and be honest to your claim throughout your life.

"Honesty is the best policy" is a famous statement said by Benjamin Franklin . Honesty is considered as the best tool of success in the life and a famous person said it is the backbone of a successful relationship which has capability to form a well developed society. Without being honest in the life, it becomes very tough to make real and trustworthy friendship or love bond with anyone. People who are generally used to tell the truth can be able to build better relationships and thus better world. Some people who do not have dare to tell the truth to their dear ones, generally tell lie and face bad situations of being dishonest. On the other hand , saying truth helps in strengthening our character and makes us strong . So, being honest helps us a lot in many ways all through the life. Honesty is the most effective tool of protecting the relationships.

Telling lies just to save the situation can make the condition more worse. Saying truth always helps us to strengthening character as well as being confidence within us .There are many bad and good situations in the life and I think almost all of us have been felt that telling truth to our dear ones gives us relief and happiness. Honesty is the best way to prove your aqeedah and to live a life of obedience. It is a mark of a muslim.

So, let us adopt honesty as our best way of life , not as our 'best policy'!
May Allah give us the strength to persevere and be honest in our life. Aameen.....

* Student, 1st Sem, MA. DIS, IIUC

الصبر

بنت فاروق*

الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على رسوله المختار وعلى آله وأصحابه الأبرار وعلى جميع المؤمنين الأخيار. وبعد:

إن الصبر ذريعة الفوز والنجاح في الدنيا والأخرة.

تعريف الصبر:

معناه اللغوي: التجمل والتجلد.

وفي الشرع هو التحمل على الشدائد وحبس النفس عن المكاره.

للصبر أهمية كبيرة في حياة الإنسان،من يصبر على الشدائد والمكاره في سبيل تحصيل الغاية مع الثبات والاستقامة ينجح ويظفر. إذن يحتاج لكل نجاح وفلاح إلى الصبر والتحمل. الصبر من الصفات المحمودة،أكد الله تعالى بالصبر تسعون مرة و وصفه بأنه من عزم الأمور. ﴿واصبر وما صبرك إلا بالله﴾

﴿يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون﴾.

﴿ولئن صبرتم فهو خير للصابرين﴾.

﴿وبشر الصابر ين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون﴾.

﴿والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم .. صبرتم فنعم عقبى الدار﴾.

﴿إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب﴾

إن الصبر من صفات الأنبياء والصالحين ، فقد صبروا على أذى القوم وتكذيبهم وبلغوا ما أمرهم الله بتبليغه.

يقال في الإنجليزية:

No one had ever been given anything better than Patiance

وقال أبوبكر رضي الله عنه:

It's difficult to be patient but to waste the rewards for patient is worse.

فعلينا أن نصبر في جميع الأحوال على البأساء والضراء: لأن الله تعالى يقول: ﴿واصبر لحكم ربك﴾: وأدعو الله لنا ولكم أن يوفقنا كلنا للصبر إنه هو الموفق والمعين.

---

* الطالبة فى الفصل الأول ، قسم علوم الحديث والدراسات الإسلامية،الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ

জীবনী

মুহাদ্দিস আহমদ বিন সিদ্দিক আল-গুমারী : যুগান্তকারী অমর প্রতিভা

সাইয়্যেদ নূর আল-আযহারী*

ভূমিকা: রাসূলে কারীম (সা.) মানবজাতির জন্য এক পরিপূর্ণ আদর্শ। পবিত্র কুরআনের শিক্ষানুসারে রাসূলে কারীম (সা.) এর জীবন ও কর্মধারা মুসলমানদের জন্য 'উসওয়ায়ে হাসানাহ' বা সর্বোত্তম আদর্শ। মুসলমানদের জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতির সকল অঙ্গনেই এই আদর্শের পরিধি বিস্তৃত। এই আদর্শের সঠিক ও নির্ভুল বিবরণ সংরক্ষিত রয়েছে হাদিসের বিশাল ভাণ্ডারে। কাজেই প্রকৃত মুসলিম রূপে জীবন যাপন সর্বতোভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য হাদিসের ব্যাপকতর অধ্যয়ন এবং এর বিশুদ্ধতা ও প্রামাণিকতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানার্জন করা একান্তই আবশ্যক। হাদিস সম্পর্কে জ্ঞানার্জন না করা প্রকৃত পক্ষে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকারই নামান্তর।

রাসূল (সা.) ইসলামী আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। এজন্য তাঁকে পরিচালনা করতে হয়েছে সর্বাত্মক সাধনা ও মহাভিযান। তিনি বলেছেন:" بلغوا عني ولو آية " আমার পক্ষ থেকে পৌছে দাও যদিও একটি আয়াত হয়[১]। রাসূলের এ অমীয় বাণী বুকে ধারণ করে তাঁর প্রিয় সাহাবীগণ নিরলসভাবে চেষ্টা চালিয়েছেন ইসলামী আদর্শ ও হাদিস প্রচারের জন্য। ঘুরে বেড়িয়েছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। বর্ণিত আছে আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) মাত্র একটি হাদিসের জন্য মিশরে উকবা ইবনে আমেরের কাছে সফর করেছেন । যারা হাদিস চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন তাদের সম্পর্কে রাসূলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেছেন:

نضر الله امرءا سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع.

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ধন্য করবেন সে ব্যক্তিকে, যে আমার নিকট হতে কোন কিছু শুনলো এবং উহা যেভাবে শুনলো সেভাবেই অপরের নিকট পৌঁছে দিল, কেননা কখনো শ্রোতার অপেক্ষা উহা যার নিকট পৌঁছায় সে এর অধিক সংরক্ষণকারী।[২]

রাসূলের এ অমীয় বাণীর মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়ে যুগে যুগে অনেকেই হাদিস শাস্ত্রে অবদান রেখে অমর হয়েছেন। বিংশ শতাব্দীতে যারা হাদিস শাস্ত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন তাদের মধ্যে আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন সিদ্দিক আল-গুমারী অন্যতম। নিম্নে এ বিখ্যাত মুহাদ্দিসের সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরা হলো।

জন্ম ও পরিচয়: শিহাব উদ্দীন আবুল ফয়েজ আহমদ বিন মুহাম্মদ সিদ্দিক আল-গুমারী, আল-হাসানী। মাত-পিতা উভয়ের দিক থেকে তার বংশধারা ইমাম হাসান ইবনে আলী (রা.) এর নিকট মিলিত হয়েছে। এজন্য তিনি আল-হাসানী হিসেবে পরিচিত। তিনি ১৯০১ ইংরেজী মোতাবেক ১৩২০ হিজরি ২৭ রমাদান জুমাবার মরক্কোর সাঈদ গোত্রে তার ফুফুর বাড়ীতে জন্ম গ্রহণ করেন। এর দু'মাস পর তার পিতা তাকে নিয়ে নিজ মাতৃভূমি 'তানযায়' ফিরে আসেন। তার পূর্ব পুরুষ হিজরি পঞ্চম শতকে স্পেন থেকে হিজরত করে মরক্কোয় এসে গুমারা গোত্র নাম ধারণ করেছিলেন বলে তিনি গুমারী হিসেবে পরিচিত।

জ্ঞান অর্জন: আহমদ বিন সিদ্দিক আল-গুমারী তার পিতার কাছ থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। উল্লেখ্য যে, তার পিতাও মরক্কোর সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও আলেম ছিলেন। মাত্র নয় বছর বয়সে তার পিতার সাথে হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করেন। এরপর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদিনায় আসেন। শৈশবে পবিত্র কুরআনুল কারীম মুখস্ত করেন। এরপর প্রখর স্মৃতি শক্তির অধিকারী আল-গুমারী প্রচলিত মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের মতন মুখস্ত করেন। এর মধ্যে রয়েছে:

المقدمة الأجرومية، الألفية بشرح ابن عقيل، المرشد المعين للضرورى من علوم الدين لابن عاشور، مختصر خليل فى الفقه المالكى، أم البراهين للسنوسى، جوهرة التوحيد للقانى، منظومة البيقونية، بلوغ المرام من أدلة الأحكام لابن حجر.

মাত্র ১৪ বছর বয়সেই তিনি এসব গুরুত্বপূর্ণ কিতাব সমূহ মুখস্ত করেন। ১৫ বছর বয়স থেকেই ইলমুল হাদিসের প্রতি তার আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। অতএব, তিনি হাদিসের মতন ও ইলমুর রিজাল এর কিতাব সমূহ অধ্যয়ন শুরু করেন। ১৩৩৯ হিজরিতে তার পিতার পরামর্শে বিশ্ববিখ্যাত বিদ্যাপীঠ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য মিশরে গমন করেন। দু'বছর পর মায়ের জানাযায় অংশগ্রহণ করার জন্য মরক্কোয় ফিরে আসেন। এরপর তিনি আবার কায়রো চলে যান এবং ইলমুল হাদিসে আত্মনিয়োগ করেন। বর্ণিত আছে, দীর্ঘ দু'বছর পর্যন্ত তিনি নিজ বাড়ী থেকে জুমার নামায ছাড়া অন্য কোন কাজে বের হন নি। ১৩৪০ হিজরিতে তার পিতার সাথে মুহাম্মদ বিন জাফরের সাথে সাক্ষাত করার জন্য দামেস্ক গমন করেন। দামেস্ক থেকে মরক্কোয় ফিরে এসে হাদিসের পুস্তক রচনা ও পাঠদানে মনোযোগ দেন। এ সময় তিনি প্রমুখ কিতাব সমূহের দারস পেশ করতেন[৩]।

(نيل الأوطار)، (صحيح مسلم)، (صحيح البخارى)، (الشمائل المحمدية)، (تخريج الدلائل بما فى رسالة القيروان)

১৩৪৯ হিজরিতে তার দুই ভাই আব্দুল্লাহ ও মুহাম্মদ গুমারীকে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর জন্য পুনরায় মিশরে গমন করেন। এ সময় তিনি হাদিসের উপর অনেক পুস্তক রচনা করেন। আল-আযহার মসজিদের সেমিনার হলে তিনি নিয়মিত দারস পেশ করতেন। সাধারণ শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক তার দারসে উপস্থিত হতেন। তার দারস সমূহ সাধারণ শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের মিলন মেলায় পরিণত হতো। ১৩৫৪ হিজরিতে তার পিতার মৃত্যুর কারণে মরক্কোয় ফিরে আসেন এবং নিজ মাতৃভূমি 'তানযায়' হাদিসের মজলিস স্থাপন করেন। তিনি প্রচুর স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। তার প্রমাণ, তিনি একসাথে ৫০টি হাদিস সনদ সহকারে মুখস্ত বর্ণনা করতেন। তারপর একটি একটি করে ফিক্‌হ ও অন্যান্য বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করতেন[৪]।

---

* প্রভাষক, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আই আই ইউ সি।

গুণাবলী: আহমদ বিন সিদ্দিক আল-গুমারী সুদর্শন, সদা হাস্যোজ্জ্বল, বিনয়ী, দানবীর, নিষ্ঠাবান সর্বোপরি তাকওয়াবান ছিলেন। গরীব, দরিদ্র ও মিসকীনদের প্রতি অতি দয়াবান ছিলেন। তাদেরকে সব সময় অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন। অনেক পদবী ও সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়া বিমূখ ছিলেন। ইহুদী-খৃষ্টানদের সংস্কৃতিকে ঘৃণা করতেন এবং সরকারী চাকুরী অপছন্দ করতেন[৫]।

তার শিক্ষকবৃন্দ: আল্লামা আহমদ বিন সিদ্দিক আল-গুমারী তৎকালীন হাদিস ও ফিক্হের বিখ্যাত আলেমদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে তার কোন শিক্ষক কোন মাযহাব অনুসরণ করেন সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করতেন না। ফিক্হ ও হাদিসের জ্ঞান অর্জনের জন্য ছুটে যেতেন তৎকালীন বড় বড় আলেমদের নিকট। তার উল্লেখযোগ্য শিক্ষকবৃন্দ হলেন:

১. তার পিতা আল্লামা মুহাম্মদ বিন সিদ্দিক আল-গুমারী। তার কাছ থেকে ফিকহ তাফসীর, হাদিস এবং তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করেন। উল্লেখ্য যে, তার পিতা তৎকালীন মরক্কোর শীর্ষস্থানীয় আলেম ও ইসলামিক স্কলার ছিলেন।

২. মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম আশ-শাফেয়ী। তিনি শাফেয়ী মাযহাবের সুপ্রসিদ্ধ ফকীহ হিসেবে পরিচিত। তার কাছ থেকে (الألفية بشرح ابن عقيل)، (شرح التحرير)، (جوهرة التوحيد)، (مسند الشافعي)، (الأدب المفرد)، (المقدمة الأجرومية) প্রমূখ কিতাব সমূহ শিক্ষা অর্জন করেন। শাফেয়ী মাযহাবের অনেক আলেমদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ সত্ত্বেও অধিকাংশ সময় মালেকী মাযহাবকে প্রধান্য দিতেন। তবে তিনি একজন মুজতাহিদ হিসেবে পরিচিত।

৩. মুহাম্মদ বিন সালেম আশ শারকাভী। তার কাছ থেকে (شرح مشكوة المصابيح) ও (الإقناع بشرح متن أبي شجاع) সহ আরো অনেক কিতাবের জ্ঞান অর্জন করেন।

৪. মুহাম্মদ বখীত বিন হোসাইন আল হানাফী। তার থেকে (الهداية للمرغيناني) ও (شرح الإسنوى على المنهاج) শিক্ষা অর্জন করেন।

৫. মুহাম্মদ বিন নাসর আল-আদবী। তিনি মিশরে মালেকী মাযহাবের সুপ্রশিদ্ধ আলেম ছিলেন। তার কাছ থেকে সহীহ মুসলিম এবং সুনানে আবি দাউদসহ আরো অনেক কিতাবের জ্ঞান লাভ করেন।

৬. ওমর বিন হামাদান। তিনি হিজাজের শায়খ হিসেবে পরিচিত। তার কাছ থেকে সহীহ বুখারী এবং ইমাম নববীর আল-আযকার এর শিক্ষা ও সনদ লাভ করেন। এছাড়া যে সকল মুহাদ্দিসবৃন্দ তাকে হাদিস বর্ণনার إجازة বা অনুমতি প্রদান করেছেন তারা হলেন: প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস মুহাম্মদ বিন জাফর আল কিত্তানী, মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস আল-ক্বাদেরী, আহমদ বিন খায়য়াত আয যাকাভী, আহমদ রাফে আত-তাহতাভী আল-হানাফী, বদরুদ্দীন আল বায়াকী ও আব্দুল মাজীদ আশ-শারনাভী আল-আযহারী।

ছাত্রবৃন্দ: আল্লামা মুহাদ্দিস আহমদ বিন সিদ্দিক আল-গুমারী আল-আযহার মসজিদে সনদ সহকারে তার স্মৃতি থেকে হাদিস বর্ণনা করতেন। যা বিংশ শতাব্দীর এক বিরল ঘটনা। এ জন্য তাকে অনেকে خاتم الحفاظ বা হাদিসের সর্বশেষ হাফেজ উপাধি দান করেছেন। এ ছাড়া তিনি তার মাতৃভূমি 'তানযায়' হাদিসের মজলিস স্থাপন করেছেন। দূর দূরান্ত থেকে হাজারো ছাত্র হাদিসে নববীর শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে এখানে জমায়েত হতেন। তার এ মজলিস পুরো আফ্রিকা মহাদেশে হাদিস চর্চার প্রাণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সেখানে তিনি চার বছর হাদীসের দারস পেশ করেন। অতএব, তার কাছ থেকে অনেকে হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেন। তন্মধ্যে বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, ফকীহ ও উসূলবিদ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ হানাফী, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল কাদের আত-তালিদী, তার ভাই অব্দুল্লাহ ও ইব্রাহীম আল-গুমারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য[৬]।

মর্যাদা: আল্লামা আহমদ বিন সিদ্দিক আল-গুমারীকে পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদের মধ্যে গণ্য করা হয়। আবার অনেকে হাফেজ ইবনে হাজর আল-আসকালানী, হাফেজ সাখাভী, হাফেজ সুয়ূতী ও শাওকানীর পর তার মর্যাদায় আর কেউ পৌঁছে নেই বলে মন্তব্য করেন। তার এ জ্ঞান গর্বের ও প্রচুর স্মৃতি শক্তির স্বীকৃতি দিয়েছেন শায়খ বখীত, খিজর আল হোসাইন আত-তাহতাবী, ইবনুল হাজ্ব আস-সালামী এবং আব্দুস সালাম বিন আব্দুল কাদেরসহ আরো অনেকে।

রচিত গ্রন্থসমূহ: শায়খ আল্লামা মুহাদ্দিস আহমদ বিন সিদ্দিক আল-গুমারী বহুমূখী জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। রচনা ও সংকলনের জগতেও তার অবদান অনস্বীকার্য। তিনি হাদিস, তাফসীর ও ফিক্হ শাস্ত্রে ৪৮ টি গ্রন্থ রচনা করে অমর হয়ে আছেন। এছাড়া তিনি অনেক গ্রন্থকে সংক্ষিপ্ত করেছেন, আবার অনেক গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেছেন। নিম্নে তার রচিত কিতাবের মধ্যে থেকে কয়েকটি উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হলো:

১. الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للبيضاوى	২. تخريج أحاديث لمع أبي اسحاق الشيرازى فى الأصول
৩. سمير الصالحين ٣ أجزاء	৪. فضائل القرآن
৫. فضائل رمضان وزكاة الفطر	৬. مصباح الزجاجة فى صلاة الحاجة
৭. جواهر البيان فى تناسب سور القرآن	৮. نهاية الآمال فى شرح وتصحيح حديث عرض الأعمال
৯. الغرائب والوحدان فى الحديث الشريف	১০. واضح البرهان على تحريم الخمر فى القرآن
১১. اتحاف النبلاء بفضل الشهادة وأنواع الشهداء	১২. حسن البيان فى ليلة النصف من شعبان

মৃত্যু: এ মহান মনীষী ও বিখ্যাত হাদিসের ইমাম জামাদিউস সানি মাসে ১৩৮০ হিজরি মোতাবেক ১৯৬০ সনে মিশরের রাজধানী কায়রোতে ইন্তেকাল করেন এবং কায়রোতেই তাকে দাফন করা হয়[৭]।

তথ্যসূত্র :

১। বুখারী, মুহাম্মদ বিন ঈসমাইল, সহীহ বুখারী, কিতাব আহাদিসুল আম্বিয়া, হাদিস নং-৩২৭৪, তিরমিযী-২৬৬৯, মুসনাদ আহমদ-২/২১৪
২। তিরমিযী, আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা, কিতাবুল ইলম, হাদিস নং-২৬০০, ইবনু মাযাহ-২৯৪।
৩। আব্দুল্লাহ তালিদী, শায়খ আহমদ বিন সিদ্দিক আল-গুমারীর জীবনী, পৃঃ ৫১, সাফা লাইব্রেরী, কায়রো।
৪। মুহাম্মদ বিন আল ফাতিমী আস সালিমী, ইসআফুল ইখওয়ান আর রাগিবীন, পৃঃ-৩৭, দারুল ফাতেহ, মরক্কো।
৫। প্রাগুক্ত-৩৮।
৬। আব্দুল্লাহ বিন সিদ্দিক আল-গুমারী, সাবিলুত তাওফিক, পৃঃ ২৩, দারুস সালাম, কায়রো।
৭। মুহাম্মদ বিন আল ফাতিমী আস সালিমী, ইসআফুল ইখওয়ান আর রাগিবীন, পৃঃ-৩৮, দারুল ফাতেহ, মরক্কো।

গল্প

স্নিগ্ধ ভালোবাসার দু'টুকরো গল্প

শায়খুল আজম আবরার*

১. ওর সাথে এ জীবনে কথার পুঁতি দিয়ে প্রচুর মালা গেঁথেছি। দুঃখ-সুখ, হাসি শোক দু'জনে নিঃসংকোচে ভাগ করেছি যদ্দুর পারা যায়। আনন্দে হেসেছি একসাথে। আর কষ্টে সমব্যাথী হয়ে শান্তনা দিয়েছি। অনেক সময় ভারী তত্ত্বকথার আলোচনায় কানঝালা পালা করেছি, মাথাটাকে ভার করেছি।

এত কথার মাঝে একটা 'কিন্তু' আছে। কাছের মানুষটির সাথে আমার দেখা হয়েছে সব মিলে দুটিবার! জ্বি। মাত্র দুটোবার!! এটিই 'কিন্তু'-টির সারকথা। শুধু কি তাই? এই দুই সাক্ষাতের ভেতরও একখানা মজার কো-ইন্সিডেন্ট আছে। ওর সাথে আমার প্রথম দেখা একটা কালচারাল ফেস্টিভালে। কিন্তু এর আগ থেকেও কথা হতো ফোনে। জমিয়ে আড্ডা হতো ফেসবুক চ্যাটিং এ। যেদিন প্রথম সাক্ষাতের একেবারে দ্বারপ্রান্তে সেদিন আমার বুক কেমন যেন ঢিপঢিপ করছিল। মনে হচ্ছিল কেউ আমার বুকের ঠিক মাঝখানটাতে অবিরাম ছন্দে ছন্দে ছোট একখানা হাঁতুড়ি দিয়ে মৃদু পেটাচ্ছে তো পেটাচ্ছেই। থামবার নামটি নেই! সামনাসামনি হতেই আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। কোন এক অদৃশ্য আকর্ষণ-প্রচন্ড আকর্ষণ-ওকে আলিঙ্গনে টেনে নিতে বাধ্য করলো। জড়িয়ে ধরে বলেছিলামঃ শুভ জন্মদিন!! দু'জগতেই সমৃদ্ধি হোক তোমার।

২. সৈয়দ মুজতবা আলী। বাঙলা সাহিত্যে এক কিংবদন্তীর নাম। খুব প্রিয় কিছু লেখকদের একজন। বেশ ক'বছর ধরে ওনার প্রেসক্রিপশান ফলো করার জোর চেষ্টা চলছে। আজ্ঞে না। উনি ডাক্তার ফাক্তার কিছু নন। আবার ডাক্তারও!! মনের ডাক্তার। দেখেন না কেমন কলমের খোঁচায় মন পাল্টে দেন অনায়াসে। প্রেসক্রিপশনখানা খুঁজে পেয়েছিলাম তাঁর 'পঞ্চতন্ত্র'-তে। জব্বর প্রেসক্রিপশন! আরে শুনেই দেখুন না কী বলছেন সৈয়দ সাহেবঃ "বারট্রান্ড রাসেল বলেছেন, 'সংসারে জ্বালা-যন্ত্রণা এড়াবার প্রধান উপায় হচ্ছে, মনের ভেতর আপন ভুবন সৃষ্টি করে নেয়া এবং বিপদকালে তার ভেতরে ডুব দেওয়া। যে যত বেশী ভুবন সৃষ্টি করতে পারে, ভব যন্ত্রণা এড়াবার ক্ষমতা তার ততই বেশী বেশী হয়।'

অর্থাৎ সাহিত্যে না পেলে দর্শনে, দর্শনে কুলিয়ে উঠতে না পারলে ইতিহাস, ইতিহাস হার মানলে ভূগোল-আরো কত কি!

কিন্তু প্রশ্ন,এই অসংখ্য ভুবন সৃষ্টি করি কি প্রকারে?

বই পড়ে। দেশ ভ্রমণ করে। কিন্তু দেশ ভ্রমণ করার মত সামর্থ্য এবং স্বাস্থ্য সকলের থাকে না, কাজেই শেষ পর্যন্ত বাকি থাকে বই।"

আমারও একই দশা! ভবযন্ত্রনা একটি অবধারিত ললাট-লিখন। এদিকে দেশ ভ্রমণেরও সামর্থ্য নেই। কিন্তু বই পড়ার সামর্থ্য তো আছে! তাই বই পড়ার চেষ্টায় আছি। প্রচুর বই।

ঘটনাটি ওর সাথে দেখা হবারও আগের। একদিন একটা ফোন পেয়ে তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে অফিসে গেলাম। কুরিয়ার সার্ভিসের অফিস। একটা পার্সেল হাতে নিয়ে দেখি প্রেরকের নাম-ঠিকানা কিচ্ছুটি নেই! প্রাপকের সব ঠিকঠাক!! ভারী টেনশনে পড়ে গিয়েছিলাম। বাসায় এসে তর সইছিল না। তড়িঘড়ি করে হলুদ প্যাকেটটা খুলে দেখি একগুচ্ছ বই!! একটা বই খুলতেই বেরিয়ে আসলো একটা চিরকুট। তাতেলেখাঃ

"পরিচয় যখন আত্মার- কেবল একটু খানি স্পর্শ দিলাম।"

আমার বুঝতে বাকি রইল না কে সে? শুধু আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠেছিল সেদিন।

৩. 'ভালোবাসা'-শব্দটি বেশ সাবজেক্টিভ। একেক জনের কাছে এর স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন। যেমন কাজীদার কথাই ধরুন। তিনি বেশির ভাগ সময় ভালোবাসার স্বাদ চেখেছেন বিদ্রোহের লাল গালিচায় চড়ে। তাঁর 'বিদ্রোহী' কবিতা যার সাক্ষ্য দিয়ে চলেছে আজ অবধি। তাঁকে এনে দিয়েছে 'বিদ্রোহী কবি'-র খেতাব।

এবার রবিদার কথা বলি।

তিনি স্রষ্টা কে নিবেদন করে লিখেছেন, " তোমার গানের ভেতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি, তখন তারে চিনি আমি তখন তারে জানি।"

কিংবা মুসলিম রেঁনেসার কবি ফররুখের কথাই ধরুন। তিনি ভালোবাসা খুঁজে পেয়েছেন ঘুমন্ত মুসলিমদের জাগিয়ে তোলার ভেতরে!! কী অদ্ভূত আর আশ্চর্য ক্ষমতা তাঁর!! জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর আদর্শের সাথে আপোস করেন নি!

অথবা সৈয়দ মুজতবার কথাই বলুন।

তিনি ভালোবাসাকে কি অদ্ভূত যন্ত্রনাময় করে উপস্থাপন করেছেন তাঁর "শবনম" উপন্যাসে!!

একেক জনের কাছে ভালোবাসার ভিত্তি একেক কিসিমের। আমার কাছে আবার 'ভালোবাসার ভিত্তি' হলো- "বিশ্বাস"। হ্যাঁ!! বিশ্বাস-ই। যে বিশ্বাসের বলে সীসা ঢালা প্রাচীর তৈরী করা যায়। যে বিশ্বাস স্বদেশ ছেড়ে আসা কিছু ভাইয়ের জন্য অনন্য ত্যাগের উদাহরণ সৃষ্টিতে প্রেরণা যোগায়, সেই বিশ্বাসের উপর নির্মিত ভ্রাতৃত্বের টাওয়ারে ভালোবাসার পতাকা লাগানোতেই আমার পরিতৃপ্তি।

৪. মজার বিষয় হলো-ওর সাথে দ্বিতীয় বার যখন দেখা সেদিন ছিলো আমার জন্মদিন! বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ ওই দিন ফোন দিয়ে বললো আমার সাথে নাকি অমুক জায়গায় ওর পরিচিত এক ভদ্রলোক ইমারজেন্সি দেখা করতে চান। কি আর করা! রওয়ানা দিয়ে 'অমুক' জায়গায় পৌঁছতেই আমার চক্ষু চড়কগাছ!! দেখি ওর সেই পরিচিত ভদ্রলোকের সাথে ও নিজেও হাজির!! আনন্দের অতিশয্যে বুকে জড়িয়ে নিয়ে বললাম, "দুষ্ট!! এভাবে কেউ সারপ্রাইজ দেয়!"

ওর সাথে ওটাই ছিল শেষ দেখা। শেষ দেখার কদিন পরই ও তুরস্কে স্কলারশিপ নিয়ে চলে গিয়েছিল। শেষ দেখায় দীর্ঘ আড্ডা শেষে রাতে বাসায় ফেরার আগ মূহুর্তে বিদায় বেলায় অনেকক্ষণ বুকে জড়িয়েছিলাম অসাড়ের মত। চোখটা ঝাপসা হয়ে আসছিল বার বার বলেছিলামঃ "মাহমুদ, ভালো থেকো ভাইয়া। আর দু'আয় তোমার এই অধম ভাইটিকে স্মরণে রেখো"।

---

* ছাত্র, ৭ম সেমিস্টার, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আই আই ইউ সি।

শূন্যতায় করুনার অপেক্ষা

মোঃ ইকবাল হোসেন*

আমার হৃদয়ের মাঝে এত শূণ্যতা কেন? আমি বুঝতে পারছি না এ শূন্যতার শেষ কোথায়? হাহাকারে আমার মন আনচান করে কেন! কিসের এত হাহাকার আমার আমি তাও জানি না। অন্তরের মাঝে আমি হাবুডুবু খেয়ে যাচ্ছি শুধু, কিন্তু বুঝতে পারছি না এ হাবুডুবুতে কি হবে। উদাসীনতা আমার দেহমন মানসে হাঁটু গেড়ে বসে আছে! আমি যে কিভাবে এর শিকল থেকে মুক্তি পাব তাও আমার অজানা। অতৃপ্তির আগমন আমাকে বার-বার ছুঁয়ে যাচ্ছে কেন? তৃপ্তির পথ কোন্‌টি, কিসে আমি তৃপ্তি পাব তা আমার কাছে অচেনা। হতাশার আনা গোনায় আমি ক্লান্ত, এর শেষ কোথায়? সফলতার হাতছানি আমাকে কখন ধরা দেবে তা আমি জানি না। আমি ছিটকে পড়ছি কেন বারবার!! কেন আমাকে ছিটকে পড়তে হয়! তা আমার বোধগম্যের বাহিরে। অন্ধকারের মাঝে আমি কেন পথ পাড়ি দিচ্ছি, অমানিশার ভয়াল থাবা আমাকে বার বার গ্রাস করে ফেলেছে, বুঝতে পারছি না। আলো আমার নিকট এত অসাধ্য কেন! কেন আমি এর খোঁজে পথ পাড়ি দিচ্ছি না? তা আমি জানি না। সাগরের মাঝে আমি তলিয়ে যাচ্ছি বার-বার , কিন্তু কেন আমি তলিয়ে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি তাও আমার অজানা। ধ্বংসলীলার মাঝে আমি আশার আলো দেখি কেন, যুদ্ধের মাঝে আমি কেন স্বপ্নকে লালন করি। মরুর বুকে পিপাসার্ত আমি, কিন্তু পানি খুঁজে পাচ্ছি না। কোন পথে যাত্রা করলে পানি পাব, সে পথ অচেনা আমার কাছে। দিবালোকের স্পষ্ট বিষয়াদি আমার নিকট এত অস্পষ্ট কেন? কেন আমি দেখতে পাচ্ছি না এসব, কি করলে দেখতে পাব আমি তাও জানি না। গহীন অরণ্যে আমি হারিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু কেন আমি এ অরণ্যে যাত্রা শুরু করলাম আমার জানা নেই। হিমালয়-সম পর্বত বুকে উঠবার দুঃসাহস আমার মাঝে এসে কেন বাসা বাঁধে। আমি তো অক্ষম এ দুঃসাহসিক অভিযানে, কিন্তু এরই মাঝে উঠবার এত আশা কেন আমার। সাতার দিয়ে সাগর মহা সাগর পাড়ি দেয়ার ইচ্ছা আমার মনের মাঝে এসে উঁকি দেয় অথচ আমি তো সাতার জানি না। কিন্তু এ দুরাশা কেন আমাকে ডাকছে বার বার। আকাশ পানে, স্বচ্ছল গ্রহে যাবার বাসনা আমার মনে জাগে কেন? এতো আমার জন্য অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু আমার মনের দুয়ারে এসে কেন হাজির হয় তা বুঝতে পারছিনা। কোন পথে আমি এগোচ্ছি, সামনে আমার জন্য কি অপেক্ষা করছে। যুদ্ধ নাকি শান্তি, শেষ নাকি শুরু, শূণ্যতার তীক্ততা নাকি পূর্ণতা, অতৃপ্তির তিক্ত মাকাল নাকি তৃপ্ততার অমৃত সুধা. অমানিশার মহা-ক্লান্তি নাকি আলোর পরশ, বেদনার মেঘ নাকি আনন্দের বৃষ্টি, ব্যর্থতার বৃষ্টির মহা-বিপর্যয় নাকি সফলতার নিঃশ্বাস তা আমার একেবারেই অজানা।

তবে এত অজানা আর শূণ্যতা, ব্যর্থতার আগমন আর অমানিশার ভয়াল ক্ষণে, উদাসীনতা আর অনন্তের মাঝে, হতাশা আর অচেনার সাগরেও একটি জিনিস আমি জানি তা হচ্ছে আমি এক অদৃষ্টের বন্দনা করি, এক মহান সত্তার ইচ্ছায় আমি চলি এবং আমার শেষ ঠিকানা সেই সত্তাই, যাঁর কাছে তাঁর করুনাই আমার সর্বশেষ সম্বল, যা আমাকে অনেক দূর নিয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস। যে করুনায় অমানিশার শত বাধা দুরীভূত হবে। শূন্যতা লাভ করবে পূর্ণতায়। যে করুনা আমাকে পথ পাড়ি দিতে সাহায্য করবে। অতৃপ্তি পেরিয়ে তৃপ্ততার জোয়ারে হাবুডুবু খাব আমি, হতাশার কঠিন শিকল ভেঙ্গে সফলতার শীর্ষ চুড়ায় গিয়ে আমি উত্তীর্ণ হবো দুর্বার গতিতে। হিমালয়ের চুড়াতে উঠা আমার জন্য তখন আনন্দের বিষয়ে পরিণত হবে, ইচ্ছে করলে মুহূর্তেই ঘুরে আসব প্রশান্ত, আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে। যে করুনাতে আমাকে আর ধ্বংসলীলার মাঝে কাতরাতে হবে না। যুদ্ধ ক্ষণে বীরত্ব প্রদর্শন করে আমি আমার অধিকার ফিরিয়ে আনব। যে করুণার ফলে আমাকে আর দারস্থ হতে হবে না পিপাসার্তাবস্থায় অন্যের কাছে। আমি থাকব স্বাধীন, অপরিমেয়, দীপ্ত সদা দুর্বার গতিতে পারদর্শী হয়ে উঠব আমি বিশ্ব বুকে। মাথা উঁচু করে একক সত্তার ঘোষনা দিয়ে বলব আমি মুসলিম, চির দুর্বার চির নির্ভীক, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতায় আমার পথ চলা এটি বিশ্ববাসীকে বুঝাতে সক্ষম হবো, আমি আছি, সেই সত্তার সেই অদৃষ্টের, সেই করুনার অপেক্ষায়।

---

* ছাত্র, ৬ষ্ঠ সেমিষ্টার, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আই আই ইউ সি।

"হীরে ছড়ানো ক্ষেত"

মাহমুদা আক্তার*

আফ্রিকার এক কৃষক সুখী ও পরিতৃপ্ত জীবন নির্বাহ করত। সে সুখী, কারণ তার যা ছিল তাতেই ছিল সন্তুষ্ট। আবার সে সন্তুষ্ট বলেই সুখী ছিল। একদনি একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি তার কাছে হীরের মহিমা কীর্তন করে হীরের ক্ষমতা সম্পর্কে অনেক কথা বললেন। তিনি জানালেন "তোমার যদি বুড়ো আঙ্গুলের আকারের একটি হীরে থাকে তবে তুমি একটি শহরের মালিক হতে পারবে।"এই বলে বিজ্ঞ ব্যক্তিটি চলে গেলেন কিন্তু সেই রাত্রে কৃষক আর ঘুমাতে পারল না। তার মনে সুখ ছিল না, কারণ হীরের অভাবে সে অতৃপ্তির বোধে পীড়িত। অতৃপ্ত বলেই সে অসুখী। পরদিন থেকেই কৃষক তার খামারবাড়ি বিক্রি করার জন্য তোড়জোড় শুরু করে দিল। শেষ পর্যন্ত সমস্ত বিক্রি করে, তার পরিবারকে একটি নিরাপদ জায়গায় রেখে সে বেরিয়ে পড়ল হীরের খোঁজ করতে। সারা আফ্রিকা সন্ধান করে কোথাও হীরে পেল না। সারা ইউরোপ খুঁজল, কিন্তু সেখানেও কিছুই পেল না। যখন স্পেনে পৌছঁল তখন সে শারীকির মানসিক এমনকি অর্থনৈতিক দিক থেকে সম্পূর্ণ বিদ্ধস্ত। চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে অবশেষ বার্সেলোনা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সে আত্মহত্যা করল।

এদিকে যে লোকটি খামারবাড়িটি কিনেছিল সে একদিন সকালে ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট নদীটিতে উটকে জল খাওয়াচ্ছিল। নদীর ওপারে একটি পাথরটুকরোর উপর সকালের রোদ পড়ে রংধনুর মতো বিচিত্র রঙে ঝকঝক করে উঠল। বসার ঘরের টেবিলের উপর পাথরটি বেশ ভালো দেখাবে মনে করে লোকটি পাথরটি কুড়িয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরল। সেদিন বিকেলেই সেই বিজ্ঞ ব্যক্তিটি বাড়িতে এসে টেবিলের উপর ঝকমকে পাথরটি দেখে জিজ্ঞেস করলেন "আরমান কি ফিরে এসেছে?" আরমান ছিল পুরোনো মালিকের নাম। খামারবাড়ির নতুন মালিক বললেন. "না, কিন্তু একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?" বিজ্ঞ ব্যক্তিটি বললেন, "ঐ পাথরটি একটি হীরে, আমি হীরে চিনি" মালিক কিন্তু মানতে চাইল না, সে বলল, না এটি একটি পাথর, আমি নদীর ধারে কুড়িয়ে পেয়েছি। আমার সঙ্গে আসুন, দেখবেন সেখানে ঐ ধরনের পাথর আরও অনেক আছে। তারা দু'জনে কিছু পাথর কুড়িয়ে পরীক্ষার জন্য জহুরির কাছে পাঠিয়ে দিল। পাথরগুলো হীরেই দেখা গেল সমস্ত ক্ষেতটিতেই একরের পর একর জুড়ে অজস্র হীরে ছড়ানো আছে।

এই গল্পটি কি নীতি শিক্ষা দেয়?

১) হাতের কাছের সুযোগটিকে যথার্থ ভাবে সদ্ব্যবহার করাই সঠিক মনোভাব। একরের পর একর বিস্তৃত হীরে ভরা ক্ষেতটি ছিল হাতের কাছের সুযোগ। সোনার হরিণের সন্ধানে না ছুটে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রাপ্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করাই উচিৎ।

২) নদীর অপরপারের ঘাসকে অনেক বেশি সবুজ মনে হয়। দূরবর্তী সম্ভাবনাকে মানুষ অনেক বেশি উজ্জ্বল মনে করে।

৩) সুযোগ, সম্ভাবনা বোঝার ক্ষমতা যাদের নেই, তারা সুযোগ এসে যখন দরজায় কড়া নাড়ে, তখন আওয়াজ হচ্ছে বলে বিরক্ত হয়।

৪) নিজের যা আছে তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাই উত্তম। সন্তুষ্ট থাকলে আল্লাহ তা'য়ালা হয়ত আরও বাড়িয়ে দিবেন।

* ছাত্রী, ৭ম সেমিষ্টার, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আই আই ইউ সি।

সুখের সিন্দুক

সানজিদা*

জানালায় দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখ দু'টো অশ্রুতে ভিজে উঠল জয়িতার। হঠাৎ কারো পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়ে চোখ মুছে পিছনে ফিরে দেখলো অয়ন বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। পড়ার টেবিলে বই খুলে রেখে জয়িতাকে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অয়ন মিনিট দু'য়েক ওকে নিরীক্ষণ করে বলল-

-কিরে, বই খোলা রেখে এখানে কি করছিস?

-কিছু না, ভাইয়া। পড়ায় কনসানট্রেট করতে পারছিলাম না তো তাই আর কি...।

-তোর চোখে জল কেন?

এই প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে অয়নের পাশ কাটিয়ে দেয়ালে সাঁটানো ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে জয়িতা হঠাৎ বলে উঠলো- মা মারা যাওয়ার পর থেকে বাবা কেমন যেন বদলে গেছে, তাই না ভাইয়া?

ওদের মা মারা গেছে মাস তিনেক হলো। কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ করেই চলে গেল না ফেরার দেশে। যে জয়িতা মাকে ছাড়া কিছু বুঝতো না, যে জয়িতা নিজ হাতে খাবার খেতে পারতো না, মা বলতেই যে ছিল অজ্ঞান- সেই জয়িতা মাকে ছাড়াই জীবনের নিয়ম কানুন দিব্যি মেনে চলছে। থেমে নেই কিছুই। শুধু ওদের বাবাটা বদলে গেছে। ওর কলেজ পড়ুয়া ভাই বোঝে কিনা কে জানে! কিন্তু ও ঠিক বুঝতে পারছে- বাবা সেই আগের মত নেই। তাই মায়ের শূন্যতা ওকে খুব বেশি পীড়া দেয়।

মায়ের কথা বলায় অয়নের মনটাও কেমন ভারাক্রান্ত হয়ে গেলো। নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে বোনকে সান্তনা দেয়ার উদ্দেশ্যে বলল, হ্যাঁ....ইয়ে....কই নাতো, বাবা তো ঠিকই আছে। মা চলে যাওয়ার পর বাবা আমাদের প্রতি আরও কেয়ারফুল হয়েছে। এই যে দ্যাখ, আমরা যখন যা কিছু চাইছি; পেয়ে যাচ্ছি। এই যে তুই নতুন একটা আইফোন পেয়েছিস, তারপর আমার নিজের একটা ল্যাপটপ এসেছে। তোর মনে নেই, ক'দিন আগে বাবা আমাদের প্যারিসে ঘুরতে নিয়ে গিয়েছিল। তুই যদি চাস তাহলে সামনের সপ্তাহ-য় আরেকটা ট্যুর এর অ্যারেজমেন্ট করা হবে, বাবা আজ সকালেই আমাকে বলল। যদিও অয়ন বোঝে বাবা আসলেই অনেক বদলে গেছে তবু কিছুক্ষণ বাবার পক্ষ নিয়ে বলে থামল।

'হ্যাঁ, আমরা অনেক কিছুই পেয়েছি। কিন্তু এর বিনিময়ে আমরা আমাদের সুখ হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের হাসি-খুশি, আনন্দ, সুখ সব কিছুই মায়ের সাথে ওপারে চলে গেছে। আমরা এখন শো-কেসে সাজানো দামী শোপিসের মত।

অয়নের কাছে মনে হলো জয়িতার কথাগুলো যেন বহু দূর হতে ভেসে আসছে। এ এক কঠিন সত্য। যা উপেক্ষা করার সাহস ওর নেই। সকালবেলা স্কুলের ইউনিফর্ম পড়ে নিজের ঘরের বারান্দায় খাঁচার ভেতরে রাখা লাভ-বার্ড দু'টোর সাথে গল্প করছে জয়িতা। মাঝে মাঝে ওদের শরীরে নরম পালকের ভেতর আঙ্গুল দিয়ে আদরের পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে। এমন সময় ওঘর হতে অয়নের গলার আওয়াজ শোনা গেল। জয়িতার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ঘরে এসে ঢুকলো। ওকে পাখির খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললো কি ব্যাপার জয়ি, তুই এখনো এখানে দাঁড়িয়ে আছিস? আর ওদিকে যে স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে সে খেয়াল আছে? চল তাড়াতাড়ি আমি গিয়ে দেখি ড্রাইভার গাড়ি বের করল কিনা।

দাঁড়াও ভাইয়া, আমি আসছি- বলেই খাঁচার দরজা খুলে দিয়ে জয়িতা পাখিদের উদ্দেশ্য করে বলল-আমার অর্থহীন এই পোশাকি ভালবাসা তোমাদের পোষ মানাতে পারবে না সেটা আমি আগেই বুঝেছি। তোমাদের সুখ বোধ হয় সীমাহীন ওই নীলাকাশের বুকে, তাই না? অয়ন লক্ষ্য করলো, ওর বার'র গন্ডী পেরোনো ছোট বোনটা দিন দিন কেমন যেন বড় মানুষের মত আচরণ করছে। 'মা' হারিয়ে গেলে কি সবাই এরকম অল্প দিনে বড় হয়ে যায়?

স্কুল ছুটির পর বাড়ি না ফিরে জয়িতা স্কুলের পাশের রেল লাইন ধরে হাঁটতে লাগল উদ্দেশ্যহীনভাবে। রেল লাইনের এক ধারে ছোট্ট একটা নদী বয়ে গেছে। নদীর পাড় ঘেষে অচেনা কত ফুলের সমারোহ। রোদ পড়ে এসেছে। বিকেলের মিষ্টি বাতাস কচি সবুজ ঘাসের বুকে যেন ঢেউ তুলেছে। রেল লাইনের অপর পাশে সারি সারি বস্তি ঘর। এখানে কত ধরনের মানুষ যে বাস করে, নিজ চোখে না দেখলে বোঝার উপায় নেই। জয়িতা রেল লাইনের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসব দেখছে। মলিন একটা শাড়ি পড়া মহিলা মাটির চুলায় কড়াই চড়িয়ে কি যেন রাঁধছে। এমন সময় ফ্রক পড়া একটা মেয়ে পেছন থেকে মহিলার গলা জড়িয়ে ধরে কিছু একটা আবদার করলো। জয়িতা আরও নিকটে গিয়ে দেখল, মহিলাটা হাসি মুখে মেয়ের হাতে দু'টো পিঠা তুলে দিল। আর মেয়েটা পিঠা একটা মুখে পুরে একছুটে সেখান থেকে উধাও হয়ে গেল। জয়িতাকে স্কুল ব্যাগ কাঁধে নিয়ে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মহিলাটা ওকে লক্ষ্য করে নরম গলায় বলল-কি মাইয়া, এরম খাঁড়াইয়া রইছ ক্যান? পিডা খাইবা? জয়িতার কি যে হলো! কিছু না ভেবেই ও একটা হাত বাড়িয়ে দিল। মহিলাটা একটা থালায় দু'টো পিঠা দিয়ে বলল, 'এই হানে বইয়া খাও' যন্ত্রের মত জয়িতা মহিলার নির্দেশ পালন করল। একটা ছেড়া চটের বস্তার ওপর বসে পড়ে ও এমন বাবে পিঠা খেতে লাগল, দেখে মনে হলো ও যেন কয়েক দিনের অভুক্ত। মহিলার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার সেই

---

* ছাত্রী, ৬ষ্ঠ সেমিস্টার, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আই আই ইউ সি।

রেললাইন ধরে চারপাশে অবাক দৃষ্টি মেলে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে চোখ আটকে গেল একটা দৃশ্যের ওপর। একটা মধ্যবয়সী লোক তার ছোট ছেলে-মেয়ে দু'টোকে ভাত মেখে খাইয়ে দিচ্ছে। একটা বাচ্চা গলা জড়িয়ে ধরছে তো আরেকটা কোলে উঠে বসছে। আর লোকটা বাচ্চাদের দুষ্টুমী উপভোগ করে প্রাণ খুলে হাসছে। আরেকটু সামনে এগিয়ে দেখল, ঘরের দরজায় বসে একটা বড় মেয়ে আরেকটা ছোট মেয়ের চুলে চিরুণী চালিয়ে বেণী বেঁধে দিচ্ছে। বোধহয় দু'জন বোন। বেণী বাঁধা হয়ে গেলে ছোট বোন বেণী দুলিয়ে দুলিয়ে খেলার সাথীদের নিয়ে চলে গেল। শান্ত নদীর বুকে তাকিয়ে দেখল ওর বয়সী কতগুলো ছেলে উদোম গায়ে নদীতে ঝাপিয়ে পড়ে জল ছিটিয়ে আনন্দ করছে। কেউ কেউ ডুব সাঁতারের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। জয়িতা আরও দু'কদম সামনে এগোলো। দেখল, একটা যুবক ছেলে একটা মেয়ের পায়ে আলতা পরিয়ে দিচ্ছে। সম্ভবত ছেলেটার বউ। বড় শখ করে আলতা কিনে এনে নিজেই বউয়ের পায়ে পরিয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে বউ রসিকতা করে আলতা নিয়ে বরের গালে মেখে দিচ্ছে আর খিল খিল করে হাসছে। ছেলেরা ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। একজন আরেকজনের ঘুড়ির সুতো কেঁটে দিয়ে বিজয়ের হাসি হাসছে। ছেড়া ঘুড়ি নিয়ে অন্য ছেলেটা মুখ ভার করলে বিজয়ী ছেলেটা ওর কাঁধে হাত রেখে বলল কইল তুই আমার ঘুড্ডির সুতা কাডিস'।

কখন যে সূর্য তার নীড়ে ফেরার জন্য তোড়জোর শুরু করেছে জয়িতা টেরই পায়নি। যখন টের পেল তখন দ্রুত পা বাড়ালো বাড়ির পথে। বাড়ি পৌঁছেই বাবার মুখে মুখি হতে হলো জয়িতার। বাবা গম্ভীর মুখে বসার ঘরে পায়চারি করছেন। পায়চারি থামিয়ে কিছুটা রাগত স্বরেই ওর দেরিতে ঘরে ফেরার কারণ জানতে চাইলেন। 'ক'টা বাজে এখন? তোমার স্কুল ছুটি হয় ক'টায়? কোথায় গিয়েছিলে তুমি? জয়িতা মাথা নিচু করে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকে। কি বলবে সে? বাবা আবার প্রশ্ন করলেন 'আমি তোমার কাছে কিছু জানতে চাইছি, জয়ি। আমার কথার উত্তর দাও। জয়িতা খুঁজে পায় না সে কি বলবে। দেয়ালে সাঁটানো মায়ের ছবিটার দিকে হঠাৎ চোখ পড়তেই জয়িতা মুখ শক্ত করে জবাব দিলো সুখ খুঁজতে গিয়েছিলাম। তারপর নিজের ঘরে চলে গেলো। ওর এমনতরো জবাব শুনে বাবা হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি আর কোন কিছু বললেন না। হয়তো কোন কিছু বলারও ছিল না। দৃষ্টি ঘুরিয়ে জয়িতার মায়ের ছবিটার দিকে কেবল নিষ্পলক তাকিয়ে রইলেন। ক্লাস সেভেনে বাংলার নতুন ম্যাডাম এসেছে। ম্যাডামের চেহারায় কেমন যে একটা গভীর মায়া জড়িয়ে আছে। ক্লাসের সবার সাথে পরিচয় পর্ব শেষ করার পর ধীরে ধীরে তিনি বললেন বলতে পারো সুখ কি জিনিস? সুখ কোথায় থাকে? ম্যাডামের এমন কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলো জয়িতা। একটু থেমে ম্যাডাম আবার বললেন, সুখের সংজ্ঞা লিখে আনো দেখি, এতে অবশ্য কোনো মার্কস দেয়া হবে না। মেয়েরা লিখতে শুরু করল। জয়িতা সাদা কাগজের বুকে কলমের আঁচড় কাটছে আর ভাবছে কি লিখবে সে? সুখের সংজ্ঞা কি তার জানা আছে? কে যেন হঠাৎ বলে উঠলো- 'হ্যাঁ তোমার জানা আছে, তুমি লেখ' জয়িতা লিখতে শুরু করল। সুখ জিনিসটা আপেক্ষিক। এটা একেকজনের কাছে একেক রকম। কেউ ধনে সুখী, কেউ মনে সুখী। তবে সত্যিকার সুখ সেটাই যেটা হৃদয়ের ভিতর থেকে আসে। সেদিন রেল লাইনের ওই বস্তির পাশ দিয়ে যেতে যেতে মনে হয়েছিল, পৃথিবীর সমস্ত সুখ যেন ঐ বস্তিকে ঘিরেই আছে। মা মারা যাওয়ার পর এই প্রথম কোথাও গিয়ে সুখের সন্ধান পেলাম। আমার মনে হল প্রকৃত সুখ বস্তির ওই মহিলার তেলে ভাজা পিঠার মধ্যে আছে। সেই লোকটা, যে সারাদিনের খাটুনির পরও বাচ্চাদের খাইয়ে দিতে দিতে মিষ্টি দুষ্টুমীতে মেতে উঠেছিল। সেইখানে সুখ আছে। সেই মাখা ভাতে তৃপ্তি আছে। বড় বোনের বেঁধে দেয়া ছোট বোনের চুলের বেণীতে সুখ জড়িয়ে আছে। সেই বউয়ের পায়ে বরের লাগিয়ে দেয়া আলতায় নির্ভেজাল সুখ লেপ্টে আছে। সুখ আছে নদীতে স্নানরত ছেলেগুলোর ভেজা শরীরে। সুখ আছে ছেঁড়া ঘুড়িতে আর বস্তির ছেলের ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা হাসিতে। আর সুখ আছে আমার বুকের ভেতরের সিন্দুকটায়। যেখানে পরম যত্নে রাখা আছে আমার মায়ের আদরের গন্ধ, মধুমাখা হাসি আর অনাবিল ভালবাসা। জয়িতার লেখা পড়তে পড়তে নতুন ম্যাডামের চোখ দু'টো ভিজে উঠল। ম্যাডাম জয়িতার দিকে তাকালেন। জয়িতাও তাকালো। জয়িতার হঠাৎ মনে হলো ওর মায়ের সাথে ম্যাডামের কোথায় যেন একটা মিল রয়েছে। জয়িতার চোখ দু'টো কেন যেন জ্বালা করে উঠলো। একটু পর কান্নার ঢেউ এসে ওর চোখ দু'টো ভিজিয়ে দিয়ে গেল।

মা কেন এমন

ছামিনা আবেদীন*

মা,
কেন তুমি এমন? এত মমতা কেন তোমায় ঘিরে আছে মা? তোমার কোলে কেন শান্তি, বলতে পারো তোমায় কেন ভরসা করি। মাগো কেন তুমি এমন? তোমার নামে কেন এত মধু, তুমি দেখতে খুব সুন্দর মা।

মা,
কেন তুমি এমন? তোমার ভিতর কেন এত পৃথকতা? তোমার অন্য সন্তানদের মতই আমিও তোমার সন্তান বলে মানুষ হয়েছি, আমিও তোমাকে মা বলে ডেকেছি, শুধু আমি তোমার গর্ভে জন্ম নেইনি- এটাই কি আমার দোষ ছিল মা? জন্ম নেয়ার সময় আমি কি জানতাম কার কোলে আমি জন্মেছি?

আম্মু,
জানতো পৃথিবী বড়ই নিষ্ঠুর, এখানে যার আছে তার সবই আছে, আর যার নেই ভাগ্যও তার সাথে বিড়ম্বনা করে। তা নাহলে আমি তো কিছুই চাইনি কখনো, শুধু মায়ের আদর চেয়েছি।

জানো মা,
আমার যখন কষ্ট হয় তখন তোমার মুখের দিকে তাকাই। সব কষ্ট ভুলে যাই তোমায় দেখলে, আমি জানি মা, আমার আম্মু ডাক শুনতে তোমার একটুও ভাল লাগে না, কিন্তু কি করব বলো? আমার মা তো তুমি, আম্মু। তোমাকেই তো ছোটকাল থেকেই জেনেছি, চিনেছি, ভালোবেসেছি।

জানো আম্মু।
তোমার হাতের সেই মারকে আমি এখন খুব মিস করি, খুব ইচ্ছে করে তোমার কাছে ছুটে যেতে, তোমার সাথে কথা বলতে, কিন্তু আমার কণ্ঠ শুনলেই তো তুমি ফোন কেটে দাও। আম্মু, তুমি যে আমাকে সেই চার বছর বয়সে একবার লাঠি দিয়ে মেরেছিলে সেই দাগগুলো এখনও দগদগে হয়ে ফুলে আছে পিঠে, আমি এখনও ছুঁতে পারি মা।

মাগো!
খুব মনে পড়ে তোমায়। আমার কথা কি তোমার একবারও মনে পড়েনা? কোনদিন কি ইচ্ছে করেনা আমাকে দেখতে- সেদিন তোমায় খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল তাই বাড়িতে গিয়েছিলাম। তুমি সবার সামনেই আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিলে। কেন এমন করলে মা। তোমার অন্য সন্তানরাও তো ওখানে ছিল- তবে আমার দোষটা কোথায় ছিল মা? আমার দোষ কি শুধু এটাই যে, তোমরা আমায় কুড়িয়ে পেয়েছ?

মা
তোমার ঋণ আমি কোন দিন শোধ করতে পারবনা। তুমি আমাকে কোলে তুলে না নিলে এতদিনে হয়তো আমি মরে যেতাম। এতটুকু পড়েই আছিয়া বিবির চোখ ঝাপসা হয়ে এল। তিনি এতক্ষণ একটা ডায়েরির কিছু লিখা পড়ছিলেন। ডায়েরিটা তার বড় বোনের পালিত মেয়ের। নাম আকিলা হুরাইন, নামের অর্থের মতই বুদ্ধিমতি, আর হুরদের মতই সুন্দরী। আছিয়া বিবি নিঃসন্তান। প্রায় ২৫ বছর হতে চলল তার বিয়ের। কিন্তু এখনো কোন সন্তান তার কোলে আসেনি। তিনি অনেকবার আকিলাকে নিয়ে আসতে চেয়েছেন কিন্তু দুলা ভাই দেয়নি। অবশ্য দুলাভাই মারা যাওয়ার পরও আনতে চেয়েছেন, কিন্তু তখন বুবু রাজি হয়নি। কেন- সেটা তিনি আজো জানেন না। তিনি প্রায়ই ভাবেন আকিলাকে যেমন বুবুরা কুড়িয়ে পেয়েছিল তেমনি তিনিও যদি একটা কুড়িয়ে পেতেন। আকিলার পরিচয়টা তো জানা হলোনা, আকিলার মা-বাবা কে সেটা সে জানে না। কয়েকদিন আগেও সে যাদের মা-বাবা বলে জানত, তারা তার আসল বাবা-মা নয়। কথাটা সে মেনে নিতেই পারছেনা, তাকে নাকি একটা খালের পাশে কুড়িয়ে পেয়েছিল। তার বাবার জন্যেই তার মা তাকে কোলে করে মানুষ করেছেন। কয়েকদিন আগে তার মাকে দেখতে গিয়েছিল তখন তার মা কথাগুলি বলে তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেয়। সে তখনই তার খালামনির সাথে তার বাসায় চলে আসে। তার খালামনি খুব ভালবাসেন তাকে। খালামনির জন্যে খুব কষ্ট হয় তার। আকিলা তার কষ্টের কথা কাউকে বলে না শুধু নিজের ডায়েরিতেই লিখে। মনটা হালকা হয়। আজ সে খুব ক্লান্ত তাই ডায়েরিটা টেবিলের উপর রেখেই ঘুমিয়ে পড়ে। আছিয়া বিবি আকিলার রুমে গিয়ে টেবিলের উপর ডায়েরিটা দেখতে পেয়ে পড়ছিলেন। তার মনটা ব্যাথায় কেঁদে উঠল। আকিলা একটা প্রাইভেট ভার্সিটিতে প্রথম বর্ষে পড়ছে। ছোটকাল থেকেই ধর্মের অনুশাসন মেনে চলার চেষ্টা করে। পড়ালেখায়ও ভাল। এখন কো-এডুকেশনের এই যুগে এরকম মেয়ে দেখা যায় না।

---

* ছাত্রী, বিবিএ ১ম বর্ষ (বি), আই আই ইউ সি।

যাই হোক আছিয়া বিবি ডায়েরির বাকি পৃষ্ঠাগুলো উল্টাতে লাগলেন। এক জায়গায় এসে তার চোখ থেমে গেল। লাল আর নীল কালির কিছু লিখা- চমকে উঠলেন উনি, কি এমন লিখা আছে ওখানে চলুন আমরাও পড়ে দেখি-

"আজ ২০ নভেম্বর ২০১৩ কয়েক দিন আগে একটা ছেলে আমাকে ফলো করেছিল। সেটা আমার টিচাররা আমাকে বলে সাবধান করে দেয়। আমি স্বভাবতই কারো সাথে কথা বলিনা। ছেলেদেরকে আমার খুব ভয় হয়। তাই ভয় পেয়ে গেলাম। কিন্তু স্যার আমাকে অভয় দিলেন। তিনি আম্মুর নাম্বার নিয়েছিলেন। আম্মুকে আমার কথা বলতেই আম্মু নাকি কল কেটে দিলেন। আমি জানিনা আম্মু কেন এমন করল?

যাই হোক, আজ স্যার আমাকে এসব কথা বলতেই আমার খুব কান্না পেল। স্যার আমাকে সমস্যাটার কথা জিজ্ঞেস করলেও আমি কিছু বলতে পারিনি। শুধু মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন আসল "মা কেন এমন"?

আমি স্যারের সামনে আর দাঁড়াইনি, দৌড়ে বেরিয়ে এলাম, বাইরে এসে রিকসা পেলাম না। হাঁটছিলাম কিছু সময় এমন সময় কেউ একজন পেছন থেকে বলে উঠল "এইযে শুনুন আপনার একটু সময় হবে"।

তখনও আমার চোখে অনেক পানি ছিল যা বৃষ্টির মত বেয়ে পড়ছিল। নেকাবের কারণে বাইরে দেখা যাচ্ছিল না বলে রক্ষা, আমি তাড়াতাড়ি চোখ মুছে জিজ্ঞেস করলাম "আমাকে বলছেন? উনি সম্মতি জানালেন, ছেলেটার দিকে তাকিয়ে চিনতে পারলাম। কয়েক দিন আগে আমার বাসার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। খুব ভয় করছিল আমার, তবু বললাম কিছু বললে একটু তাড়াতাড়ি বলুন।

ছেলেটা আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। আমি তখন বললাম "আমাকে যদি একটা ভাল মা আর একটা ভাল বাবা দিতে পারেন তবে আমি সম্মতি দিব। আপনি যদি আমাকে একটাই কথা দিতে পারেন তবেই আমি আপনাকে কথা দিব"। ছেলেটা আমাকে কথা দিয়েছিল। আমি জানিনা আল্লাহ তা'আলা আমার কপালে কি রেখেছেন? তবু সেই আল্লাহর দরবারে ভিক্ষা চাই মায়ের ভালোবাসা। হে আল্লাহ, তুমি আমাকে ধৈর্যশীল ও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করো। আর আমাকে মা-বাবার আদর-ভালোবাসা পাওয়ার তাওফিক দান করো। আর আমাকে জীবনে একজন পরিপূর্ণ মুসলিম হিসেবে গড়ে উঠার তাওফিক দান করো, আমীন"।

লিখাগুলো পড়ে আছিয়া বিবি কান্না সামলাতে পারলেন না। তিনি বুঝেন মা ডাক শোনার যন্ত্রণাটা কি হতে পারে? তিনি পুরো ডায়েরিটা পড়ে যখন শেষ করলেন তখন ফজরের আজান হচ্ছে। তিনি উঠে অজু করতে গেলেন। আর মনে মনে দোয়া করলেন, আল্লাহ যেন আকিলার মনের সমস্ত কষ্ট দূর করে দিয়ে তার মনের বাসনাগুলো পূরণ করেন।

আসুন, আমরাও আল্লাহর কাছে সাহায্য চাই যেন জীবনে সফল হতে পারি। আর আকিলার মত যারা আছে তারা যেন মায়ের ভালবাসাটা পায়- তারা যেন মায়ের ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে বলে "মা কেন এমন-কেন এত ভালো"।

আলোর পথের যাত্রী

আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ শাকীক*

সাইদ এবার আলিম পরিক্ষায় উত্তীর্ন হয়ে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর শরীয়াহ ফ্যাকাল্টির অধীনে সাইন্সেস অব হাদিস এন্ড ইসলামিক ষ্টাডীজ (SHIS) বিভাগে ভর্তি হয়েছে মাত্র। সে বরাবরই ভালো রেজাল্ট নিয়ে উত্তীর্ন হয়। তার মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হুজুর থেকে শুরু করে (ছাত্র-শিক্ষক) সর্বমহলেই তার যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। সবার আশা সে আগামী দিনে দেশের খ্যাতমানদের একজন হবে। সে যখন আলিমে গোল্ডন A+ পেয়েছে সবাই ভাবলো সে হয়তো দেশের সেরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবে।

কিন্তু না সে সবাইকে তাক লাগিয়ে ইসলামী শরীয়া'হ পরিচালিত আন্তর্জাতিক মানের বাংলাদেশের একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম জেলাধীন সীতাকুন্ড থানার কুমিরাস্থ আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর (IIUC) স্থায়ী ক্যাম্পাসে ভর্তি হলো। তার বন্ধুরা বলল,আচ্ছা তুমি পাবলিকে ট্রাই না করে সেখানে ভর্তি হলে কেন? ভর্তি হলে ভালো কথা শরিয়াহতে কেন?

সাইদ : দেখ দোস্ত পৃথিবীতে আমাদের সৃষ্টিকর্তা পাঠিয়েছে তার দাসত্ব বা গোলামী করার জন্য। তো কিভাবে তার ইবাদত বা গোলামী করবো তার জন্য পাঠিয়েছেন যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল। তার ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ নবী হিসাবে পাঠিয়েছেন মুহাম্মদ (সা:) কে । যিনি আমার তোদের সকলের নবী যার পরে আর কোন নবী আসবে না যার নাম মুহাম্মদ (সা:)। প্রতেক নবী-রাসুলের একটি কাজ ছিলো মানুষদেরকে আল্লাহর একত্ববাদের দিকে ডাকা। তার মধ্যে কিছু কিছু নবী-রাসূলদের আসমানী কিতাব দেওয়া হয়।

শফিক : তাহলে আমাদের নবী (সা:) এর উপর কি আসমানী কিতাব নাজিল হয়েছে?

সাঈদ : হ্যা, ঠিক তেমনি আমাদের নবী (সা:) এর উপর নাজিল হয় সর্বাধিক পঠিত কিতাব আল-কোরআন। এটি এমন এক কিতাব যাতে মানব জীবনসম্পৃক্ত সব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে তা সংক্ষিপ্ত এবং অর্থবহুল, তাই কোরআনের সর্ববিষয় বুঝা একটু কষ্টকর, এজন্যে কোরআনকে বুঝার প্রথম মাধ্যম হলো, কোরআনের মাধ্যমে কোরআন বুঝা, আর দ্বিতীয় মাধ্যম হলো আল-হাদিস। আর হাদিসের পরিধি এতো বিশাল যা বলে বুঝানো কষ্টকর। তবে এটা বলা যায় যে এটি একটি মহাসাগর। একটি বিষয় খুব সহজে বুঝবে, দেখ আজ পৃথিবীতে সবচেয়ে নির্যাতিত জাতি হলো মুসলিমরা। আবার দেখ এই মুসলমানদেরকে আবার সন্ত্রাসী বা জঙ্গীও বলছে। শুধু তাই নয় এক মুসলমান আরেক মুসমানকে আঘাত করছে। পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায়, অমুসলিমরা তাদের ইচ্ছা মত অসংখ্য জাল হাদিস বানিয়ে কোরআনের ভূল ব্যাখ্যা করে ইসলামকে ভূলভাবে উপস্থাপন করে একশ্রেণীর অশিক্ষিত যুবসমাজকে কৌশলে তারা এসব কাজে নিয়ে যায়। আর এদের মাধ্যমে মুসলিম দেশগুলোতে তারা অশান্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে।

রফিক : তাহলে জংগীদের পিছনে অমুসলিম তথা ইহুদীরাই মদদ দিচ্ছে ?

সাইদ : হ্যাঁ, আবার একশ্রেনীর লোকদের বিভিন্ন লোভ দেখিয়ে তাদের মাধ্যমে তাদের মনগড়া ফাতওয়া দেয়ার ব্যবস্থা করেছে। যার ফলে মুসলিম সমাজে ঐক্যের ফাটল খুব সহজে ধরিয়ে দিয়েছে। এবার তোদের প্রশ্নে আসি আমি কেন হাদিসে ভর্তি হলাম! আমাকে সঠিক ভাবে কোরআন বুঝতে হলে কোরআনের পাশাপাশি হাদিস ও বুঝতে হবে। আর তাই হাদিসের উপর সঠিক এবং গভীর জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে ভর্তি হলাম।

বন্ধুরা : সত্যিই তো আমরা তো কখনো এভাবে ভাবি না।

সাইদ : আমাদের উচিত একজন সচেতন মুসলিম হিসাবে ইসলামের ইতিহাস,ইসলামের বিধিবিধান এবং আর্ন্তজাতিক অংগণে ইসলামের অবস্থান জানা দরকার। তোরা আমার জন্য দোয়া করিস, আমি যেন মুসলিম জাতির কল্যাণে একজন আদর্শ দায়ী হিসাবে নিয়োজিত থাকতে পারি, পাশাপাশি তোদের ও এগিয়ে আসা উচিত।

---

* ছাত্র, ২য় সেমিস্টার, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আই আই ইউ সি।

এক হজ্ব যাত্রীর গল্প

জারিন তাসনিম*

নুর সাহেব গ্রামের একজন ধনী ব্যবসায়ী। তিনি ছিলেন চরিত্রবান, আল্লাহভীরু এবং দানশীল। গ্রামের সবাই তাঁকে অনেক ভালোবাসতেন। নুর সাহেবের ছিল দুইজন স্ত্রী, তিনি তাঁর স্ত্রীদের খুব ভালোবাসতেন। এবং স্ত্রীরাও তাঁকে অনেক ভালোবাসতেন। দুই স্ত্রীর মাঝে ছিল অনেক ভালোবাসা। একদিন নুর সাহেব মনে মনে ইচ্ছে পোষণ করলেন তিনি তাঁর দুই স্ত্রীকে নিয়ে হজ্ব করবেন। তারপর তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করতে লাগলেন। পরবর্তীতে আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন। তিনি উভয়কে নিয়ে হজ্বের উদ্দেশ্যে গমন করলেন। নুর সাহেবের প্রথম স্ত্রী ছিল সহজ সরল এবং অবুঝ প্রকৃতির। এবং দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন প্রানচঞ্চল। হজ্ব যাত্রা শুরু হলো। এরপর হজ্বের মধ্যে মুযদালিফা ও আরাফায় অবস্থান করার পর যখন মিনায় শয়তানের উদ্দেশ্যে পাথর নিক্ষেপ করতে গেলেন। তখন প্রথম স্ত্রী লক্ষ্য করল সেখানে তিনটি জামরাহ আছে। তারপাশে উপরে একটি খাঁচার মত দেখতে এবং তার ভিতরে একজন ব্যক্তি। প্রথম স্ত্রী ভেবে নিলেন তিনি মুল শয়তান। তিনি তিনটি পাথর ছাড়া বাকি সব পাথর তার গায়ে ছুড়লেন। অবশেষে লোকটি নেমে এসে তাহার হাত থেকে বাকী তিনটি পাথর নিয়ে তিন জামরাহতে মারল বস্তুত তিঁনি ছিলেন দৃশ্য ধারনকারী বা Video Man।

ثقة النفس

عمار زكريا**

الأنهار التي لايجري ماء ها وتقع السدة فى طريق جريانها تفوح منها الرائحة الكريهة التي يمل الناس بشمها كذلك المرء الذي لايثق بقوة نفسه وكرامته يعيش بين قومه ذليلاً مطرودا.

الثقة روح إذا ذهبت فسد العمل وضعفت الخطة فإن العمل لا ينعقد إلا بقدر الثقة.

الثقة سيارة سريعة توصل راكبها إلى غايته في أقل وقت وبأسرع وجه.

الثقة همة عالية يبلغ بها صاحبها قمة الجبل أو نية جازمة تمكنه البقاء في الغابة مع الحيوانات المفترسة.

الثقة كنز أو شيء مفقود أغفله المسلمون تارة وأضاعوه تارة أخرى

بل إن شباب المسلمين في أشد الحاجة إلى التحلي بالثقة التي تلعب دوراً مختلفاً في المجال الفقهي والأدبي والدعوي والفكري والسياسي على المستوى المحلي والعالمي حتى يتمكن لهم أن يصبحوا رواداً في تخليص الأمة من الاختلافات الفقهية والفكرية والسياسية التي تضر بمصالح الأمة الإسلامية ضرراً كبيراً.

فهم في أمس الحاجة في هذا الزمن الرهيب إلى التزين بالثقة التي استطاع بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مشارق الأرض ومغاربها في أقل من نصف قرن واحتلوا قلوب الناس بالمحبة قبل أن يفتحوا بلادهم بالسيف.

ولا تزال الأمة الإسلامية تتمنى منهم أن يمتازوا بالثقة التي تؤديهم إلى إطفاء نار العداوة والبغضاء الفاشية بين هذه الأمة والتي تدفعهم إلى استعادة المجد والثروة والغيرة الماضية والصلة الأخوية التي تميز بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى بناء مجتمع إسلامي أفضل.

أعبر هنا عن ثقة تشعر المسلمين بأن هذا العصر يمر بأزمة كثر فيه الذبح والقتل والحرق والاضطهاد التي يواجهها الأمة والإنسانية في شتى أنحاء العالم بشكل رهيب يتقطر له قلب كل مسلم غيور.

ثم هذه الثقة ترشدهم إلي كيفية بناء مجتمع سليم يعيش فيه المسلمون كجسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

أخيراً نقول:

الثقة همة عالية — يكون بها المسلم غيوراً

وهي قوة يقوى — به الغافل ويشد الأزرا

فتجهز لأمرك وتنشط — بالثقة إن كنت حائراً

---

* ছাত্রী, ১ম সেমিস্টার, সাইন্সেস অব হাদিস এ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আই আই ইউ সি।

** الطالب في الفصل الخامس، قسم الدعوة والدراسات الاسلامية، الجامعة الاسلامية العالمية شيتاغونغ

কবিতা

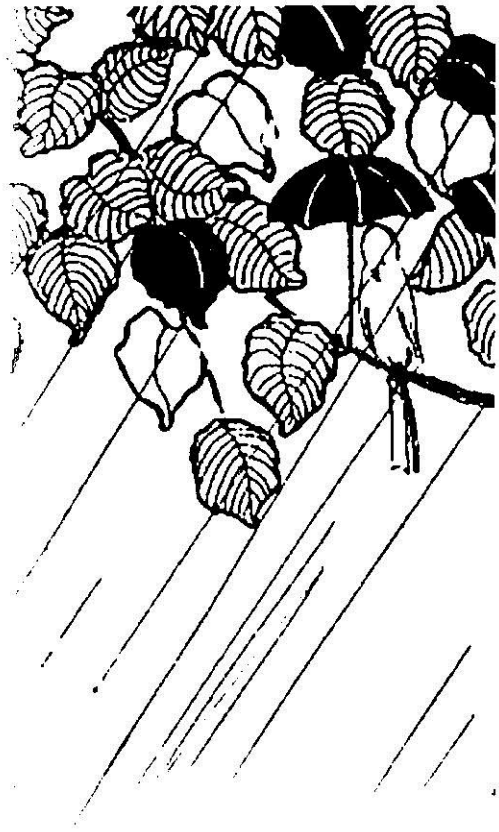

الشتاء

عمار زكريا *

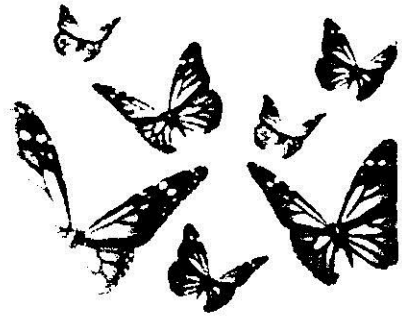

أقبل الشتاء علينا بأوابده ... ليملأ شعورنا بمحاسن عجائبه

يفتش الشاعر مجال شعره ... وبه يعبر ضميره بكلاكله

يطول فيه الليل للقيام ... ويقصر فيه النهار للصيام

أعشاب الليل تبتل بالندى ... تسقط على الأرض بظهور السماء

ويأتى فيه من الطيور ضيوفها ... تعجبنا صورها وأخلاطها

هواء الصبح تروح النفوس ... تسر القلوب وتيسر الأنفاس

يجعل الله الأفلاك صافية ... والأرضين يحولها ناضرة

سفوره يستمتعون بالبرد ... ويرجونه ليطيل الأبد على لبد

*الطالب في الفصل الخامس قسم الدعوة والدراسات الإسلامية الجامعة الإسلامية العالمية شيتاغونغ

শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠা-নামা

সানজিদা*

এই পবিত্র উপত্যকায় আজ কোনো প্রাণের স্পন্দন নেই
এখানে শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠা নামা।
এখানে শিশু নেই, রমণী নেই;
এখানে হাসি নেই, এখানে কোনো আনন্দ নেই,
দৈত্যের আনাগোনায় এই জনপদ এখন মৃত।
ইফতারের গ্লাসে শরবত এখন পরিণত হয়েছে রক্তে,
সাহ্‌রির টেবিলে কোন খাবার নেই; সব খন্ডিত মানবাংশ।
এই জনপদের আর্তচিৎকার কেউ শোনে না
সবাই বধির হয়ে গ্যাছে।
ধ্বংস স্তুপের ভারে ন্যুব্জ ভূমির করুণ চাহনি কেউ দ্যাখে না
সবার চোখ অন্ধ হয়ে গ্যাছে।
এখানে কোন মানুষ নেই; সবাই মৃত লাশ।
এখানে কোন পথিক রাস্তায় হাঁটে না; কারণ রাস্তাটি নেই,
এখানে নারী স্বামীর জন্যে জানালার গরাদ ধরে রাত জাগে না
কারণ স্বামীটি নেই।
এখানে কেউ নববধু সাজে না; কারণ বিয়ের পোশাক নেই।
এখানে কোন সন্তান জন্মে না,
কারণ গর্ভবতী মা মারা গ্যাছে।
ছায়া বলে এখানে কিছু নেই
বোমার আঘাতে সব ছাই হয়ে গ্যাছে।
বিস্তৃত জমীনে আঁকা রক্তের আলপনা
জীবনের স্বপ্নগুলো আজ আকাশের তারা হয়ে গ্যাছে।
এখানে কোন প্রাণের স্পন্দন নেই
শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠা-নামা।

আলোর প্রভাত

রাফিয়াতুল জান্নাত**

প্রভু আমায় দাও এমন জ্ঞান,
যে জ্ঞান লড়বে সত্যের পথে।
প্রভু আমায় দাও সে শক্তি
যে শক্তি আনবে ধরায়
আলোর প্রভাতী।
প্রভু আমায় দাও সে ভালবাসা,
যে ভালোবাসায় ভুলবোনা তোমায়।
প্রভু আমায় দাও সে হৃদয়
যে হৃদয় ভরিয়ে দেবে
ঈমানের দীপ্ততায়।
প্রভু আমায় দাও সে পথ,
যে পথে আছে নূরের অগ্নিশিখা।
প্রভু আমায় দাও সে ঈমান
যে ঈমানে আছে হৃদয় ভরা ভালবাসা।
প্রভু আমায় দাও সে ধৈর্য্য
যে ধৈর্য্যে পারি ভুলতে
বিরহ বেদনা সকল অমানিশা।

---

* ছাত্রী, ৬ষ্ট সেমিস্টার, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আই আই ইউ সি।
** ছাত্রী, ৭ম সেমিস্টার, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আই আই ইউ সি।

তাকওয়া অর্জনের সোপান

সাবেরা*

এলো তাকওয়া অর্জনের সোপান
পবিত্র মাহে রমজান।
চলে শুধু আল্লাহর গুণগান
ভরে যায় সুখে মনপ্রাণ।
হারাম করে দেয় ফাসাদ
দূর করে দেয় হাসাদ।
নিরব নিস্তব্দ সকালের অনুভব
ভরে যায় সুখের কলব।
পবিত্র কুরআনের সহীহ্ তেলওয়াত
নৈকট্য অর্জনের তাহাজ্জুদ সালাত
মনকে করে পবিত্র
আলোকময় সূর্যোদয়ের মত।
তারাবীর শেষে মোনাজাত
অশ্রুতে ভেসে যায় দু'হাত।
বলি ইয়া রহমান, ইয়া রহিম
রাগ যদি করে মা
যায় বাবার তরে।
রাগ যদি করে বাবা
যায় মায়ের তরে।
কিন্তু তোমার বিকল্পে
যায় আর কার তরে?
দয়াময় খোদা
পারেনা আর থাকতে
সাড়া না দিয়ে
এই অধমের ডাকে।
ঠিক তখনি মনটা সফেদ হয়
সাদা গোলাপের মত।
একদিন যায় দু'দিন যায়
যায় রহমত আর বরকতের দিন।
অতপর উপস্থিত হয় শেষের ১০ দিন
কদর আর মাগফিরাতের দিন।
কত আনন্দ সে দিন
যে দিন হবে কুদর
দূর হবে সকল ফহর
প্রভুর প্রেমে আর বিনয়ী স্বরে
বলি ইয়া রহমান
গায় শুধু তোমারি গুণগান।
তাকাও তুমি এই অধমের দিকে
স্থান করে দাও চির জান্নাতে।

কোথায় যে পাই

হাবিবা বিনতে লোকমান**

শূণ্য মরুর ঢেউ খেলানো বালি
দৃষ্টি সীমায় মরীচিকার ছল
তৃষিত বুক, কাঁখের ঘড়া খালি
কোথায় যে পাই একটু খাওয়ার জল!
কোথায় পাবো একটু ছায়া, ঘাস
রোদের দেশে মেঘ সবুজের ঘর
কোথায় বলো খেজুরবীথির বাস
মরুর তীরে ফুল পাখিদের চর
কোন ভুলোমন এঁকে পায়ের ছাপা
হারিয়েছে দূর সুদূরের বনে
দামাল হাওয়া দিচ্ছেনা লাফ ঝাঁপ
কাঁদছে একি! কিসের ব্যথা মনে
দৃষ্টিজুড়েই খাঁ খাঁ বালিয়াড়ি
বুজিনা ছাই মেঘের শত ছল
তাপ ছড়িয়ে ছুটছে রোদের গাড়ি
কোথায় যে পাই একটু খাওয়ার জল!

---

* ছাত্রী, ১ম সেমিস্টার, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আই আই ইউ সি।
** ছাত্রী, ৭ম সেমিস্টার, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আই আই ইউ সি।

এ কেমন স্বাধীনতা !

মোঃ আজহারুল ইসলাম ফয়সাল*

তোমার চোখে অশ্রু কেন,
তুমি নিশ্চুপ কেন,
তোমার আত্মহারা জয়োল্লাস কোথায় ;
তোমার বুকে এ কি হাহাকার;
বিনিদ্র রাতে ডুকরে কাঁদা"
এ তো তোমার জন্য নয়।
নির্ভীক চিত্তের বিজয়-ধ্বনি"
থেমে কেন আজ তোমার!
লাল সবুজের বর্ণিল পতাকায় নতুন এ রক্তিম আভা কিসের!
চুপ করে থেকোনা, কিছু তো বল।
তুমি তো ভীতু নও,
তোমাকে কাপুরুষতার কালিমা লেপন করার স্পর্ধা'
কারো হয়নি কখনো।
তোমার অদম্য সাহসী হুংকারে ভেসে গেছে সব অবিনাশীর দল।
ক্ষুধিত বদনে অশ্রুহীন নয়নে রক্তের হোলি খেলায় তুমি ই তো জিতেছিলে।
হাজারো মায়ের বুক খালি করে তুমি গড়েছ তোমার অস্তিত্ব।
টুশব্দটি না করে সেদিন বিলিয়ে দিয়েছিল তোমায় প্রতিটি প্রাণ।
তুমি ই তো বলেছিলে;
রক্তের সাগরে ধুয়ে মুছে সব কলঙ্ক কাটিয়ে হয়েছ তুমি স্বাধীন!
তবে আজ কোথায় তোমার সে স্বাধীনতা!
তুমি ই বলেছিলে;
স্বাধীন ভূখন্ডে নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দিতে পারব বাকিটা জীবন!
তবে কি হল আজ তোমার এ স্বাধীন ভূখন্ডের!
চুপ করে থেকোনা, কিছু তো বল।
আজ কেন আবার কেড়ে নিচ্ছ মায়ের বুকের মানিক?
কেন আবার মেতে উঠেছ রক্তের হোলি খেলায়?
তবে কি স্বাধীনতার ৪৪ বছরেও খুব পিপাসিত তুমি!
নাকি সেদিনের সে স্বাধীনতা মিথ্যে!!!
না; এ আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিনা।
চুপ করে থেকোনা, কিছু তো বল।
৭১ এর সেই দিনে ছিলাম না আমি ঠিক ই;
তবে সেদিনের প্রতিটি স্মৃতি নিয়েই আমার স্বপ্নের জাল বুনেছি।
সেদিনের সবকটা মুহূর্ত নিয়ে আমি গর্ব করেছি গোটা বিশ্বের কাছে।
সেদিনের দীপ্ত প্রেরণায় আজ আমার চিত্ত উর্বর;
আমার এ উর্বরতায় তাক লাগাতে চেয়েছিলাম সারা বিশ্বকে।
কিন্তু হায়! আজ এ কি তোমার অবস্থা, এ কোথায় আছি আমি!
আমি কি তোমার কোলে মাথা রেখে একটু শান্তিতে ঘুমাতে পারব;
নাকি ঘুমের মধ্যেই আমার জীবন কেড়ে নিবে তুমি??
চুপ করে থেকোনা, কিছু তো বল।

একটি পাখি

এইচ এম মিজানুর রহমান**

একটি পাখি গাছের ডালে
আপন মনে
মধুর সুরে
মন মাতিয়ে তুলছিলো।
ছোট্ট শিশুর নীরব কাজে
মনের মাঝে
চোখের ভাঁজে
আনন্দে মন দুলছিলো।
ছোট্ট বলে ভাইরে ভাই
মনের চোখে দিলে ফাঁকি
ভাগ্য পাখি
তোমায় ডাকি
বন্ধু সাথী নাইরে নাই।

আমার আশা

বিনতে ফারুক***

আমি হতে চাই ওই বাগানের সুবাসিত ফুল
প্রজাপ্রতি ডানা মেলে যেথা করে ঘুরঘুর।
হতে চাই ওই পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে
নীল আকাশে উড়ে উড়ে আল্লাহ আল্লাহ ডাকে।
তারাদের সাথে কভু করি মিতালী
আনমনে হয়ে যাই চাঁদ, একফালি
খরতাপে হতে চাই নির্মল মেঘ।
মুছে দিতে দুর্দিন হতে চাই ভাবাবেগ
আমার আশা আমি হব এক স্বপ্ন দেখানো কবি।
কলম দিয়ে করব আহবান
গড়ব সুন্দর পৃথিবী।
সব হতে পারি আমি খোদা যদি চায়
তিনি বিনা এই আমি বড় অসহায়।

---

* ছাত্র, ২য় সেমিস্টার, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আই আই ইউ সি।
** ছাত্র, ৭ম সেমিস্টার, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আই আই ইউ সি।
*** ছাত্রী, ১ম সেমিস্টার, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আই আই ইউ সি।

যদি বলি

মোঃ ইকবাল হোসেন*

যদি আমি বলি তোকে
ভাবিস কি তুই গভীর শোকে
মুসলমানের দুর্দশাতে,
ব্যর্থতা আর ক্রান্তি কালে
দুঃখে কাদিস নিরবেতে?
যদি আমি তোকে বলি
করিস কি তুই আহাজারী?
তোর ভাইয়ের-ই ধ্বংশলীলায়,
অনাহারের চিৎকারে কি
আওয়াজ আসে তোর কানেতে?
আমি যদি আরো বলি
কাঁদিস কি তুই দু-হাত তুলে?
রবের কাছে মুক্তি চেয়ে।
ভোগ বিলাসের মোহ ছেড়ে
লোভ-লালসার আশা ঝেড়ে
আমি যদি এবার বলি
রক্তক্ষরণ হয় কিরে তোর
হৃদয়েতে অবিরত?
সাগর মাঝে যেমন থাকে
নিথর দেহ শত শত।
তোকে আমি বলি যদি
গালিবের-ই শেষ নিঃশ্বেসে
সাগর ডেউয়ে রুদ্ধশ্বাসে,
আয়লান নামক ছোট্ট শিশু
কি বলে যায় বুঝিস কিছু?

ফরিয়াদ

এনামুল হাসান রাকিব**

পাপের কালোয় কলুষিত যেন নাহি হয় মোর মন,
সৎ কর্মের মাঝে আমি যেন রয়ে যাই সারাক্ষণ।
পাপ কর্মের মাঝে আমি যেন কভু নাহি পাই সুখ।
সৎ কর্মের কটাক্ষতে নাহি পাই যেন দুখ।
শত বাধা যদি আমার দিকেতে আসে ওহে প্রভু ধেয়ে
তবু আমি যেন এ চলার পথে না পড়ি হোঁচট খেয়ে
এ কঠিন বাধা পার হয়ে আমি যেতে পারি যেন চলে
আমি যেন কভু নাহি পড়ে যাই নফসের কৌশলে
বিপদের মাঝে নামটি তোমার স্বরণে যেন রাখি
তোমার ভয়ে অশ্রু সিক্ত হয় যেন মোর আঁখি।
যদি কোন দিন ভুলে তোমায় যাই ভুল পথ পানে
সে দিন যেন তোমার দয়া আমারে ফিরিয়ে আনে
কভু যেন মোরে নাহি ঘিরে নেয় গুনাহের কোন কাল
সর্বদা যেন মোরে ঘিরে রাখে তোমার মহান আলো
তোমার নবীর সুন্নাত মেনে সর্বদা যেন চলি
জীবনে মোর তোমার প্রেমের দ্বীপ যেন ওঠে জ্বলি
তোমার কাছে আজি এ গোলাম তুলেছে দুই হাত
দুই হাত তুলে তোমার কাছে করি এই ফরিয়াদ।

* ছাত্র, ৬ষ্ঠ সেমিস্টার, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আই আই ইউ সি।
** ছাত্র, ৩য় সেমিস্টার, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আই আই ইউ সি।

পৃথিবী জুড়ে নেই

মো: মাহমুদুল হাসান*

পৃথিবী জুড়ে নেই
এমন একটি ভাষা
যার জন্যে ছেড়েছে
কেউ জীবনের আশা।
সালাম রফিক জব্বার
ভাষার জন্যে আপোষ
করেনি যারা একবার।
পৃথিবী জুড়ে নেই
এমন কোন সংগ্রাম
ভাষার তরে হয়েছে
যেথা এমন আঞ্জাম
পৃথিবী জুড়ে নেই
এমন একটি ভূমি
ভাষার জন্যে নিয়েছে
তপ্ত ক্ষুন চুমি
সে আমার বাংলা ভাষা
ধ্বনিত সবার মুখে
পারিবে না চাইলে কেউ
দিতে তারে রুখে!

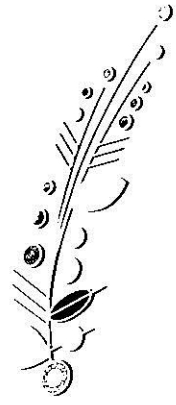

অধিকার

মো: মাহমুদুল হাসান*

জালিমের দর্পণে
শোষণের ঘর্ষণে
ধরনীতল উত্তপ্ত
তরুণ শহীদী খুনে
হচ্ছে আজি সিক্ত
শান্তির ছায়া ডাকা
সত্যের কালিমা আঁকা
নিশানা, নিশ্চিন্ন বিলুপ্ত!
তাণ্ডতের হুংকারে
অশালীন ঝংকারে
মাজলুম ভীত সন্ত্রস্ত
আর নয় বসে থাকা
রাজপথ হবে ফাঁকা
নারায়ে তাকবীর নিনাদে
শোষক নিপিড়ক অত্যাচারী
ভেঙ্গে চুর মুর দম্ভতারী
করিব আজ অবাধে
এসো এসো তরুণ
সত্য ন্যায়ের তোরণ
গেড়ে দাও আজ
বিজয়ী সকল জনপদে
ইজ্জত আব্রু আর
না পাওয়া যত অধিকার
ছিল যত রুদ্ধ
ন্যায় ইনসাফের দ্বার
ভেঙ্গে দাও লৌহ কপাট তার
কেড়ে নিক ছিনিয়ে নিক
যাহা তাদের অধিকার।

---

* ছাত্র, ৭ম সেমিস্টার, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আই আই ইউ সি।

বালক

আফিফ মুনতাসির*

একটি বালক
নাম তাঁর 'মুহাম্মদ'
জানে তাকে সবাই
আল আমিন বলে,
জন্ম তাঁর
মা আমেনার কোলে
ভিক্ষে না দিয়ে করাতেন কাজ
বলতেন তিনি ভিক্ষা থেকে বাঁচ
একদিন ভাবল সে বালক
কে মহান চালক?
দিচ্ছে কে বৃষ্টি
কার এ সৃষ্টি
সূর্য চাঁদে আলো কার
ভাবাচ্ছে তাকে বার বার
কত সুন্দর এ আকাশ মাটি ও ফুল
এটা হতে পারে না ভুল
আঁকড়ে ধরলেন দ্বীন ইসলামকে
নবী হয়ে বুঝালেন মানুষকে
কিন্তু মানুষ বেছে নিল ভূলকে
বললেন তিনি আল্লাহ রিযিকদাতা
মানুষ বলল এটা যাচ্ছেতা
কেউ বলত তাকে পাগল
আবার কেউ বা কবি
আসলেই তিনি হলেন
আমাদের বিশ্ব নবী।

কৌতুক

মাহমুদা খাতুন**

১ম কৌতুক :

১) দুই বন্ধু হোটেলে খেতে গেল। তারা মুরগীর ডিম এবং ডালের অর্ডার করল।

দুই বন্ধু খেতে বসল

১ম বন্ধু : বন্ধু ডিমের ভেতর তো মুরগীর বাচ্ছা।

২য় বন্ধ : আস্তে বল দোকানদার শুনলে মুরগীর বাচ্চার দামও দিতে হবে।

২য় কৌতুক :

দাদু : বলতে পারিস তোর বাবার বয়স কত?

নাতনি : কেন, দশ বছর।

দাদু : (অবাক হয়ে) তা কী করে হয়? তোর বয়সই তো দশ বছর।

নাতনি : কেন? আমার জন্মের পরই তো তিনি বাবা হয়েছেন।

৩য় কৌতুক :

মা : বাবা ঐ দেখ চাঁদ মামা

শিশু : মা চাঁদ তো তোমার মামা, আমার কি হবে? নিশ্চয়ই নানা হবে।

মা : না বাবা, চাঁদ নানা নয়, চাঁদ তোমারও মামা।

শিশু : না মা, তুমি চাঁদ মামা বললে আমি চাঁদ নানা বলব।

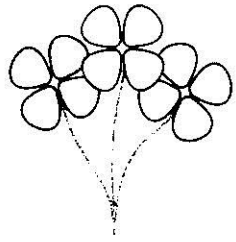

* ছাত্র, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, হালিশহর পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ।

** ছাত্রী, ৭ম সেমিস্টার, সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আই আই ইউ সি।

সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ
শরীয়াহ্ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ

প্রসঙ্গ কথা ঃ

বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের একদল ইসলাম প্রিয় সংগ্রামী ও ত্যাগী শিক্ষানুরাগী এবং সমাজসেবকদের অনেক দিনের লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন ও তাঁদের নিরলস পরিশ্রমের ফসল আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম। তাঁদের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বময় ইসলামের প্রচার-প্রসার, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষণে মুসলিম গবেষকদের সরাসরি অংশগ্রহণ এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় সাধনেয়ের মাধ্যমে মালয়েশিয়া, ইসলামাবাদ ও খার্তুমের ন্যায় একটি ব্যতিক্রমধর্মী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরী করে জ্ঞানের ইসলামীকরণের প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২ এর অধীনে ১৯৯৫ ঈসায়ী সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী এবং মুসলিম মনীষীদের স্মৃতিধন্য জনপদ চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক মানের এ বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শহরের প্রাণকেন্দ্রে একাধিক বহুতল বিশিষ্ট ভাড়াকৃত ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। অতঃপর ২০০২ ঈসায়ী সালের ২৮ মার্চ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় চ্যান্সেলর সীতাকুন্ডের কুমিরায় সমুদ্রস্নাত ও পাহাড় ঘেরা এক নয়নাভিরাম পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাসের উদ্বোধন ও প্রথম সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করেন। বর্তমানে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম পুরোদমে চলছে এভং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্বে পনের (১৫) সহস্রাধিক শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে।

শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ

তথ্য নির্ভর ও গবেষণাধর্মী পড়াশোনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক পদ্ধতি "সেমিস্টার সিস্টেম" (Semester System) ও "ওপেন ক্রেডিট আওয়ার সিস্টেম" (Open credit hour System) অনুসৃত হয়। এ পদ্ধতি ইউরোপ, আমেরিকাসহ উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে অনুসৃত হচ্ছে। ৪ বছরের অনার্স কোর্সকে মোট ৮টি সেমিস্টারের আওতায় আনা হয়েছে। তবে একজন মেধাবী ও পরিশ্রমী শিক্ষার্থী ৪ বছরের অনার্স কোর্স ৩ বছরেও শেষ করতে পারবে।

অনুষদ সমূহ ঃ

০১) শরীয়াহ্ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ
০২) বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদ
০৩) ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ
০৪) কলা ও মানবিক বিজ্ঞান অনুষদ
০৫) আইন অনুষদ

শরীয়াহ্ আন্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ ঃ

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্নদ্রষ্টাদের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যের পরিবর্তে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় করত: বিশ্বময় ইসলামের প্রচার-প্রসারই মূল উদ্দেশ্য ছিল বিধায় বিশ্ববিদ্যালয়য়ের প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্ন থেকে ইসলামী শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হয় এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের পাশাপাশি শরীয়াহ্ অনুষদ চালু করা হয়। হাদিসে রাসূল (সঃ)'র গবেষণা এবং এ ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অন্যান্য বিভাগের পাশাপাশি **"সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ"** শিরোনামে নতুন আরো একটি বিভাগ সংযোজন করে শরীয়াহ্ অনুষদকে আরো সমৃদ্ধ করা হয়। শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষেত্রের সুযোগ-সুবিধা বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কামিল মাদরাসার হাদিস বিভাগের সিলেবাসের সাথে সমন্বয় করে উক্ত বিভাগের সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে।

সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের বৈশিষ্ট্য ঃ

ইসলামী ও আধুনিক জ্ঞানের সমন্বয় সাধন। বিশ্বের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সিলেবাস ও শিক্ষা পদ্ধতির অনুসরণ। বিদেশে উচ্চ

ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদান। আরবী ভাষায় দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকমন্ডলীর তত্বাবধানে স্বল্প সময়ে আরবীতে পারদর্শীতা অর্জনের ব্যবস্থা। ইন্টারনেট সুবিধা সমৃদ্ধ নিজস্ব ল্যাবে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সুযোগ। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কার্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা ও প্রতিভা বিকাশের সুযোগ। শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের জন্য জার্নাল, ম্যাগাজিন ও দেয়াল পত্রিকা ইত্যাদি প্রাকশের ব্যবস্থা।

ভর্তির যোগ্যতা ঃ

বি.এ (অনার্স) প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য দাখিল ও আলিমে ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ অথবা জিপিএ ২.৫ (out of 5) হতে হবে এবং সম্মিলিতভাবে ন্যূনতম ৬ পয়েন্ট হতে হবে। দাওরা হাদিস ডিগ্রীপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীও ভর্তির জন্য যোগ্য।

ভর্তি পরীক্ষা ঃ

প্রতি শিক্ষাবর্ষে ২টি সেমিস্টারে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়।
স্প্রিং সেমিস্টার ঃ ফেব্রুয়ারী-জুলাই)
অটাম সেমিস্টার ঃ (আগস্ট-জানুয়ারী)
আই,আই,ইউ,সি ওয়েব সাইট এর মাধ্যমে অনলাইনে ভর্তির সুযোগ রয়েছে।

সিলেবাস ও কোর্স সমূহ ঃ

উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে দেশী বিদেশী একদল শিক্ষাবিদ ও সিলেবাস বিশেষজ্ঞদের নিরলস প্রচেষ্টায় একটি আধুনিক, যুগোপযোগী ও সমৃদ্ধ সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে মুসলিম ও আধুনিক বিশ্বের খ্যাতনামা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিলেবাসের চমৎকার সমন্বয় সাধিত হয়েছে। বি.এ. (অনার্স) প্রোগ্রামে মোট ৫৪টি কোর্সের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

Textual Analysis of the Six Books of Hadith	دراسات نصية في الكتب الستة	
Recording of Hadith & Methods of Muhaddisin	تدوين السنة ومناهج المحدثين	
Studies on Jarh & Ta'dil	دراسات في الجرح والتعديل	
Fabrication of Hadith	الوضع في الحديث	
Sources of Hadith & Studies the chain of Narrators	تخريج الحديث ودراسة الأسانيد	
Sciences of Hadith	علوم الحديث	
Inimitability of the Quran & Sunnah	الإعجاز في القرآن والسنة	
Introduction to Sciences of the Qur'an	المدخل الى علوم القرآن	
Comparative Religions	مقارنة الأديان	
Principles of Jurisprudence	أصول الفقه	
Jurisprudence of lbadah & Transactions	فقه العبادات والمعاملات	
Law of Inheritance	علم الميراث	
Contemporary Muslim World	حاضر العالم الإسلامي	
A Survey of Islamic History	التاريخ الإسلامي: مواقف وعبر	
Biography of Prophet (SAW)	فقه السيرة النبوية	
Arabic Language & literature	اللغة العربية وآدابها	
Computer	الكومبيوتر	
Islamic Economics	الاقتصاد الإسلامي	
Bangladesh Studies	دراسات بنغلاديشية	

Hadith & Orientalism	الاستشراق والحديث النبوي	
English Language	اللغة الانجليزية	
Research Methodology	مناهج البحث	
Critical Studies of Weak hadiths	دراسات نقدية في الأحاديث الضعيفة	
Shamael al Rasul (SAW)	شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم	
Subjective Studies in Hadith	دراسة موضوعية في الأحاديث النبوية	
Hadith of Islamic Rules	أحاديث الأحكام	
Studies of the Hadith in the Indian Sub-continent	علم الحديث في شبه القارة الهندية	
Contemporary Issues & Sunnah Studies	دراسة السنة وقضايا معاصرة	
Studies in Categories of the Narrators	دراسات فى طبقات الرواة	
Interpretation by Hadith	التفسير بالمأثور	
Thesis/Research Project	البحث.	

ফি সমূহ ঃ

ভর্তি ফি (এককালীন)		৫,০০০/-
সেমিস্টার ফি :	(৫,৫০০ X ৮ সেমিস্টার)	৪৪,০০০/-
স্ট্যাবলিসমেন্ট ফি:	(২,০০০ X ৮ সেমিস্টার)	১৬,০০০/-
অন্যান্য (ওরিয়েন্টশন, লাইব্রেরী ও পরীক্ষা ফি)		৯০০০/-
		সর্বমোট ঃ ৭৪,০০০/-

ভর্তিকালীন সর্বমোট প্রদেয় : ১৪,৫০০০/-

স্কলারশীপ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ঃ

- দাখিল ও আলিম পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা।
- সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান।
- হাফেজে কুরআন ছাত্রদের জন্য মাসিক বৃত্তির বিশেষ সুযোগ।

বিদেশে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ ঃ

এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বিশ্বের খ্যাতনামা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে শরীয়াহ্ অনুষদের বহু ছাত্র মালয়েশিয়া, ইংল্যান্ড, লিবিয়া, সৌদি আরব ও মিশরসহ আরব বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যন্ত সুনামের সাথে অধ্যয়ন করছে।

সম্ভাব্য কর্মক্ষেত্র ঃ

এ বিভাগের অনার্স কিংবা মাস্টার্স ডিগ্রীধারীরা চাকুরীর জন্য বাংলাদেশের সরকারী/বেসরকারী যে কোন প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় যেমন: বি. সি. এস, ব্যাংক, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি) অংশ গ্রহণ করতে পারবে। অধিকন্তু বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন সংস্থা ও দূতাবাসে চাকুরীর সুযোগ রয়েছে। পাশাপাশি দেশের বেসরকারি কলেজসমূহে ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে অধ্যাপনাসহ সকল আলিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস পদে শিক্ষকতার সুযোগ রয়েছে।

সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ঃ

- প্রতি সেমিস্টারে বিশ্ববিদ্যালয়ে কুরআন তেলাওয়াত, উপস্থিত বক্তৃতা, বিতর্ক (বাংলা, আরবী ও ইংরেজী), কবিতা আবৃত্তি, ইসলামী সঙ্গীত ও মুখাভিনয়সহ বিভিন্ন ইভেন্টে আন্ত:বিভাগীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

- বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে রচনা ও কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
- শিক্ষার্থীদেরকে Co-Curricular কার্যক্রমে পারঙ্গম করে তোলার লক্ষ্যে উক্ত বিভাগে Cultural Club রয়েছে। এ ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ইভেন্টে (বিতর্ক, কবিতা আবৃত্তি, সঙ্গীত ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।
- গবেষণার্মী এবং সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনারের আয়োজন করা হয়। দেশী-বিদেশী বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকগণ এসব সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এবং আলোচনায় অংশ নেন।

ছাত্রীদের জন্য স্বতন্ত্র কমপ্লেক্সে উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার আকর্ষণীয় সুযোগ ঃ

সামজের অর্ধেক নারী। সুতরাং এ বিশাল জনগোষ্ঠীকে বাদ দিয়ে একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ কখনো সম্ভব নয় বিধায় কাঙ্খিত সমাজ গঠনে চাই নৈতিক ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে গঠিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত একদল বিশেষজ্ঞ নারী "মুহাদ্দিসাহ"। আর এসব যোগ্য আদর্শ নাগরিক গড়ার মানসেই আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে "ছাত্রী শাখা" খোলা হয়েছে। ইসলামী শরীয়াহ্ ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে ছাত্রীদের জন্য নিরিবিলি, কোলাহলমুক্ত ও নিরাপত্তাপূর্ণ হোস্টেলে অবস্থান করে সম্পূর্ণ পৃথক ও নিরাপদ একাডেমিক কমপ্লেক্স লেখা-পড়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে

সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ ঃ

বিভাগীয় প্রধান ঃ

প্রফেসর ড. মোঃ নাজমুল হক নাদভী

অধ্যাপক ঃ

ড. আবু রেজা মুহাম্মদ নিজামুদ্দিন নাদভী, ফাদিলাহ (নাদওয়াতুল উলামা, লক্ষ্ণৌ), এম.এ.(ঢা.বি), পিএইচডি (লক্ষ্ণৌ, ভারত)

ড. মোঃ নাজমুল হক নাদভী, বি.এ (অনার্স) (লক্ষ্ণৌ, ভারত) এম.এ. (আলীগড়, ভারত) পিএইচডি(ঢা.বি)

সহযোগী অধ্যাপকঃ

ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম, এম.এম.(১ম শ্রেণীতে ৫ম), বি.এ (অনার্স) (স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত) এম.এ. (স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত), (আই.আই.ইউ.সি.), এম.ফিল. ও পিএইচডি (ই.বি) কুষ্টিয়া।

সহকারী অধ্যাপক ঃ

জনাব মুহাম্মদ আরিফ বিল্লাহ, বি.এ (অনার্স) এম.এ. (অর্থনীতি), (ই.বি.), এম.ফিল. গবেষক (ই.বি) কুষ্টিয়া।

জনাব আব্দুল গফুর, বি.এ (অনার্স) (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত) এম.এ. (স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত), (আই.আই.ইউ.সি.) এম.ফিল. গবেষক (ই.বি)।

প্রভাষক ঃ

জনাব মুহাম্মদ সেলিম উদ্দিন, বি.এ (অনার্স) (স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত) এম.এ. (স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত), আই.আই.ইউ.সি.), পিএইচডি. গবেষক (জা.বি)

জনাব মুহাম্মদ বেলাল, বি.এ (অনার্স) (মাদীনাহ্ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়), এম.এ. (স্বর্ণপদক) (আই.আই.ইউ.সি.), এম.ফিল. গবেষক (ই.বি)

জনাব সাইয়্যেদ নূর, বি.এ (অনার্স) (আল-আযহার, মিশর), এম.এ. (স্বর্ণপদক) (আই.আই.ইউ.সি.) এম.ফিল. গবেষক (ই.বি)।

জনাব মুহাম্মদ নাজমুল হুদা, বি.এ (অনার্স) (স্বর্ণ পদক), এম.এ (স্বর্ণ পদক) (আই. আই. ইউ. সি.) পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা, সৌদি আরব, এম.ফিল. গবেষক (ই.বি)।

যোগাযোগ ঃ

সাইন্সেস অব হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ

সিটি লিয়াঁজো অফিস

১৫৪/এ, কলেজ রোড, চট্টগ্রাম-৪২০৩, বাংলাদেশ।

ফোন ঃ ৮৮-০৩১-৬১০০৮৫, ৬১০৩০৮, ৬৩৮৬৫৬-৭, ৬৩৯৯৮১, Ext : ২১০, মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৩৩৬৬১১৮, ০১৭১২-৬৭৩০৯৪, ০১৯২৫-১৬২২০৩, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০৩১-৬১০৩০৭, E-mail : info@iiuc.ac.bd

স্থায়ী ক্যাম্পাস

কুমিরা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ০৩০৪-২৫১১৫৬-৬০, Ext : ৩১১,৩১২

ফিমেল একাডেমিক কমপ্লেক্স

বহদ্দার হাট (বাস টার্মিনালের পাশে), চট্টগ্রাম।

মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৩৩৬১১৮, ০১৭১২-৬৭৩০৯৪, website: www.iiuc.ac.bd